ভাষা সমস্যা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

মনিরুজ্জামান

সিটি লাইব্রেরী
৩৮/ঙ, বাংলা বাজার-ঢাকা

Bhasha Shamashya O Annanya Proshanga

by

Maniruzzaman

Rs. 5·00

এ, এম, শামসুদ্দীন কর্তৃক সিটি লাইব্রেরী, ৩৮/৬, বাংলা বাজার, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং কে, এ, ওয়াদুদ কর্তৃক বি, জে, প্রেস, ১৩, কারকুন বাড়ী লেন, ঢাকা ১ থেকে মুদ্রিত। প্রচ্ছদ অংকনে—হাশেম খান। ১ম সংস্করণ : জুলাই, ১৯৬৯।
[সর্বসত্ব লেখকের]

মূল্য : পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সা মাত্র

পিতা মরহুম মোঃ নাদেরুজ্জামান

ও

শ্রদ্ধেয় শ্বশুর মরহুম অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই

—তাঁদের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে

এ গ্রন্থখানি উৎসর্গ করলাম

এ গ্রন্থের প্রুফ আসে ৩রা জুন, অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই সাহেবের আকস্মিক মৃত্যুর দিনে। তিনি এ গ্রন্থ দেখে যান নি এ দুঃখ নিয়ে প্রকাশ করতে হচ্ছে তাঁরই বেছে দেওয়া প্রবন্ধগুলির এই সংকলনটি। প্রকাশক নিজেও এতে আহত। তাই এক বছরের কাজ এক মাসে তিনি সম্পন্ন করলেন। এতে মরহুম অধ্যক্ষ সাহেবের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাই প্রকাশ পেল; তাঁর সংগে আমার কৃতজ্ঞতা জানাবার সম্পর্ক নয়।

পাণ্ডুলিপি আকারেই বই খানি সাগ্রহে পাঠ করে জনাব আবুল ফজল আমাকে ভূমিকাটি লিখে দিয়েছিলেন; সচরাচর এমন ভাবে কেউই ভূমিকা লিখে দেন না। তাঁর উৎসাহ অনুরাগ আমার জীবন পথের সামগ্রী।

দ্রুত মুদ্রন ও তদারকের অভাবে গ্রন্থটি বহু অবাঞ্ছিত ত্রুটিসহ প্রকাশিত হলো। তবু রসিকজনের কাছে তা' কিঞ্চিৎ আদরনীয় হলে শ্রম সার্থক মনে করবো।

আজিমপুর?

আদিয়াবাদ, ঢাকা
২৯শে আষাঢ়, ১৩৭৬।

মনিরুজ্জামান

১] ভূমিকা
৩ ঋতম্ভরা
৬ ভাষাতত্ত্ব, আধুনিক
১০ শব্দের ইতিবৃত্ত
১৭ শব্দে শব্দে যোজনা
২৩ চট্টগ্রামের উপভাষা প্রসংগে
২৭ পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যের ভাষা সমস্যা
৩৪ বাংলা গদ্যে পদক্রম
৫১ উপন্যাস ঃ প্রথম চিন্তা
৫৪ নাটক প্রসঙ্গ
৬৪ কবিতা সমস্যা ঃ প্রাচীন কাল ও আমরা
৭১ আধুনিক কাব্যে আঙ্গিক ও 'উচ্চারণ' প্রসঙ্গ
৯৫ চর্যাপদের মানুষ
১০৭ রবীন্দ্রমানসে সৌন্দর্যবোধ
১১৯ কায়কোবাদের সাহিত্য সাধনার সামাজিক পটভূমি
১৩১ উপেক্ষিত মহাকাব্যের কবি
১৩৯ মহাকাব্যে কায়কোবাদ
১৪৭ নজরুল কাব্যের নিত্য ও চিরন্তন মূল্য
১৫৪ সনাতন নজরুল
১৫৮ নজরুল কাব্য, ঐতিহ্য ও শব্দ ব্যবহার
১৬২ অথ নজরুল বিবাদ সমাচার
১৭১ চতুর্বেদ
১৭৯ অপ্রাকৃত প্রবন্ধ
১৮৫ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ঃ সাহিত্যে তার রূপ
১৮৮ কালচার
১৯৮ সংস্কৃতি
২০৯ লোক সংস্কৃতি
২১৪ শিক্ষা প্রসঙ্গে
২২১ পরিশিষ্ট

ভূমিকা

মনিরুজ্জামান আমাদের তরুণ লেখকদের অন্যতম। তিনি কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস আর সে সাথে প্রবন্ধও লিখে থাকেন। সাধারণতঃ তরুণ লেখকরা কবিতা কিম্বা গল্প-গ্রন্থকেই তাঁদের প্রথম প্রকাশনার গৌরব দিতে চান, দেনও। বয়োধর্মের দিক দিয়ে তা' হয়তো স্বাভাবিকও। প্রথম বয়সে রোমাঞ্চ বা কল্পনা প্রধান রচনার প্রতি প্রবণতা সহজাত আর সে সবের মাধ্যম হিসেবে কবিতা আর গল্পই যে অধিকতর আকর্ষণীয় তাও বোধ করি লেখক মাত্রেরই অভিজ্ঞতা।

মনিরুজ্জামান এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম আর বিরল নজির। এটি তার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ আবার প্রথম প্রবন্ধ সংকলনও। বলাবাহুল্য প্রবন্ধ সব সাহিত্যেরই একটি বিরাট আর গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অবশ্য আমাদের সাহিত্যের এ শাখার আগে 'বিরাট বিশেষণ প্রয়োগের সময় হয়তো এখনো আসে নি। না আসার পেছনে বহুতর সঙ্গত আর ঐতিহাসিক কারণ নিশ্চয়ই রয়েছে। সে সবের আলোচনার ক্ষেত্র এটি নয়।

শুধু সাহিত্যের বেলায় নয়, যে কোন শিল্প-কর্মের জন্য যুগপৎ দুটি শর্ত অপরিহার্য—আবেগ আর মননশীলতা। এ দু'য়ের সহযোগ ছাড়া কোন শিল্পকর্মই রচিত হয় না। খুব প্রখর প্রতিভাধরও যদি এ দু'য়ের অধিকারী না হন, তাঁর পক্ষে বহু অসাধ্য-সাধনই হয়ত সম্ভব, কিন্তু শিল্পী তিনি আদৌ হতে পারবেন কিনা সন্দেহ। প্রাথমিক স্তরে আবেগই শিল্পীর শিল্পসত্তাকে জাগিয়ে তোলে, প্রকাশকে করে তোলে অপ্রতিরোধ্য। মননশীলতা জোগায় ভাবগত ঐক্য আর ভাষার আঙ্গিকগত শৈলী। সাহিত্যের প্রায় সব শাখা-প্রশাখা সম্বন্ধেই এ কথা বলা যায়, প্রবন্ধের বেলায় এ অধিকতর সত্য এ কারণে যে প্রবন্ধ অনেকখানি বক্তব্য প্রধান শিল্প। বক্তব্যটা লেখকের মনে অপ্রতিরোধ্য হলেই প্রকাশেও তা বিশেষ একটা শৈলী-রূপ নিয়ে থাকে। তাই স্বীকৃত প্রত্যেক প্রবন্ধ লেখকেরই আলাদা রচনা-শৈলী বা ষ্টাইল।

ভাষা যথাসম্ভব ঋজু আর স্পষ্ট হলেই বক্তব্যে ভাবগত ঐক্য সহজ-সাধ্য হয়। প্রবন্ধ মানে লেখকের মনের কিছু কথা পাঠককে জানানো—বিশ্লেষণের সাহায্যে বিষয়-বিশেষকে পাঠকের কাছেও বুদ্ধিগ্রাহ্য করে তোলা। তাই প্রবন্ধ লেখককে

তাঁর বক্তব্য সম্বন্ধে নির্দ্বন্দ্ব হতে হয়, সে সঙ্গে প্রকাশ শৈলীও তাঁর হওয়া চাই অর্থবহ ও আকর্ষণীয়। আকর্ষণীয় হওয়া শিল্পের আর একটি শর্ত। কোন না কোন আকর্ষণ বা ইন্টারেষ্ট্ জাগাতে না পারলে শিল্প লক্ষ্য-সাধনে ব্যর্থ হয়। আবার আবেগ আর মননশীলতার দুর্লভ সমন্বয় যাঁর মধ্যে ঘটেছে তাঁর নিজস্ব কোন বক্তব্য নেই তেমন কথাও ভাবা যায় না। সে সঙ্গে এও স্মরণীয় যে কবিতা, গান, গল্প-উপন্যাস-নাটক বক্তব্য-প্রধান হয়ে পড়লে ঐ সবের শিল্পগত সৌন্দর্য ক্ষুণ্ণ না হয়ে পারে না। কারণ ঐ সব শিল্পের একটা সুনির্দিষ্ট শৈল্পিক-সীমা রয়েছে, যুগ যুগ ধরে যা স্বীকৃত ও অনুসৃত। সে সীমা লঙ্ঘিত হলে ঐ সব শিল্প শিল্প-হিসাবে অসার্থক হয়ে পড়ে। শিল্পকে শিল্পের সীমা বা ধর্ম মেনে চলতেই হয়। এ কারণে একদা রবীন্দ্রনাথ নজরুলের প্রতি এ সপরিহাস সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছিলেন ঃ তুমি তো শুনি তলোওয়ার দিয়ে দাড়ি চাঁচা শুরু করেছে! অর্থাৎ শৈল্পিক-সীমা ডিঙিয়ে যাচ্ছো।

রবীন্দ্রনাথ নিজে অজস্র কবিতা, গান, গল্প-উপন্যাস, নাটক নাটিকা লিখেছেন, সে সঙ্গে লিখেছেন প্রচুর প্রবন্ধও। তার মানে তাঁর মনে এমন বহু কথা অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে যা সাহিত্যের অন্য কোন মাধ্যমে প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি – তাঁর মতো প্রতিভাধরের পক্ষেও। করলে সে সব মাধ্যম তার স্বধর্ম হারাতো। শুধু রবীন্দ্রনাথ কেন এ যুগের পৃথিবীর তাবৎ বড় কবিই অজস্র প্রবন্ধ লিখেছেন। লেখার পথে তাদের মনে এমন বহুতর বক্তব্য হয়তো অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছিল যার প্রতি সুবিচার করতে গিয়ে প্রবন্ধের আশ্রয় নিতেই হয়েছে তাঁদের। রবীন্দ্রনাথ ত সাহিত্যের সব শিল্প-প্রকরণেই সিদ্ধহস্ত ছিলেন, আর জীবনটা ছিল তাঁর পুরোপুরি যাকে সাধারণ ভাবে বলা হয় 'কাব্যিক', তবুও প্রবন্ধের মতো এমন 'গাদ্যিক' মাধ্যমের দ্বারস্থ না হয়ে তিনিও পারেন নি!

অন্য মানুষের তুলনায় শিল্পী-সাহিত্যিকেরা তাঁদের চারপাশ সম্বন্ধে অনেক বেশী সচেতন। অধিকতর সংবেদনশীল বলে অতি দ্রুত চারপাশের সমস্যা তাঁদের মন মানসকে করে তোলে আলোড়িত। সাহিত্যে শিল্পে তারই ঘটে ছায়াপাত, যা কারা নের বিভিন্ন প্রকরণ আর আঙ্গিকে। অনেক কিছু আবার বিশ্লেষণ প্রত্যাশী, সে সবের জন্য প্রবন্ধ ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। তাই প্রবন্ধ সব সাহিত্যের এক অচ্ছেদ্য অঙ্গ।

ব্যবহারিক জীবনে মনিরুজ্জামান অধ্যাপক — ভাষা, সাহিত্য, সভ্যতা, সংস্কৃতি, এ সব স্বভাবতই তাঁর মানস-চেতনার নিত্যদিনের আনুসঙ্গিক। তাঁর প্রবন্ধের বিষয়বস্তুও তাই এ সব এলেকা থেকেই বেশী করে আহৃত। অর্থাৎ আমাদের সাহিত্য আর সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়গুলি তাঁর মনকে বেশী করে দিয়েছে নাড়া—সে সব বিষয়ে কথা বলার তাগিদ তাই তাঁর মনে অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠা খুবই স্বাভাবিক। সাতাশটা প্রবন্ধের এ সংকলনের বিষয় সূচীর প্রতি নজর দিলেই এ কথার যাথার্থ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। আমাদের সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদ থেকে আধুনিকতম নজরুল-সাহিত্য পর্যন্ত তাঁর আলোচনার বিষয়বস্তু হয়েছে এ কারণে।

প্রবন্ধ শুধু যে ব্যক্তি-মানসের পরিচয় বহন করে তা নয়, দেশ আর জাতির মানস চেতনা, মননশীলতা আর জিজ্ঞাসারও পরিচয় প্রবন্ধেই বেশী করে হয় ভাষারিত। বিশেষ করে এ জন্য মননশীল মানুষের মানস-ক্রিয়ার একটি বিশেষ দিক প্রবন্ধ না হয়ে পারে না। মননশীলতা মনিরুজ্জামানেরও পেশা আর নেশা শুধু নয়, ব্যসন আর সাধনাও। এ সংকলনে তার কিছুটা পরিচয় দেখতে পাওয়া যাবে। প্রবন্ধগুলি তাঁর নিজস্ব বক্তব্যের বাহন হলেও তাতে কোথাও উগ্রতা ও অসহিষ্ণু-তার প্রকাশ ঘটেনি। একটা স্নিগ্ধ আর সুকোমল মন-মেজাজের পরিচয় রচনা-গুলির গায়ে সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। শব্দ, ধ্বনি, ভাষাতত্ত্ব ইত্যাদির মতো দুরূহ বিষয়ও এ কারণে তাঁর হাতে হয়ে উঠেছে সহজ আর সুখপাঠ্য। তাঁর রচনায় কোথাও গোঁড়ামির পরিচয় নেই, তাঁর দৃষ্টিভংগি উদার ও সংস্কার মুক্ত। তাঁর সব রকম আলোচনা আর বিশ্লেষণে সে দৃষ্টিভংগি অব্যাহত দেখে আনন্দিত হওয়া যায়। পুরোপুরি সংস্কৃতি-মনা আর রুচিবান না হলে মনকে এমন খোলা আর মুক্ত রাখা যায় না। বিশেষত যুগটাই এখন উগ্রমতবাদ আর পক্ষপাত-দুষ্ট বলে বক্তব্য-নির্ভর রচনায় অনেক সময় মনের ভারসাম্য খণ্ডিত হয়ে পড়ে। মনিরুজ্জামানের মন আর শিল্পবোধ খুব পরিশীলিত বলেই বোধ করি তিনি কোথাও ভারসাম্য হারান নি। তরুণ লেখকের পক্ষে এ শুধু অপ্রত্যাশিত নয় এক দুর্লভ গুণও।

সমগ্র বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধ রচনার ইতিহাস কম দীর্ঘ নয়, বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে যার সার্থক রূপ আমরা প্রথম দেখেছি কালক্রমে তা রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী

আর পরবর্তীদের হাতে আরো সুসংহত ও বিচিত্র হয়ে উঠেছে। এখন প্রবন্ধে বিষয়-বৈচিত্র্য আর আঙ্গিকে বিস্ময়কর রূপান্তর সত্যই আশ্চর্য হওয়ার মতো। পূর্ব পাকিস্তানে স্বতন্ত্র সাহিত্যের আয়ু খুব দীর্ঘ নয়, তদুপরি প্রবন্ধ রচয়িতার সংখ্যাও অতি সীমিত। তবুও এর মধ্যে এখানেও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। যাতে চিন্তা আর মানস-শ্রমের স্বাক্ষর দেখে আশান্বিত হওয়া যায়। তার সঙ্গে মনিরুজ্জামানের এ সংকলনের সংযোজন শুধু যে সংখ্যা বৃদ্ধিতে সহায়তা করল তা' নয়, আমার বিশ্বাস গুণের দিক দিয়েও আমাদের প্রবন্ধ সাহিত্যে এ এক সম্মুখ পদক্ষেপ বলেই বিবেচিত হবে।

মনে হয় গীতিধর্মিতা মনিরুজ্জামানের মন-মানসের একটি বিশেষ প্রবণতা। এ কারণেই বোধ করি তাঁর প্রবন্ধের ভাষায়ও গীতিধর্মিতার লক্ষণ লক্ষ্যগোচর। ফলে তাঁর প্রায় প্রবন্ধেই সাহিত্যের একটা স্বাদ আর আমেজ পাওয়া যায়। লেখক পুরোপুরি শিল্পী-মনা বলে অনেক ক্ষেত্রে তিনি তাঁর বক্তব্যকে স্রেফ ইংগিত আর প্রতীকের সাহায্যেই ব্যক্ত করতে চেয়েছেন। এতে রচনার শিল্প-মান উন্নত হয়েছে কিন্তু বক্তব্যে কিছুটা অস্পষ্টতা না এসে পারে নি। এ জন্য মনিরুজ্জামানের রচনা সম্বন্ধে অভিযোগও যে কিছু কিছু শোনা যায় না তা নয়। তাঁর মানস-গঠন আর প্রবণতার কথা স্মরণে রেখে তাঁর রচনা অধ্যয়নে অগ্রসর হলে এমন আপত্তি ওঠার কথা নয়। তিনি নিজে চিন্তা করেন, চিন্তা করে লেখেন বলে স্বভাবতই তাঁর পাঠককেও কিছুটা চিন্তা প্রবণ হতে হয়। তা হলে তাঁর রচনার মর্মে প্রবেশ আর যুক্তির অনুধাবন কিছুমাত্র দুঃসাধ্য হওয়ার কথা নয়। আমাদের পাঠকেরা সাধারণতঃ সহজ-বোধ্য আর সহজ-পাচ্য রচনারই পক্ষপাতী, মনিরুজ্জামানের মতো লেখকদের এখানেই বিপত্তি।

প্রবন্ধের একটি বড় কাজ পাঠকের মনকে আলোচ্য বিষয়ে উদ্দীপিত করে সচেতন আর জিজ্ঞাসু করে তোলা। লেখকের মনের স্ফুলিঙ্গে, পাঠকের মনে ও চিন্তার একটি সলতে জ্বালিয়ে দেওয়া। হোক না তা অতি ক্ষুদ্র আর স্বল্পায়ু। মনিরুজ্জামান তাঁর যে রচনাগুলির গ্রন্থ বদ্ধরূপ নিয়ে পাঠকদের সামনে এ প্রথম হাজির হলেন সেগুলির তেমন কোন ভূমিকা হবে কিনা তা আগাম বলার উপায় নেই। তবে তাঁর এ সব রচনা আমাদের ভাষা, সাহিত্য আর সংস্কৃতির বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে

পাঠক মনকে যে কৌতুহলী করে তুলবে তাতে আমি নিঃসন্দেহ। যাঁরা সাহিত্যে অনাবশ্যক বাগাড়ম্বরের চেয়ে স্বল্পবাক গভীরতা আর সংযত পরিমিতি বোধে আনন্দ পান—আর প্রবন্ধে ও শিল্পগত সৌকুমার্যের স্বাদ পেতে আগ্রহী আমার বিশ্বাস মনিরুজ্জামানের এ রচনাগুলি তাঁদের প্রিয় হবে। আর এও আমার বিশ্বাস তেমন পাঠকের সংখ্যা, আমাদের দেশেও এখন দিন দিনই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১৫ই আগষ্ট, ১৯৬৮
সাহিত্য নিকেতন,
চট্টগ্রাম।

আবুল ফজল

ভাষা

ঋতম্ভরা

বিংশ শতাব্দীতে গণতান্ত্রিক দাবীগুলির অন্যতম ভাষার দাবী।

মানুষ নিজেকে প্রকাশ করে বাঁচবার সমস্ত লক্ষণ ও আগ্রহ দিয়ে। ভাষায় এই সমস্ত লক্ষণ ও আগ্রহ এবং সংগ্রাম কেন্দ্রীভূত ও সূচ্যগ্র হয়ে ওঠে। বিশেষতঃ যে জাতি জাগরণের মুখে ভাষার মত বিস্তৃত চারণ ও কর্ষণ ক্ষেত্রে কুশাঘাত প্রাপ্ত, তার নির্দ্বিধাই তার জাগরণ প্রকৃতি ও উন্মুখ উন্মোচন চিন্তার ঋত্বিক ও সাংগঠনিক প্রতিক্রিয়া সুসম্পন্ন করে।

যুগে যুগে ভাষার পরিবর্তন একটা সাধারণ ঘটনা। মানুষ ভাষার শক্তিবৃদ্ধি ও এক-সংস্কৃতি নিবদ্ধ অঞ্চলে তার স্বতন্ত্র সম্ভাবনাময় পূর্ণরূপ কামনা করেছে। তাই ভাষা স্বকীয় বৃত্তিসম্পন্ন হয়েও পরনির্ভর। যুগচেতনা ও নব-সংস্কৃতির আন্দোলনের ভিত্তিতে অভিজাত জীবনের রাজন্য সংস্কার ভেঙ্গে এই ক্ষেত্রজ ফসল-সম্ভাবনার প্রেমোপহার কণ্ঠসংলগ্ন করে।

জাতীয় বিকাশের স্তরভেদে এবং জাতীয় সংস্কৃতির নবোন্মাচনের থর থর ভীরুভব কালধর্ম অনুসারে ভাষা যুগে যুগে মন্ত্রভাষা-পুরাণ, রূপক-বা প্রতীক ভাবনার আশ্রয় হয়েছে। প্রতীক হিসাবে গ্রহণ সর্ব্বশেষ স্তর বিকাশের ধর্ম ও বৃত্তি সংশক্ত।

লক্ষ্যকরা যেতে পারে যে, মানবোতিহাস প্রথমে 'জৈব' ও পরে স্থাবর-কল্পিত এবং পর্যায়ক্রমে গায়ত্র, প্রাকৃত, শক্তি গীতোক্ত, দেব-প্রবৃত্ত ও পরিশেষে জাতীয়। বর্তমানে—সূচনার অন্তর্ক্ষেপ এবং মধ্যপর্যায় ও সমকালীনতায় অন্তর্মুখী, ব্যক্তিচিত্ত ও স্বপ্রবৃত্ত। এই শব্দগুলি যথাযথ গ্রহণের যুক্তি না থাকতে পারে কিন্তু এ সত্য স্পষ্ট যে মানুষ অর্থ ধর্ম মোক্ষ কাম প্রভৃতি সমস্যার ক্ষেত্রে

সংগ্রাম চেতনার বিকাশ কিংবা বিকাশ ঘটিয়েছে ও কালে কালে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ ও প্রত্যক্ষ কারণ জাগ্রত সত্তার বিস্ফোরণ সম্ভব করেছে। আধুনিক কালে প্রত্যক্ষ কারণের অপেক্ষা দুর্ণোঙর পোতের মতই প্রস্তুতির কাছেও বাধাগ্রস্থ! ব্যক্তিচিন্তা ও অনুভাবনায় স্বপ্রবৃত্ত মানুষ জ্যামিতিক মাত্রাগত এবং বর্তমান আন্দোলন যথার্থ কৌনিক, তীর্যক এবং সেই হেতু প্রতীক।

ভাষাকে মানুষ বর্তমান সংশয় সংকটাপন্ন যুগে আপন সত্তা বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা করে একটা প্রতীক হিসাবে নিয়ে সূর্য শক্তির সোপান বা সম্ভাবনার দাবদাহ সমুদ্র কল্পনা করেই ভাষার দাবীকে এগিয়ে নিয়ে এসেছে।

সুতরাং ভাষা আন্দোলন মূলত প্রতীকতার আন্দোলন। এবং প্রতীক যত জীবনাসন্ধ ও প্রগর্ভ হবে এই আন্দোলন ততই জটীলতা ও ব্যাপকতা-কৃতি লাভে সমর্থ হবে। প্রতীকের ধর্ম'ই অন্বেষণ। জীবন কিংবা বস্তুর তল থেকে তলে, আকাশ থেকে আকাশে নভোপরিক্রমণ বৃত্তি আশ্লেষণ, চেতনা প্রজ্জলন ও অধিকার প্রশ্নে নিঃসংশয় ভবনে তার যথার্থ প্রস্ফুটন। এই প্রতীক 'চেতনা'রও দাবীদার। এবং অবশ্যই কাল সংলগ্ন। কাল বা যুগ যখন যন্ত্রনা পায় তখন তার প্রয়োজনীয়তা ও তৎপরতা একমুখী হয়ে একটা প্রতীকে ফসল গ্রহণ করে। সমকালীন অন্যান্য ভাব ও ইচ্ছাপ্রসারণের পাশে বিশেষ কোন চেতনার বিদ্যুৎ উৎসমুখ থেকে অগ্নিক্ষরা হয়ে আন্দোলনগত প্রক্রিয়ায় প্রকাশিত হয় বলে অন্যান্য প্রকাশ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে ব্যক্তিসত্তার স্ফুরণ আহত হয়। কেবল প্রতীক-বাদিতার ক্ষেত্রে অপ্রকাশ্যে জটীলতায় কিংবা ঋজু সরণীর আচক্রবাল প্রসারণে প্রাংশুচেতনা সিক্ত হয়। ভাষার দাবী তাই ক্ষেত্র থেকে ক্ষেত্রে অভিগামী হয়ে বহুব্যাপ্ত সমস্যাগুলিকে একমুখী করতে পারে।

আমি তো মনে করি এ আমার অনন্ত জাগরণের তপস্যা। এ আন্দোলন প্রকৃতির সামিল। ধর্ম'র অঙ্গ। যে ধর্ম আমার স্বভাবকে, প্রকৃতিকে, সহজবোধ ও নিশ্চিত সত্য ব্যাকুলতাকে নিষ্ঠার সঙ্গে আচরণগত করে। এই সৎনিষ্ঠার, আমি চ্যুত হতে পারি?

ঐতিহ্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে গজনীর সুলতানকে একদা ভুলের মাশুল নিয়ে মহাকালের

সামনে অনন্ত জিজ্ঞাসা নিয়ে এসে দাঁড়াতে হয়েছিল। এত বড় ভুল গজনীর শ্রেষ্ঠ নরপতির ?

আমার 'সুন্দর' আমাকে পবিত্র এবং একতম করে। সুন্দরকে লাঞ্ছিত করলে অসুন্দরের বৃশ্চিকদংশনে জীবন অসহ হয়।

শাসক ও আইনে মন চিরকালই উপেক্ষিত। তবে সেকালে এই দুই বস্তুর ক্ষেত্র ছিল সীমিত। এখন ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে আইন এবং কানুন বসেছে, কারণ নগরের দেয়াল এখন আর বাইরেই নয়, রাজপথ এখন আর পিচের মধ্যে নয়—অফিস-আদালত অস্তক সবকিছুই এখন মনে গিয়ে বসেছে। এই মনে যেমন 'সময়' বলতে কোন বস্তু নেই, শাসন ছাড়া অন্যকোন অপ-নীতিও তার ত্রিসীমার মাটি খেতে পারে না।

ফলে দুটো পরিবর্তন এসেছে জীবনে। প্রথমতঃ, সবকিছুকে বস্তুগত সত্তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা। যেখানে তার অমান্য বা অহেতুর আবিষ্কার তাকে তৎক্ষনাৎ নগরের বহির্দেয়ালের বহিপ্রান্তে খেদিয়ে দেওয়া এবং নিয়মানুগ বলে বা শাসনানুগ বলে সকল কিছুকে মূল্য ব্যবধান না করে আইনের অধিকার দেওয়া এবং তন্মধ্যে প্রতিযোগিতার ধর্ম স্থষ্টি করা। দ্বিতীয়তঃ, দ্রুত মনের 'রেসে' প্রচুর দুর্ঘটনার মধ্যে রোগ, সেবাশ্রম ও ধর্মশালা এবং আনন্দ নিকেতন গুলিকে Official Visit-এর বস্তু এবং Museum করে তোলা। এই দুই ভাগকে আরো ছোট ছোট ভাগে ভাগ করা যায়। নিজের মনের দিকে তাকালে এযুগে দুটো উপায় তৎক্ষনাৎ চোখে পড়ে—একটা আত্মহত্যা আর একটা Compromise-এর পথ। বস্তুগত লাভালাভের প্রশ্নে অনেকেই Compromise-এর পথটাকে সুগম ভেবে নিয়ে অফিসে কর্মরত অবস্থায় বসে গেছে এবং সারা জীবন সুখ নামক বস্তুকে আনন্দ নামক হৃদয়ের কোমল কম্পনকে ও তৃপ্তি নামক অহরহ নিঃশ্বাসকে জিম্মা দিয়ে দেশ কালের অধিপতি হচ্ছে। এদের সংখ্যাও নগণ্য নয় এবং এরাই এখন বরেণ্য।

ভাষাতত্ত্ব, আধুনিক

'ভাষাতত্ত্ব' কথাটি ভাষাতাত্ত্বিক এ্যালেন মানেন না, তিনি বলেন ওটা একটা দার্শনিকতা। এ তত্ত্বের ওপর অত্যধিক দৃষ্টিক্ষেপের ফলে ভুল বোঝা-বুঝির অবকাশ ঘটে। ভাষায় যে সাধারণ লোকদেরও নিজস্ব বিরাট দান আছে সেটা ঢাকা পড়ে যায়।

কথাটা ভাববার মত। এক শব্দতত্ত্বই তার প্রমাণ দেয়। মানুষ শব্দ উচ্চারণ করে করে মনোভাব প্রকাশ করে, শব্দই তার ভাবের বাহন। ভাষার সংগে শব্দের বা ধ্বনির সংগে শব্দের তফাৎ কম কিন্তু যখন তত্ত্ব এসে জুড়ে বসে, তখনই তা ধ্বনিতত্ত্ব, শব্দতত্ত্ব আর ভাষাতত্ত্ব হয়ে পরস্পর এক একটি নক্ষত্র জগৎ-এর দূরত্ব বা ব্যবধান সৃষ্টি করে। ধ্বনিতত্ত্বে 'শব্দ'গুলি ধ্বনি বৈশিষ্ট্য (Phonic values and characters) অর্জন করে, উচ্চারণের দ্রুততার সংশ্লেষণটা চোখে না পড়লেও ধ্বনি সৃষ্টিই তার উদ্দেশ্য। অন্যদিকে Phonic meaning-টাই শব্দের ধারক। শব্দের পারম্পর্য প্রশ্নটাও এখানেই ঃ শব্দে এলোমেলো গঠন-প্রকৃতির অভাবটা চোখে পড়ার মতই, সুষ্ঠু উচ্চারণ শব্দের অর্থকে গভীরতার ব্যঞ্জনা দেয়। শব্দ বিশ্লেষিত হ'লে তাতে অর্থ থাকে না ; কিন্তু তাতে ধ্বনি পারম্পর্য রক্ষার হেতুতে, ক্রিয়াদি নিষ্পন্ন হবার 'লজিক' এবং শব্দের পরিবর্তনের ধ্বনিতাত্ত্বিক তাৎপর্য আমাদের লক্ষ্যগোচর হয়।

আমরা চোখ পিড়্পিড়্ করলে বরং পিড়্পিড়্ই বলবো, কানাড়া শব্দের Kants'-utts'utte বা Kancuccutte বলবো না। কারণ, কানাড়াভাষীদের মোটা ধ্বনিবোধ সুন্দরবনের ছড়ানো বাংলা হাওয়ায় কার্যকর করাতে যে অসুবিধাই কেবল আছে তাই নয়, ধ্বনিকে কন্দর্পকান্তি দেখতে না হলে বাঙ্গালী তাকে বরদাস্ত করে না। আবার নিজস্ব পদ্ধতিতে ধ্বনি গঠনকালে বিকৃ-

তিকেও প্রশ্রয় দেই—সেও ঐ কারণেই। অনেক ভুল করি স্ত্রী-প্রত্যয়যুক্ত শব্দেও—সুন্দরের কারণে।

তেমনি Phonic অর্থকে রেখেই ধ্বনি মাঝে মাঝে স্বেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয়ও নেয়, যেমন রত্ন>রতন।। বিলাতী>বিলেতী> বিলিতি (বিলাতী বেগুন; বিলিতি কায়দা।।) নায়ে দিয়ে আনাকে 'নায়র' বা 'নাইয়র' বলে, আবার পাল্কী দিয়ে আনলেও সে 'নায়র', হেঁটে এলেও তাই। সূত্রার্থ ভিন্ন, কিন্তু ধ্বনিতত্ত্বের নিয়মে 'নায়র'-এর ধ্বনিগুলিই এই সব অর্থের সংগেই জড়িয়ে পড়েছে—আপত্তি উঠছে না। এরই একটু ভিন্ন নিয়মে, গংগা মানে যে কোন নদী; লাল-কালি ব্যবহার ব্যাকরণ-সিদ্ধ এবং মৃগরাজের সাথে মৃগের সম্পর্ক বিপত্তিজনক। 'কলেজ' বিদেশী শব্দ, কেরাণী, নোনা প্রভৃতি পর্তুগীজ শব্দ—কিন্তু তা গ্রহণে আমাদের আপত্তি নেই, কারণ এদের Phonic exchange অসম্ভব।। রবীন্দ্রনাথ বলবেন ভরসার ইংরেজী কত,—hope, courage, expectation, কিন্তু

নিশিদিন ভরসা রাখিস
ওরে মন হবেই হবে—

অনুবাদে হলো: Keep firm the faith, my heart it must come to happen.

উল্টে বাংলা অনুবাদ করলে 'বিশ্বাস' শব্দ এনে 'ভরসা'র তাল ঠোকার আওয়াজটা থামিয়ে দেওয়া চলবে মাত্র।

এবং সম্প্রতি কোন ভাষাবিদ ধ্বনির অর্থবিনিময়ের বিপক্ষে বলার সুযুক্তিতে আফ্রিকান ভাষাগুলিকে আফ্রিকার চেয়েও জঙ্গল, কাঁটাকীর্ণ ও বিপুল আয়তন করে তুলেছেন। সমালোচকরা তবু শেষ পর্যন্ত এ সিদ্ধান্তেই এসেছেন যে, ধ্বনির গুরুত্ব ব্যাকারণিক,-শব্দ সেই অব্যাকরণের ভরসা।

ভাষাতত্ত্বের খেলাটা ধ্বনিতত্ত্বের মতো ঘর-বন্দী খেলা নয়। যে কোন ভাষাগোষ্ঠির একটি মানুষের মুখের ভাষা কি আশ্চর্য কৌশলে সে ভাষার নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলে; সে ভাষায় কতকগুলো মূলধ্বনি কি ভাবে শব্দ তৈরী করে; শব্দের মধ্যে সেই ধ্বনিগুলো কেমন ভিন্নভাবে উচ্চারিত হয়; একটি

ধ্বনি শব্দের আদিতে, মধ্যে ও অন্তে কখন আসে কখন আসে না ঃ এক শব্দ ভাষার অন্যান্য শব্দের কতকগুলোর সংগে ব্যবহৃত হয় কতকগুলোর সংগে ব্যবহৃত হয় না—বাক্যে শব্দবিন্যাসের (Grammatical) দিক থেকে কত রকমের প্রকারভেদ হ'তে পারে, অভিধানে একটি শব্দের যে অর্থ, বিভিন্ন পরিবেশে সে শব্দটির উক্ত অর্থের কত রকম-পরিবর্তন হতে পারে এবং সমাজ জীবনের এক একটি মুহূর্তে সমাজ মনের এক একটা বিশিষ্ট দিক পরিস্ফুট করে তোলার সময়ে শব্দের কত বিভিন্ন প্রয়োগ হতে পারে,—বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞান এ-পথ ধরেই আজ ভাষার পঠন-পাঠন করছে।

মানুষের জীবনের সংগে সম্পর্কশূন্য অতীতের রেকর্ডপত্র ও বই-পুস্তক থেকে কতকগুলো শুকনো শব্দের ইতিহাস ও রূপবর্ণনাই হাল-আমলের ভাষাবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য নয় ; ভাষার মাধ্যমে মানুষের সমাজ-মন ও সমাজ জীবন কত ভাবে বিকশিত হয়েছে, সমাজের সে অন্তহীন গতি-প্রগতির মূলানুসন্ধানই আধুনিক ভাষা বিজ্ঞানের (sociological linguistics—এ-নামও চলে) মূল লক্ষ্য।

ভাষাবিজ্ঞানের এতখানি অগ্রগতির পরও W. Allen-এর আপত্তির কারণ অন্যত্র। ভাষার ক্ষেত্রে ডঃ শহীদুল্লাহ বা ডঃ এনামুল হকের একনায়কত্বের কারণে যে ভীতির প্রশ্রয় দিতে হয়, সেই একই ভয়ে আৎকে উঠতে হয় যখন শুনি দাক্ষিণাত্যের ভাষাই পৃথিবীর মূল এককভাষা। কারণ পুনা বা মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা-গবেষকগণ রাশিয়া বা তুরস্ক ভাষা সম্পর্কেও একই মতধারীদের মত ও মতাদর্শ খণ্ডন করেছেন এবং তার জন্য তাবৎপ্রমাণে এঁরা বিজ্ঞানেরও আশ্রয়ী, খেলো যুক্তি এটা নয়। তেমনি গোলাম মোস্তফার, ইদানীংকার যুক্তি যা সুফিয়ানকেও লজ্জা দেয়—সে যুক্তিতে বেপথুমনা প্রশ্রয় পেয়েছে এ-কথা আমরা কেন, Allen-ও কি বলতে পারবেন ? ফিলসফিই কি এর জন্য দায়ী নয় ?

ফিলসফির শাখা 'ব্যবহারবাদের' প্রতিপালকদের বিরুদ্ধেও Allen-এর বক্তব্য আছে। বিশেষতঃ ব্লুমফিল্ডের সংগে তিনি ভাষা বিষয়ে একমত নন, কেননা বিহেবিয়ারিষ্টদের ব্যবহারে ভাষাকে মনে হতে পারে একটা সমস্যা যার সমাধান-করে এদের পরীক্ষা-নিরক্ষার হেতু অসামান্য। দুই প্রান্তে দুই জটিল প্রশ্নকে রেখে এরা মধ্যের গতিটাকে রেখেছে রুদ্ধ করে।

তবে ভাষার মূল উপাদান সম্পর্কে এরাই প্রথম জিজ্ঞাসা আনে, যেখান থেকে অনুমান করতে পারি, ইউরোপীয়দের কর্তৃক প্রাচীনতম সংস্কৃত ব্যাকরণ উদ্ধারের ঘটনাটাকে এরা হেসে উড়িয়ে দেন নি বলে Comparative philology, Historical Philology এবং Descriptive philology ভাষা আলোচনার এ তিনটি স্তর আজ তিনটি দিক বা মাত্রা হতে পেরেছে – আজ এরা সমান্তরাল গুরুত্বে আলোচনার দাবী রাখে।

Allen যখন বলেন, ইংরেজী Zero শব্দকে পানিনী 'লোপ' না বলে Mathematical সংজ্ঞা শব্দে গ্রহণ করেছেন – এ কথায় আমরা পানিনীর বিচার-বোধ সম্পর্কে শ্রদ্ধান্বিত হয়ে পড়ি সত্য, কিন্তু ভাষা বিচারে Allen ভাষার চেয়ে শব্দের প্রতি ঝোঁক দেওয়াতে Phonic ধারণার পূর্বে একটা Hypothetics-এর ধারণায় আমরা সহজেই উপনীত হই – কল্পনা এখানে শব্দের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ধ্বনি তোলে, কিন্তু শব্দকে পাখা মেলে উড়তে বলে না। 'লোপে'র যে ভাষা বিস্তার ছিল, 'শূন্য'র তা নেই—একটা ভোঁ। হয়ে বুঁদ হয়ে পড়ে, অন্যটা বুঁদ হয়ে ক্রমে বোধোদয় ঘটায়। Bloomfield প্রভৃতি ব্যবহারবাদীরা এই কথাটা অস্পষ্ট আকারে প্রথম ধরেছিলেন—Bloomfield's system বলে এককালে (বেশীদিন হয়নি যদিও) তাই বিখ্যাত ছিল – আজকে Allen প্রমুখরা তার দোষ ধরিয়ে দিয়েও লোকসাধারণের দিক থেকে সেটিকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন মাত্র। কিন্তু Bloomfield's system মাত্র Philosophical, আর Allen-মতবাদ Mathematical—বোধকরি লেখকের এ উক্তি ভুল নয়। অর্থাৎ এ্যালেন সাহেব লোক-সাধারণদের যতই টানুন তাতে ভয়শূন্যতা কাটে না।

শব্দের ইতিবৃত্ত

শব্দের মধ্যে থাকে শব্দের অর্থ, যার ব্যঞ্জনা বহু। এই ব্যঞ্জনার কারণে শব্দার্থ ভাষা-বিজ্ঞানীর কৌতুহল বাড়িয়ে চলেছে। যেন সে এলিসের রাজ্যের সেই গেছো বিড়ালের হাসি—যে হাসিটা থেকে বিড়ালটা লা-তল্লাশ হয়ে পড়ে। ফলে, এই হাসি একটি বিশেষ গুণগত প্রবৃদ্ধির কারণে কেবল রূপগত সত্য হয়েই ঝুলে থাকে না, সে মনকে এবং বিচার-বোধকেও এগিয়ে নিয়ে যায়।

বস্তুতঃ শব্দ মানুষকে বুদ্ধিচর্চায় আগ্রহী করে। অর্থবান শব্দ যুক্তি অথবা বোধে উদ্দীপ্ত করে, কখনও কৌতুহলী করে। এ কথাটা বোঝা যায় যখন দেখি যে, মানুষ স্বাভাবিক ভাবেই বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা ও ভাষার আঞ্চলিকতার নিয়ম নীতিকে শিক্ষার কৌতুহল নিবৃত্তির উপাদান হিসাবে চলমান জীবনের অঙ্গীভূত করে নিয়েছে। এর জন্য প্রাচীন টাওয়ার অব ব্যাবেলের চূড়ান্ত নির্দেশ কি ছিল সে কথা স্মরণ রাখেনি। এটা মানুষের মজ্জাগত। ভাষার রকমফের মানুষকে কেবল স্বতন্ত্রই করে না, স্বাতন্ত্র্যও দেয় এবং উল্টোউল্টিও, অর্থাৎ মানুষের আপন স্বাতন্ত্র্য ও স্বতন্ত্রধারার জীবন এই প্রকাশ মাধ্যমকে প্রভাবিত করে পরিবর্তিতরূপের প্রবাহে ফেলে নিয়ে গিয়ে। এবং সবচেয়েই জটিল ও তত্ত্ববহুল প্রশ্নগুলি শব্দ এবং শব্দার্থ থেকেই পাওয়া গেছে বলে কেবল এর বিচারেই মানুষের ইতিহাসকে তুলে ধরা সম্ভব। সুকুমার সেন স্পষ্টই বলেন, "ইহা হইতে মানব মনের চিন্তাধারার বিবিধ ও বিচিত্র বিসর্পণের নির্দেশ পাওয়া যায়।"

শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে ধ্বনিতাত্ত্বিক ব্যাখ্যাটাই (পদার্থবিদ্যার দান স্মরণ করেও) বোধ হয় সম্পূর্ণতার কাছাকাছি, তবু সেইটেই এই সম্বন্ধে শেষ কথা নয়। Pro এবং Pre-Plato, pre-Hegel, pre-Darwin এবং আধুনিক নানাতত্ত্ব

ও তর্কবাগীশগণের কল্পনা, প্রতিকল্পনা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরেও ধ্বনি ও শব্দের বা ধ্বনিতত্ত্ব ও শব্দতত্ত্বের মূল্যায়ন শেষ হয় নি, অবশ্য এতে আশ্চর্যের কিছু নেই এবং আজ যদি আবার Plato-র বক্তব্যকেই সরাসরি গ্রহণের কথা ওঠে, তাহালেও তাকে ঠেকাতে পারা যাবে না।

ধ্বনিগুলি স্পষ্ট অথচ অদৃশ্যভাবে জড়িয়ে গিয়ে এক একটা জড়ানো ধ্বনিপিণ্ড বা ধ্বনি গুঞ্জরণের বৃহৎ বা সমবায় প্রকাশে এক একটা স্পষ্ট অর্থের প্রতীক শব্দ হয়েই বাধা পড়ে মনে, তাই মানুষ ধ্বনিকে বাড়িয়ে ধ্বনিকে ছাড়িয়ে এসেছে শব্দের জগতে ; গড়ে তুলেছে ভাষা। ভাষা নিয়ে বিচার করতে বসে এই কথাটা বিস্ময় বলেও মনে হতে পারে।

'লাল' থেকে 'লাল-লাল'-এ আসতে একটা বোধের প্রয়োজন এই বোধেই ইংরেজীতে আর Red.Red বলা হয় না, শব্দের বিস্তার ঘটায়। তরু, গাছ, বৃক্ষ প্রভৃতি একই বস্তুবাচক শব্দগুলির ক্ষেত্রে লক্ষ্য করেও দেখা যায়, এ-শব্দগুলি কেবল ধ্বনির অত্যাচারই নয়, ধ্বনির নিয়ম, আরো বেশী—শব্দের বা প্রকাশের নিয়ম। অতএব, শব্দের প্রতি আমাদের খোলাখুলি বা সরাসরি আমন্ত্রণও রয়েছে। এবং তা অনিয়মিত নয়।

প্রকৃত, শব্দ আমাদের direct বা সরাসরি অভিব্যক্তির প্রয়াসজাত। এই প্রয়াস একক, আবার সামাজিক ভাবেও ঘটে।

শিশু যে ভাবে ভাষা আয়ত্ত করে, সেইটে একটু লক্ষ্য করলেও তার কিছুটা আভাস জানতে পারি। বন্ধুর মেয়ে সানু আমায় সেদিন বললে, 'বমলা আনন্নি' এর অর্থ, যে তার সাথে মেশেনি, তার কাছে অস্পষ্ট এবং এটা তার কাছে ধ্বনির স্বেচ্ছাচার বা প্রয়োগ ভিন্ন আর কিছু মনে হবে না। কিন্তু সানু যখন বড় হয়ে বলবে 'কমলা আনলেন না'? - তখন সবাই তা বুঝবে। কারণ শব্দ থেকে তখন সে তার সেচ্ছাচারিতাটুকু ফেলে দেবে সামাজিকতার খাতিরে এবং উচ্চারণের ক্ষমতা অর্জনের আনন্দে। প্রকাশ-মাধ্যমে এবং এর নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা নিপুণ মানুষের অর্জিত সম্পদ, হাতিয়ার।

শব্দের মৌল ধর্ম : তাৎপর্য :

এই নিয়ন্ত্রণবোধ শব্দের বিবর্তনলাভের ইতিহাসে এক দুর্বোধ্য ও জটিল প্রশ্ন। নিয়মনীতি অবশ্য একটা থাকার কথা, কেননা ঐক্যবোধ সমাজ ইতিহাসের এক অবশ্যম্ভাবী ও অপ্রতিরোধ্য সূত্র। বিভিন্ন সূত্রের কারণে শব্দ ক্রমে একটা তত্ত্বগত আলোচনার অধীন হয়।

চিরকাল শব্দ অপকেন্দ্র ও অভিকেন্দ্র ধর্মে প্রতিষ্ঠ না হয়ে দ্রব এবং ফলিত। শব্দার্থ গ্রহণে তাই শব্দ খুবই অন্বয়ী এবং উচ্চারণেও বিবৃতিমূলক।

সংবৃত ও বিবৃত স্বর এবং ব্যঞ্জন ধ্বনির মিলিত প্রয়াসে শব্দ সৃষ্টি হয়। তবে শব্দের মেরুদণ্ড তার উচ্চারণ অর্থাৎ উচ্চারক (organs of speech)-নিয়ন্ত্রিত তরঙ্গাভিঘাত। শব্দের মৌলঅর্থ একটি তরঙ্গ যা বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন অর্থের দ্যোতনা পায়। শব্দ বিবৃতির কারণে উচ্চারণের একটি মৌলভঙ্গীতে সে স্পষ্ট এবং একই মুহূর্তে একটি অর্থের ওঠানামার কারণে উচ্চারণে সে কিছু সংযোজন-বিয়োজন (অভিকেন্দ্র অপকেন্দ্র তত্ত্বের সামান্য-সত্যতা) ঘটায়। পাখীর গানে ট্যা ট্যা ট্যা, শিশুর মুখে দা দা দা এবং অর্থবোধক 'দাদা' শব্দের মধ্যে তফাৎটাও এই আন্তকেন্দ্র বহিঃকেন্দ্র তরঙ্গাভিঘাতের ফলে শব্দার্থকে কোন্‌টা কত মৌলসম্বন্ধ বিশিষ্ট করেছে সেইখানে। পাখীর গানে ও শিশুর মুখের ধ্বনিতে তরঙ্গাভিঘাত স্বেচ্ছাকৃত হলেও বিভিন্ন পরিবেশে তা বিভিন্ন অর্থের দ্যোতক। শব্দে এই রকম অর্থাভিঘাত জন্মালে তাকে অপশব্দ না বলে অপকেন্দ্র তরঙ্গাভিঘাত জাত শব্দ বলতে পারি। এবং তা অর্থের দিক থেকে যে বিভিন্ন স্তরের নির্দেশ করে তা অনিয়মিত। তার নির্দেশ থাকে বহিঃকেন্দ্র, শব্দ উৎপাদন তার বহিঃধর্ম।

কোন জরুরী মুহূর্তে কোন শব্দ না খুঁজে পেলে আমরা এই ধরনের শব্দ ব্যবহার করি, বলা চলে শব্দের প্রকাশলাভে চাপ দেই। নিয়মিত অর্থ সম্পাদন করেও কোন কোন শব্দ এই বহিঃধর্মকেই রক্ষা করা চলে, যেমন ছড়ার শব্দ।

এই ব্যতিক্রম ছাড়া সকল শব্দ অভিকেন্দ্র ও নিয়মিত শব্দ যেখানে কেবল ধ্বনিতরঙ্গের অধীন নয়, তরঙ্গের নিয়ন্ত্রণে শব্দ পূর্ণ। বিভিন্ন স্তরনির্দেশক যে বিভিন্ন কালের বর্ষার পলি পড়ে এসে সেই উর্বর পলিলভূমিতে অর্থের সোনা

ফলে। কিন্তু অর্থ এক বরনারী, অভিমানী, ভানুমতী ; শব্দকে তাই তার মন যোগাতে হয়। ফলে শব্দ নিজের দিক থেকে প্রায়শঃ দুর্বল এবং 'অর্থ' এক মায়াবী মরীচিকা। সুন্দর শব্দ মাত্রেই তাই কাব্যগত প্রাণ। শব্দ এইভাবে narrative না হয়ে descriptive হয়ে উঠেছে।

আধুনিক ভাষাতাত্ত্বিকগণ যাঁরা কোন 'ডগমা'তে বিশ্বাসী নন তাঁদের মতে শব্দ অনিত্য ; এর ব্যবহারবিধিও তাই। আধুনিক পাশ্চাত্য মহাদেশের ভাষাগুলির বিবর্তন লক্ষ্য করেও তাঁরা বলেছেন যে, এই সব ভাষার অধুনা ভাষাগুণ সাম্প্রতিক (সংস্কৃতের সংগে আমাদের ভাষা তুলনীয়) এমনকি তুর্কী, স্পেন প্রভৃতি বৈচিত্রশালী (যেমন Agglutinating বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ইত্যাদি) ভাষাগুলির ভেতরেও যে ঘুণ ধরেছে তার কারণ এক সমতলে ভাষার এক বিশেষ ভূমিতল রচনার প্রয়াসে ভাষা বিজ্ঞান-ভিত্তিক হতে চাইছে, আরো স্পষ্টতঃ এ ভাষায় 'as accessible to all, not as the prerogative of a few' এই আন্দোলন গড়ে উঠছে। চীনা ভাষার তীরে গিয়েও এই ঢেউ লেগেছে আজ। অধুনা চীনা ভাষার যে ব্যাকরণ লেখা হচ্ছে তাতে শব্দের তাৎপর্য এই ঃ

শব্দ দুই প্রকার ঃ ক) পূর্ণ শব্দ, খ) অসম্পূর্ণ অর্থবাচক শব্দ।

ক) পূর্ণ শব্দ দ্বিবিধ—

১। চরিতার্থ এবং প্রচল ঃ যেমন ক্রিয়াবাচক শব্দ ইত্যাদি।

২। নির্দিষ্ট অর্থবোধক ঃ যেমন বিশেষ্য বা নাম-শব্দ ইত্যাদি। এ গুলিকে প্রাণাত্যয়ী শব্দও (dead) বলে।

খ) অসম্পূর্ণ শব্দ অসম্পূর্ণ পদও ; যেমন, আশ্রতন সংখ্যানির্দেশক বা অব্যয় বাচক শব্দ। এগুলি গৌণ শব্দ।

অতএব, চীন, পাকিস্তান ও ইউরোপের কয়েকটি শব্দ নিয়ে এই রকম একটা তুলনা দেখাতে পারি ঃ—চীনা ভাষায় ta একটি পূর্ণ শব্দ বিধায় বিশেষ্য, বিশেষণ ও ক্রিয়াতে এর মাত্রাভেদ বা আঙ্গিক পরিবর্তন নেই ; অর্থাৎ

আমাদের বড়ত্ব, বড় এবং বড় করা ওদের একই শব্দ ; ইংরাজীতে bigness, big এবং enlarge.

বিশেষ্য, বিশেষণ ও ক্রিয়াপদের ব্যবহার বিধির এই বৈচিত্র্য অনুধাবন করে শব্দ কি ভাবে ব্যবহৃত হয় তার ব্যাকরণে অনেকের উৎসাহ আছে। কিন্তু আগেই বলেছি শব্দ অনিত্য ; আমরা আরো বলতে পারি ভাষার প্রবাহ থেকে শব্দ অধরাও। পৃথিবীর তাবৎ ভাষা যে এক ছিল না তার প্রমাণ নাই ; তবু বাংলার (চিঠি) ডাক ধরানো, ডাকে ফেলা, ইংরেজিতেঃ—Mail this letter, put this letter in the Mail এবং put this letter in the Mail box, এবং ইউরোপেরই অন্য ভাষায় Impostare, Posta এবং postale হয়। এই দিক থেকে শ্রেণীকরণের চেষ্টা করলেও যে শব্দের কাছে হয়রান হতে হয় তার স্বপক্ষে পি-র এই মন্তব্য অনুধাবন যোগ্যঃ 'the classification in shifts from language to language ; it may be far more complicated in one language than in another and in some languges may be completely non-existent.'

। শব্দ একটি কাজ।

বাংলায় শব্দ প্রকরণে তৎসম-তদ্ভব-দেশী শব্দের উল্লেখ আবাল্যশ্রুত। শব্দের এইরূপ জাতি বিচার বা নির্দেশ একরূপ আভিধানিক প্রকরণ। এই প্রকরণে শব্দের প্রকার, পদবিভেদ, লিঙ্গ, বচন, ব্যুৎপত্তি ইত্যাদিও আলোচিত হয়। আমাদের আলোচ্য প্রসঙ্গ অত ব্যাপক নয়।

প্রাচীন শব্দশাস্ত্রে (যেমন রূপতত্ত্ব বা Morphology ইত্যাদি) শব্দের সমৃদ্ধিই ছিল প্রধানতম বিষয় ; একালে Phonetics, Tonatics ইত্যাদি বিজ্ঞানে 'শব্দ' নতুন আলোচনার দিগন্ত ছুঁয়ে এক বিশেষ তাৎপর্য লাভ করেছে। যন্ত্রগত জগতে 'শব্দ' যান্ত্রিক পরীক্ষাগারের বিষয়। এখানে সে আলোচনাও আমাদের নয়।

পূর্ণ কলাকৌশলের কাজে একটি শব্দ যখনই উচ্চারিত হয়, তখনই সে এক বিশেষ কারুকার্য সম্পন্ন হয়ে উঠে। মাত্রা, গুণ ও অর্থবোধের প্রকাশে শব্দ বিশেষ ধর্ম-

বিশিষ্ট ; শব্দ স্বরফলিত এবং প্রশ্রুত। প্রশ্রুত শব্দ বিশেষ গুণোপেত শব্দ : এশব্দ অবৈজ্ঞানিক ধ্বনির নিয়মিত প্রতিধ্বনিধারক এবং নির্ধারক। টান, সুর ও ভাবাবাহন তার বৈশিষ্ট্য। অপভাষা ও কোন কোন উপভাষার শব্দমালায় এগুণ বর্তমান। ইংরেজীতে Tonal বললে এর কাছাকাছি অর্থবোধক শব্দ পাওয়া যায়।

স্বরফলিত শব্দ (varried accented) ইংরেজী ভাষার এক বৈশিষ্ট্যব্যঞ্জক সম্পদ। বাংলা শব্দে স্বরফলন কদাচ ঘটে, কেননা, বাংলা শব্দে প্রতি অক্ষরই স্বরমিত অর্থাৎ বাংলা শব্দ স্বরমিতি প্রয়োগে গুণমান ; তবে শব্দের প্রথম ধ্বনি স্বরাঘাত পায়। অতএব বাংলা শব্দ বিকল্পে স্বরক্ষরিত।

স্বরফলিত শব্দে স্বর পূর্ব নির্ধারিত—হসন্তান্তিক হলেও এবং না হলেও। বাংলা হসন্তান্তিক শব্দ সেইদিক থেকে সম্ভাবনাময় ; অর্থ পার্থক্য না ঘটিয়েও স্বরের যোজনায় ও বিয়োজনে এই শব্দ প্রপাত বিশেষ, এইজন্য একে প্রপাত শব্দ বা ধারা শব্দ বললে অতিরিক্ত হয় না। ত্বড়াগতিক (ready response অর্থে) ও প্রাতিগতিক (rebound অর্থে) ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যে এ শব্দ আকর বিশেষ।

শব্দে যে চিত্রোদ্বোধক শক্তি থাকে সেইটাই শব্দকে করে তোলে কল্পতরু ; এটাই শব্দের লীলা। শব্দলীলাই শব্দকে পূর্ণায়ত করে। ইংরেজী শব্দ সহজে পূর্ণ। বাংলা শব্দ লীলার গৌরচন্দ্রিকা—পালায় এখনও নামে নাই। বাংলা এখনও নবীনা ভাষা।

স্বরফলিত শব্দ তিনটি বৈশিষ্ট্য অর্জন করেঃ প্রস্বর (stress), মৌলস্বর (Pitch) ও স্বরকাল (duration)। এর ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে Alpha-phoneme theory। শব্দ তার এই তিনটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য অর্জনের কালে কতকগুলি নিয়মের অধীন থাকে, যেমন, সম, মৌলস্বরে কোন পরিবর্তন সূচনাকালে-এর ঘনত্বের পরিবর্তন এবং প্রেরণার কারণে যে দ্যোতনা জাগে তার রকমফের। এই নবতত্ত্বের আর একটি উপতত্ত্ব গড়ে উঠেছে দুই মৌলস্বরের জটিল আবর্তের ফলে উদ্ভূত দুই স্বরের মধ্যপ্রান্তিক বিরতির সমস্যা নিয়ে। প্রদত্ত কোন ব্যঞ্জনস্বরের চেয়ে স্বতোৎপাদক স্বরের ক্ষেত্রে এর এই তত্ত্বের সত্যতা রীতিগত দিক থেকে অনেক স্পষ্ট।

Intelectual laws of language শব্দের আর এক রকম ব্যাখ্যা। শব্দ প্রবক্তস্বরের কর্ম এবং গুণফল। ফলে শব্দের কৃত্রিমতা ও স্বতোৎসারিত ধর্ম আসে। ইচ্ছাকৃত অথচ অসচেতন মুহূর্তে শব্দ স্বতোৎসোরিতা গুণ অর্জন করে আর প্রকাশের ব্যয় সংকোচনের ও শিল্পসমৃদ্ধির জন্য শব্দ কৃত্রিমতা গুণের অধিকারী হয়। এরই ভিত্তিতে বলা চলে শব্দ ক্ষয়িষ্ণু এবং শব্দ বর্দ্ধিষ্ণু। মৃগ এবং মৃগরাজের অর্থে কালি এবং কালোকালির অর্থে, গঙ্গা নদী এবং গঙ্গা (নদী) অর্থে শব্দের এই পরিচয় ব্যাখ্যাত।

শব্দ বিশ্লেষণধর্মী এবং আশ্লেষণধর্মে শব্দ আর 'একক' নয়, এককসমষ্টি— ধ্বনির মাত্রা ও ব্যঞ্জনাই সেখানে মুখ্য। আশ্লেষ ধর্ম শব্দের গোঁড়ামী স্বভাব।

কিন্তু শব্দ কেবল ঘোষক নয়। উৎপাদন হিসাবে তার ব্যাকরণের হিসাব হয়ত নির্ভুল নয়, উদ্দেশ্য বাচক হিসাবে তার নিয়ন্ত্রণ প্রকরণ বিভিন্ন ভিন্ন-সমস্যার উদ্‌গীরক। শব্দের এই দিকটাতে শব্দ অঙ্গবাচক সুতরাং সংকল (lexical) ধর্মীও। তবে শব্দ দেহে এবং অর্থে বেড়ে উঠেছে, তবেই ভাষার প্রতিধ্বনিকে স্থায়ী করেছে নিজ অঙ্গে; সম্পদ হিসাবে এবং নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে স্পষ্টতা অর্জনের ক্ষেত্রে শব্দ প্রতিক্ষণ প্রতিরোধহীন এবং শাব্দিক-মানে উত্তীর্ণ হবার চেষ্টায় সে নিয়ত পরীক্ষা নিরীক্ষার মুখে প্রতি-উন্মুখ

শব্দে অর্থের কাজও সামান্য নয়; কিন্তু অর্থবোধ এবং অর্থবোধের অভাব এই বিশেষ প্রক্রিয়ার শব্দ বিভিন্ন। অর্থবোধ সমোচ্চারক ও ভিন্নোচ্চারক শব্দে অর্থবাচক ও নেতিবাচক তাৎপর্য নিয়ে এবং অর্থবোধের অভাব শব্দে 'শব্দ-শূন্যতা' নিয়ে—যেমন আন্দামানে কোন সংখ্যাসূচক শব্দের অস্তিত্ব নেই, না জেরু না বিআ (Bea) না অন্য অঞ্চলের ভাষায়, ফলে 'প্রচুর' এবং বিপরীতে 'খুবকম' প্রভৃতি এই রকম অর্থসম্পন্ন স্থুল শব্দ দিয়ে শব্দের ব্যবহারকে তারা এগিয়ে নিতে চেষ্টা করেছে।

শব্দে শব্দে যোজনা

দাঁড়ের ময়না কয়না কথা ঃ এটা একটা বাক্য, কিন্তু বাক্য হিসাবে কিছু অভিযোগ এর বিরুদ্ধে থাকবেই। বাক্য যদি মনোভাব প্রকাশেই শেষ হোত তবে এ অভিযোগ উঠতো না, কিন্তু বাক্য কথা বলে শব্দে এবং শব্দের প্রয়োগে নিয়মিত ব্যাখ্যা আছে।

এই ব্যাখ্যার দ্বিবিধ তাৎপর্য লক্ষ্য করা যায় শব্দের দিক থেকে ঃ

(ক) শব্দ ধ্বনিভিত্তিক

(খ) শব্দ স্বাধীন

দাঁড়ের ময়না কথা বলে না ঃ এ ভাবে শব্দের প্রয়োগটাই বাঞ্ছনীয়, কিন্তু শব্দকে প্রয়োজনের খাতিরে ধ্বনিভিত্তিকও হতে হয় ঃ দাঁড়ের ময়না কয়না কথা।

আমরা অন্যত্র বলার চেষ্টা করেছি, শব্দ একটা প্রকাশ মাধ্যম, যেমন ইতর প্রাণীর জন্য ধ্বনি। আমরাও 'ধ্বনি' ব্যবহার করতাম কোন প্রাগৈতিহাসিক কালে, সে যুগকে অতিক্রম করে 'শব্দের' যুগে এসেছি। সুতরাং আমাদের ব্যাকরণ পানিনীর ব্যাকরণ নয়; ব্যবহারবাদীরা আবার আরো দূর এগিয়েছেন—শব্দ মানে কিসের শব্দ এবং শব্দ মানে কোন কোন ধ্বনি এ দুই-প্রশ্নের তফাৎটা **Democracy** এবং **Aristocracy-র**; এইজন্য ওরা সাধারণ 'ব্যবহারও প্রশ্নের' ক্ষেত্রেই 'শব্দের' তাৎপর্যকে ধরতে চান। বাক্য ও ভাষাতেও।

আমরা মাঝামাঝি রকম বলতে পারি, শব্দ ধ্বনিও নয়, ব্যবহারগত প্রকাশের কিম্বা মাধ্যমও নয় বা মিশ্রধ্বনির ব্যাকরণগত সামঞ্জস্য প্রকৃতিও নয়—শব্দ একটা **Art, Art in itself**। যখন তখন যে কেউ যে কোন শব্দ ব্যবহার করতে পারি না। শব্দ ব্যবহার জানতে হয়, এবং ধ্বনি ব্যবহারের সঙ্গে এর মিল রক্ষার কারণটাও জরুরী মনে করি না তাই—নিদ না নীদ, ই না ঈ তা শব্দ নিজেই

বলবে। শব্দের বানানে শব্দ নয়, শব্দ-গুণেও শব্দ নয়—শব্দ গুণে, উচ্চারণে এবং চিত্রে। এজন্য অশিক্ষিত জনের শব্দ এমন কি উপভাষার শব্দ ও মূল বা শিক্ষিত-জনের ভাষার শব্দে চারিত্রগত পার্থক্য আছে। এ পার্থক্য বাড়ছে এবং বাড়বে। এখানে বলা যাক, শিক্ষিতজনের ভাষা আর সাহিত্যের ভাষা এক নয়। সাহিত্য চিরন্তন, যদি মহৎ হয়।

বংকিম বলেন যে, অধুনা বাংলায় সাধুভাষা ও চলতি ভাষায় যত পার্থক্য, পৃথিবীর অন্য কোন ভাষায় অতখানি পার্থক্য নেই। বংকিম ভাষাস্রষ্ট ছিলেন, অতএব এটা তাঁর চোখে ধরা পড়েছে। রবীন্দ্রনাথ আরো পরবর্তী যুগের। তিনি ভাষার মৌলিক প্রশ্নটা শব্দ থেকে তুলে ধরতে চেয়েছেন, তাঁর 'শব্দতত্ত্ব' তার প্রমাণ।

মূল প্রশ্নে ফিরে আসি। শব্দ এলিসের রাজ্যের সেই গেছো বিড়ালের হাসি যে হাসিটা থেকে বিড়ালটা লা-তল্লাস হয়ে পড়ে। ফলে এই হাসি একটি বিশেষ কোয়ালিটিতে গড়িয়ে গিয়ে ছড়িয়ে পড়ে ভুবনে আর এলিসের (পাঠক ?) মনে। ভাষা-বৈজ্ঞানিক এই কারণেই শুধু শব্দকে কেবল অর্থমরীচিকার মধ্যে ফেলে রাখেন নি বা ধ্বনির বিপুল তরঙ্গ স্রোতের তরী বলে ভাসিয়ে দেন নি। একটা শক্তির আধার ও উৎস রূপে শব্দকে দেখার জন্য পদ্ধতি খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

যিনি বলেছেন শব্দই ব্রহ্ম, তিনি বড়ই মিথ্যা বলেন নি। শব্দেই জগৎ এবং সৃষ্টি সার্থক।

চোখে চোখেও কথা হয়, Innumerable bees যে গুঞ্জন তুলতে না পারে চোখের নীরব ভাষায় সে মধু গুঞ্জরণ জাগে ; বোধ হয় এই কারণেই,

নয়নের সলিলে
যে কথাটি বলিলে,
রবে তাহা স্মরণে
জীবনে ও মরণে ।।

অথবা

শরম যদি যায় ছুঁয়ে মন নীরব কেন তবে
চোখে চোখে তখন শুধু সকল কথা হবে ।।

এই 'সকল কথা' বা 'যে কথাটি বলিলে'—হয়ত তার শেষ নেই। কিন্তু এ ভাষাতো প্রকাশ্যের নয়ঃ এ যে কপাটের আড়ালে আড়ালে বলার অথবা জীবনের মধুলগ্নের ভাষা শুধু এ। বনচারীদের জীবনেও এ ভাষা সুলভ, ঘন পাইনের, কত চাপাইলাস 'মেহগিনির গোড়ার শক্ত মাটির চারপাশে কাঁটাঝোপের ইতি-উতি আড়ালে, ঐ বেতস ফলের মতো কারো ড্যাবা ড্যাবা চোখের চিকণ কোণে।—এ ভাষায় ব্যক্তি বিশেষের দুর্লভ যন্ত্রণা বা আনন্দ সমস্ত পৃথিবীময় ছড়াতে পারে কিন্তু Democratic people যারা যুগ-যুগের ঘন কুয়াশা কেটে কবর খুঁড়ে খুঁড়ে জীবনের রক্তাক্ত প্রান্তরকে কত কুরুক্ষেত্র পানিপথের পর ১৯৪৪ উত্তর পৃথিবীতে নিয়ে এসেছে, তারা কেন তা মানবে? সুতরাং, তাদের ভাষা?

মানুষ আজ কথা চায়, যেন হাতিয়ার খোঁজে। রহমান বলেন, 'একরা বেস্মে' মানুষও করার করলো; ধর্মগ্রন্থ, সাহিত্য এলে মানুষের হাতে - মানুষের এর চেয়ে প্রতিষ্ঠা আজ পর্যন্ত আর কিছু নেই। একরারের অধিকারে মানুষ আজ মুখর, চঞ্চল। কথা আজ সমাজে, কথা আজ দুখাই ঘটকের চলচলাচল পথে—কথা আজ মনে: আর তাই সমস্ত ভুবনকে যে জড়িয়ে থাকে, শরম দিয়ে যে বলে কথা, আজ কেবল দৃষ্টিবানই তাঁর শেষ কথা নয়, তার অধিকার তার ভাষায়। ভাষা তাই সম্পদঃ বীর্য। প্রেম। আত্মরক্ষা ও আত্মসম্প্রসারণের গুপ্তমন্ত্র পেয়েছে মানুষ এই ভাষায়, এবং ভাষা উচ্চারণ করি শব্দে; অর্থাৎ শব্দেই আমরা কথা বলি, ভাষার কথা; শব্দেই আমরা পাঠ করি, ভাষার সাহিত্য এবং শব্দেই আমরা ভাষা লিখি, লেখার ভাষা।

ভাষা পরিবর্তনশীল কেন, প্রফেসর মুহম্মদ আব্দুল হাই তা বহুবার বলেছেন। ভাষাই শব্দকে টেনে নেয়, যতদূর পারে—তারপর শব্দ হয় 'বর্জিত সৃষ্টি'। নতুন word-building খেলার আনন্দ পথকে বাঁকিয়ে অনেকদূর নিয়ে যায়, তখন এই খেলায় Phonetic fescination, Extempore Phoneties, Phonetic values প্রভৃতি তত্ত্বের উদয় হয়, কেননা শব্দ তখন ধ্বনির প্রত্যক্ষতা (practical)-র বাইরে এবং দার্শনিকতা (Theory)-র আশ্রয়ী। প্রফেসার এ্যালেন ধ্বনির দার্শনিকতার বিরুদ্ধে, ব্লুমফিল্ড তাঁর সমালোচনার পাত্র। ফরাসী পণ্ডিত যুত জুলে ব্লস অশোক লিপিতে নতুন পঠন-রীতি প্রয়োগ করে অর্থোদ্ধারের চেষ্টা

করেছিলেন। ভারত মহাসাগরীয় বা দ্বীপের ভাষাগুলির পাঠক্রম আবিষ্কারেই বোধ হয় তিনি প্রথম ঐ ধরনের পরীক্ষা চালান। 'আন্দামানের ভাষা' আলোচনার জন্য শব্দপর্ব কি পরিমাণ সাহায্য করেছিল তিনি তা বলেছেন ; গণিত সংখ্যার সংগে এদের সম্পর্ক নেই, তুরস্ক শব্দগঠন প্রক্রিয়াদি এখানে আবর্তমান নয়, আবার এ ভাষা jargon ভাষা, মিশ্র বা Mixed language অথচ Agglutinating ভাষাবৈশিষ্ট্য নিয়ে স্পষ্ট তিনটি উপভাষায় তা' বিভক্ত। গ্রীয়ার্স'ন সাহেবের মতগুলি পাশাপাশি কত পুরানো মনে হয় নাকি? D. N. Bose-এর নতুন পদক্ষেপ তাই আজ কত সহজ। অথচ এদের দৃষ্টি আজ ধ্বনি-বিন্দু থেকে অনেক দূরে।

ঐতিহাসিক Rosette stone থেকে আলাওল-মসজিদের প্রস্তর লিপি পর্যন্ত সকল ভাষার আধুনিক পঠন পাঠনে বাধা কেবল ভাষার বিবর্তনে শব্দের নিশ্চিহ্নতা। ধ্বনি আজো আছে, শব্দের কারণে কিছু বদলেছে হয়ত, কিন্তু ধ্বনি পাওয়া গেলেও শব্দ পাওয়া যায় না। Rama ধ্বনি রাম কিনা, সেইটে জানার অপেক্ষার বহু ভাষা আজো লুপ্ত ভাষা।

এই অসুবিধা দূর করার জন্য একটি Interpretative law নিয়ে পরীক্ষা হচ্ছে, এটাকে বলে Intellectual law of language। শব্দগঠন যদি নিয়মিত হয়, তবে তিনটি বৈশিষ্ট্য অর্জন করবে সে ঃ

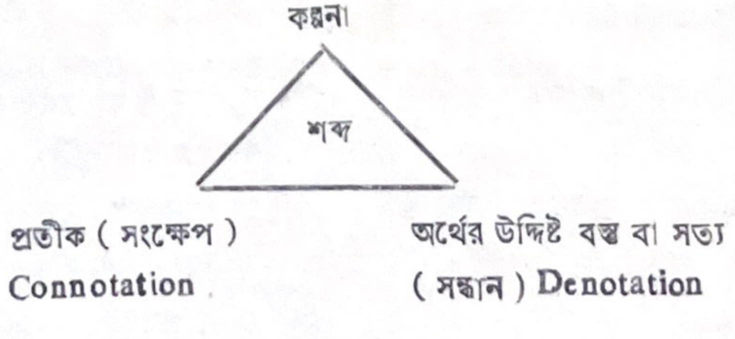

'কল্পতরু', শব্দটি বুদ্ধি আশ্রিত, কল্পনাশ্রিত, তেমনি সত্যাদর্শের সন্ধানে প্রতিষ্ঠিত। অতএব তার বিবর্তনে কল্প এবং তরু এই অক্ষর ভাগ এবং আরো পরে ধ্বনি ব্যবচ্ছেদ বড় প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন উক্ত তিনটি ক্ষেত্রে।

ফলে সংস্কৃত 'লোকাৎ' থেকে 'লোক' শব্দে আসতে, শব্দের এই পরবর্তী (Post position) ব্যবহার উক্ত রীতির ক্ষেত্রে একটি অবশ্যম্ভাবী প্রশ্ন।
তেমনি 'পুঁথি-পুস্তক' এই শব্দ বা শব্দদ্বয়ে বিভক্ত হয়ে সমার্থক সাম্যতা ঘুচিয়েছে; Intellectual laws-এরও ব্যাখ্যা খুঁজেছে একই নিয়মে।

আবার, ব্যাকরণিক ব্যবহারেও পরিবর্তন ঘটে, যেমন ধাতুরূপের পরিবর্তনে; গচ্ছতি ও যচ্ছতি উভয় শব্দের ছ একই উৎপত্তিগত নয়, কিন্তু কে বলবে যে পরেরটা সাদৃশ্যে গঠিত এবং Law of irradication (বিকিরণ) ঐ সাদৃশ্যে 'ছ'-এর কারণ। একে বলে "The transference of a grammatical termination from a word where it is used in its proper function, to other words where it is originally out of place."

অতএব, Intellectual laws of language তিন প্রকার, যথাক্রমে,

১। Laws of Specialisation
২। Law of Differentiation
৩। Law of Irradication

এবং বিশিষ্ট ব্যবহার, সমার্থকতার ভেদ, সৃষ্টি ও বিকৃতি গ্রহণের কারণে শব্দ প্রতি যুগেই সমস্যার হেতু বলে এই তিনটি খোলাধারে তার সমস্যাসৃষ্টির জটিলতাকে বিশ্লেষণ করা হয়।

এই I. L. L.-এর আর একটা কথা স্পষ্ট হয় তা এই যে, ধ্বনিপরিবর্তনই শব্দের পরিবর্তন নয়, ওটা বাহ্যিক পরিবর্তন; শব্দের প্রাণ বা আত্মা হচ্ছে তার অর্থের পরিবর্তন, প্রকৃতগত পরিবর্তনে I. L. L. এই শব্দার্থ পরিবর্তন এবং নিয়ন্ত্রণ করে। এই পরিবর্তন নিয়ন্ত্রণের বশে শব্দের চেয়ে অর্থের উপর চাপ পড়ে অধিক এবং শব্দ প্রসারিত, সংকুচিত ও পরিবর্তিত বা সংশ্লেষিত - এই তিন রকম অর্থ পরিবর্তন ঘটায়, উদাহরণ।

সংশ্লেষ : গজেন্দ্রগমন, লক্ষ্মী, স্বাতন্ত্র্য

সংকোচ : মৃগ, মোরগ

প্রসার : কালি, গঙ্গা

ভাষাতাত্ত্বিক হুইটনী (Whitiny) অবশ্য এ মত সম্পূর্ণভাবে মেনে নিতে পারেন নি। সে যাই হোক, শব্দ ও শব্দার্থের প্রশ্নে এ কথায় সবাই একমত যে শব্দ তার

অর্থচারিত্রে স্বপ্রকাশ। এই অর্থ মানুষকে ক্ষণে ক্ষণে নতুন থেকে নতুনতর জীবনের দিগন্তে উদ্ভাসিত করছে এবং অধিকতর অর্থস্ফুটকরার কারণে উচ্চারণ পরিবর্তনের দিক থেকে বা অর্থকে নিকটতর জীবনের সংগে সংযুক্ত করার দিক থেকে বা শব্দকে সমার্থক শব্দের নিম্নতর অর্থব্যঞ্জনার প্রভাব থেকে রক্ষা করে জীবনের অভিমুখে বাড়িয়ে দেওয়ার দিক থেকে–শব্দ বহুরূপা। অতএব শব্দ তার অর্থ পরিবর্তন, অর্থসংকোচ ও অর্থপ্রসারণ অর্থাৎ Transference of meaning, Contraction of meaning ও Expansion of meaning-এর আশ্রয় নিতে বাধ্য। এতে পুরাণো শব্দের স্থিতি নষ্ট হয়, কিন্তু হারিয়েও যা লাভ হয় তাও অনেক। আজ 'বেদে'র ক্রন্দসী শব্দ আছে কিন্তু সেই অর্থ নেই। তেমনি 'পক্ষর' শব্দ পক্ষরের মতই মাঠে মারা গেছে কিন্তু পক্ষীরাজ তো পেয়েছি মনের অর্থে রাজ্যের বিশ্বস্ত বাহন রূপে! এ কি কম লাভ? অর্থকে বাড়াতে পেরেই শব্দ রূপকথার সাহিত্যে এত ধনী।

এই দিক থেকেই শব্দের নতুন ব্যাখ্যায় শব্দের গৌণ ধর্ম (minor tendencies) গুলিও আজ আলোচনার বাইরে নেই, যেমন ঃ

সুভাষণ (Euphemism) ঃ

কল্যাণসূচক বা নিন্দনীয় অর্থবোধক প্রসঙ্গকে মার্জিত শব্দে প্রকাশ করা। বহু ব্যবহারে সেই সব শব্দ আবার নতুন শব্দের ব্যবহারের দাবী রাখে, যেমন ঃ

চাল নেই ঃ চাল বাড়ন্ত

অতি বোকা ঃ রাম বোকা

অবনতি (Degradation) ঃ

অনেক সময় বিশেষ শব্দের অর্থের অবনতি ঘটে, যেমন যবন, নেড়ে (বৌদ্ধ, এখন বাঙার্থে মুসলমান)

অনুসঙ্গ (Association) ঃ

পত্র (বৃক্ষপত্র) এখন পৃষ্ঠা, বা চিঠি–এই ভাবে সংশ্লিষ্ট ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে।

উৎপ্রেক্ষা (Metaphore) ঃ

কুলের দিক থেকে আগত বা বিপরীত দিকে প্রবাহিত বায়ুর ক্ষেত্রে প্রযুক্ত শব্দ অনুকুল বা প্রতিকুল এখন সুবিধাজনক বা অসুবিধাজনক অর্থে প্রয়োগসিদ্ধ আকার লাভ করে শব্দ অলংকার সুবিধা লাভ করেছে। কথার অর্থ সুস্পষ্টতার দাবীতে এ সুবিধা গ্রহণ চলে।

চট্টগ্রামের উপভাষা প্রসংগে

বাংলা ভাষার উপভাষাগুলির মধ্যে সিলেট, নোয়াখালী ও চাঁটগার উপভাষা কিছু স্বাতন্ত্রের অধিকারী। সিলেটি ভাষা 'টানের' দিক থেকে, নোয়াখালি দ্রুততার দিক থেকে ও চট্টগ্রামের ভাষা স্বরধ্বনিবহুলতা ও শব্দ-সংকোচন — সংক্ষেপিকরণের দিক থেকে আবার ভিন্ন। এই ত্রিবিধ উপভাষাই সীমান্ত অঞ্চলের ; ফলে পার্শ্ববর্তী পাহাড়িয়া ভাষার প্রভাবে বর্ধিষ্ণুও। এর মধ্যে আবার ঐ চট্টগ্রামের ভাষা সমুদ্রাগত বিদেশী সংস্কৃতির ঐশ্বর্যে-পুষ্ট। সিলেটি—নোয়াখালিতে Manner of Articulation অনেকটা বিদেশী রকমের। চট্টগ্রামের ভাষার উচ্চারণ প্রক্রিয়ায় সে ধরনের প্রভাব অত ব্যাপক নয়। সম্ভবতঃ ইসলামী সংস্কৃতিই তার একমাত্র নির্ভর ছিল না — মধ্যযুগের মুসলমানী বাংলা সাহিত্যের লীলা নিকেতন হয়েও।

প্রাচীন কাল থেকে চট্টগ্রাম তার দ্বীপাঞ্চল সহ নানা রাজনৈতিক উত্থানপতন লক্ষ্য করেছে। মধ্য যুগের শেষে পর্তুগীজ-ওলন্দাজদের প্রধান শিবির এই খানেই ছিল। বৃটিশযুগে ব্রহ্মদেশের সংগে চট্টগ্রামে যোগাযোগ অব্যাহত ছিল এবং তারও আগে আরাকানে মনিপুরে বাংলা সংস্কৃতির অবাধ চর্চা হোত—চট্টগ্রামে তার প্রভাব পড়ে থাববে।

এ ছাড়াও, চট্টগ্রামের সমৃদ্ধি ইতিহাস প্রসিদ্ধ। এর মলং, মাতামুহুরী ও কর্ণফুলী সুপ্রাচীন নদী। অতএব, অনুমান করা যায় যে, সিলেট ও নোয়াখালি ভাষা অপেক্ষা চট্টগ্রামের ভাষায় সংঘাত এসেছে প্রচুর। সংঘাত বলতে আমরা Assimilation, Dissimilation, Contamination ও ধ্বনি-অভিঘাত প্রাপ্তির অন্যান্য সূত্রের কারণ ঘটিত ঘটনাকেও বুঝবো। ধ্বনি-উচ্চারণগত প্রক্রিয়ায় বাধা না দিয়ে ধ্বনিগঠনে একটা 'বিলোপ-পন্থা'ও সম্ভবতঃ একটা

By-Product হিসাবে এখান থেকেই জন্ম লাভ করে থাকবে। তাই এ ভাষার Euphonic combination, Doubling sound এবং Intrusive sound (শ্রুতধ্বনি) বড় মোহকারী। —এ্যাত্তর (এতই), কঁত্যে (কখন) কডেত্তোন (কোথা থেকে) কইন্ন পার (কইতে পার না), কিরেল্যাই (কিসের লাগিয়া) প্রভৃতি উদাহরণ আনা যেতে পারে। স্থানের নামে, সময়ের উল্লেখে, প্রিয়বস্তুর নির্দেশে এমন কি রেগে গেল সাধারণ কথাতেও এই 'বিলোপ-পন্থা' দ্রুত কাজ করে। ফলে বাগ্‌ধারায় 'ধ্বনি' বিচিত্র রূপে ক্রিয়া করে কিন্তু শেষ 'ধ্বনিগুণ' ক্রমে ভাবানুসঙ্গতার নির্দিষ্ট হয়ে যায়। বিশেষ শব্দের ধ্বনি বিশেষ ধ্বনিগুণের অধিকারী—সিলেটির মত যে কোন বাক্যের প্রথম ও শেষ শব্দের টান রাখার নিয়ম এখানে অচল, নোয়াখালীর মত কতকগুলি অব্যয় ধ্বনি সংযোগ এখানে বৃথা। কৃতঋণ শব্দের মত কিছু প্রাচীন শব্দও (এমন কি পোষাকী শব্দ) এ ভাষায় বহুল ব্যবহৃত কিন্তু বাগ্‌ধারার বিপুল স্রোতে তার স্থান এ ভাষার খেয়াল মত হয়ে থাকে। বহু সংস্কৃত ও হিন্দী শব্দ এ ভাবে ঘুট পাকিয়ে এ ভাষায় অবস্থান করছে। অথচ অন্যান্য উপভাষায় মুল শব্দের আদি উচ্চারণ ঠিক থাকে অথবা পরবর্তি উচ্চারণেরই বিকৃতি ঘটে থাকে।

চট্টগ্রামের ভাষা সম্ভবতঃ এই সব কারণেই রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তবুও তিনি যে এই ভাষার ওপর বিশেষ কোন কাজ করে যান নি তার কারণ এই ভাষার মধ্যেই নিহিত আছে। বাইরে থেকে কোন বাঙ্গালীর পক্ষেই এই ভাষা বোঝা বা আয়ত্ত করা খুব সহজ নয়।

চট্টগ্রামের ভাষা সাধারণ বাঙ্গালীর জন্য একটি দূরবর্তী ভাষা। অন্যান্য উপভাষাভাষী যে কেউ একজন অপরিচিতের সামনে নিজের উপভাষায় কথা বলতে সংকোচ বোধ করবেন। চট্টগ্রামের লোকদের সে "কমপ্লেক্স" নেই। উপভাষাকে যে জন্য SLANG বলা হয়, এরা যেন তা কাটিয়ে উঠেছেন। ভাষা অনেকটা Agreement-এর মত; ভাষার অঞ্চলগত ভাগ এজন্য প্রায় অপরিহার্য। আঞ্চলিক ভাষারই যদি লেখ্যরূপ গড়ে উঠে (যেমন জাপান) তবে তার সমৃদ্ধি সকলকে ছাপিয়ে যায়। চট্টগ্রামের ভাষা সবাইকে ছাপিয়ে উঠতে পারে নি, তবে স্বতন্ত্র হতে পেরেছে। ধ্বনি উচ্চারণের

নিয়ম, শব্দসৃষ্টি ও কৃতঋণ শব্দের ব্যবহারে এবং বাক্য গঠনের বিভিন্ন পর্যায়ে এদের অনুসরণ সাধারণ বাঙ্গালীর পক্ষে আজ দুঃসাধ্য।

চট্টগ্রামের ভাষা মূল ভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন হবার সুবিধা পেয়েছে ঢের অথচ আপন নিয়মকে প্রকাশ করতে গিয়ে হাতের উপাদানগুলিকেই ব্যবহার করছে বেশী। শিষ্ট ভাষার বিকল্পে সৃষ্ট এই 'নব ভাষা' ক্রমে ক্রমে তার ভঙ্গীকে পরীক্ষামূলক অবস্থা থেকে অনেকদূরে নিয়ে এসেছে। চীন থেকে সরে যেতে জাপানী ভাষার অথবা জার্মান থেকে সরে যেতে ইংরাজী ভাষারও বোধ হয় এমনি সুবিধা ছিল। চট্টগ্রামের ভাষার তুলনায় আমাদের অন্যান্য উপভাষায় অর্জিত রূপের প্রতিষ্ঠার সাধন অল্প।

কিছু উদাহরণ সংযোগে এই উপযোগিতার কথা উল্লেখ করা যাক। ইংরেজী I do not go; SLANG – I not go; চাঁটগাঁয়ে—'অ'াই ন যাই'। রূপ-তত্ত্বের দিক থেকে বাক্যগঠনের এই ভঙ্গীটি তাৎপর্যপূর্ণ। প্রদেশের উপভাষায় 'আমি' বড় জোর 'আমি-এ' অর্থাৎ অন্তঃস্বরের ভঙ্গী একটা থাকে, আবার থাকেও না।

কিন্তু পূর্ব বাংলার অন্যান্য উপভাষার মত এখানেও চাঁদ-চাদ, বাঁশ-বাশ। চন্দ্রবিন্দু নেই। কিন্তু দ্রুত বলার সময় নাকের অতি সুপ্ত একটা ব্যঞ্জনা স্পর্শলাভ করে এই ধ্বনিগুলি চাপা হয়ে বেরিয়ে আসে।

অভিব্যক্তি 'যাবো' অপনিহিতি—যাইবো, বিকল্পে—যাইমু; চট্টগ্রামে যাইর্‌মু।
—এই প্রক্রিয়ার গুরুত্ব এ ভাষায় অধিক।

একটানা টেনে কথা বলা এখানকার নিয়ম। ফলে প্রথম ধ্বনিগুচ্ছ ও শেষ ধ্বনিগুচ্ছ ধরেই প্রায় এদের বাক্য সম্পূর্ণ হয়। মধ্যের সকল ধ্বনি বা শব্দ উচ্চারিতও হয় না যেমন—হিতারে কইলাম একখানা যাইবার লাই, যাইবো ফানলার, ঠিক বুঝিৎ ন পারির। বাক্য এই ভাবে দীর্ঘ হতে পারে আরো, কিন্তু কান পেতে শুনলেই বোঝা যাবে, কোন ব্যাকরণের নিয়মের বেড়া খাড়া করার আগেই তা টপকে চলে এসেছে—মুখসৃষ্ট কিছু ধ্বনি ব্যতিরেকে আর কিছু শোনা যায় নি। এই ধ্বনিগুলিই আবার সহজভাবেও এদের মুখ দিয়ে প্রকাশ পায়। তখনই লক্ষ্য

করা যায়, এই ভাষার বিশেষ প্রবণতাগুলি। যেমনঃ গস্থ তখন হয় গইস্থ, ধ্বনি—দনি ; গাছ—গাস।

এ ছাড়া বর্গীয় ধ্বনির প্রত্যেকটি প্রথম ধ্বনি ক চ ট ত প—এবং মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলি বিকল্প ধ্বনির আশ্রয় নেয় এবং তা আদৌ বাঙালির কাছে সহজ বা স্পষ্ট নয়। যেমন 'কইল্যা' ও 'কালিয়া' প্রায় সমুচ্চারিত দুটি শব্দের ক্ষেত্রের বিভিন্নতা কেবল টানের ওপরই নয়, 'ক' ধ্বনির বিচিত্র ব্যবহারের ওপরেও (Implosive)। ধীরে বলতে গেলে বাংলা ধ্বনির রূপ দিতে ব্যর্থ চেষ্টা করেও এরা সেই বিকৃত ধ্বনিকেই রাখে, আর নিজেদের ক্ষেত্রে যে 'ক' এর ব্যবহার করে, তা 'অল্পপ্রাণ' ও 'অঘোষ' হওয়া সত্ত্বেও, তাতে 'খ' এর ব্যঞ্জন পাওয়া যায়। এগুলো এক ধরণের সংকর-ধ্বনি বিশেষ,—মিশ্রতায়ই এর পরিচয়। সম্ভবতঃ Accent-এর কারণে ; বিদেশীদের কারণেও তা সম্ভব।

এই উপভাষায় অন্তঃস্থ বর্ণগুলি যত স্পষ্ট উচ্চারিত হয়, অন্য উপভাষায় তা' তত হয় না। এখানে Gliding sound ও Semi vowel-এর বিচিত্র ব্যবহারও লক্ষ্যণীয়। স্পর্শবর্ণগুলোকে (Plosive sound)—ক, খ, গ, ঘ ; চ ছ, জ, ঝ ; ট, ঠ, ড, ঢ ; ত, থ, দ, ধ ; প, ফ, ব, ভ) বেমালুম স্বর-বর্ণে পরিণত করে। মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের মত (যেমন প্রাকৃত—পাউঅ ইঃ) স্বর-ধ্বনি প্রবণতাই এর কারণ। 'বইয়ো' বা 'বইঅ' (ব'স) ধ্বনিটির উচ্চারণ কালে এই তিনটি কথারই প্রমাণ পাওয়া যায়।

অনুনাসিক ব্যঞ্জনাও এ ভাষার একটা নিয়মিত ফলশ্রুতি। 'মামু' শব্দের সবগুলি স্বর আবার যখন কেবল 'ম' এই ডাকে এসে দাঁড়ায়, তখন কেবল তাতে আশ্চর্যই হতে হয়।

চট্টগ্রামের উপভাষার যাবতীয় বৈশিষ্ট্যের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা অবশ্য আমরা করিতে চাইনি। সাধারণ ভাবে এর কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ মাত্র করা হল। এ ভাষার বৈশিষ্ট্য সম্যক বুঝতে না পারার কারণে হয়ত বা ভুল উক্তিও থেকে যেতে পারে। তবু এ আলোচনা এ ভাষা সম্বন্ধে আরো কিছু জানতে হয়তো বা কাউকে উৎসাহিত করতেও পারে।

পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যের ভাষাসমস্যা

প্রত্যেকটি ভাষা এবং তার সাহিত্যের মধ্যে আশ্চর্য মিল রয়েছে। এবং ভাষা তার শৈশবের পর্যায় থেকে ক্রমে পরিণতির স্তরে উন্নীত হতে যাকে সোপানরূপে গ্রহণ করে, তাই সাহিত্য। সোপানটি দেখে তার আরোহীর ভার সম্পর্কে যেমন একটা চেতনা জন্মে, কোন দেশের সাহিত্য পড়ে তেমন তার ভাষার প্রকৃতি অর্থাৎ তার ধার ও ভার সম্পর্কে মন্তব্য করা চলে।

পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে ভাষার এই আরোহশক্তিকে অর্জন করার সমস্যা অনেক। মূলতঃ এ সমস্যা বাংলা সাহিত্যে একটা ঐতিহাসিক সংকট সৃষ্টি করেছে। এই সংকটের কিছুটা তৈরী করা হয়েছে, কিছুটা দেশের নানাবিধ পরিবর্তন থেকে এসেছে। চলাচলে, এর কিছুটা আবেগপ্রসূত, কিছুটা জীবনাবেগ মিশ্রিত।

তবে এ সমস্যা আধুনিক।

বাংলা সাহিত্যে ভাষা একটা চিরন্তন সমস্যা এ-কথার ঐতিহাসিক প্রমাণের প্রয়োজন নেই, ভাষা যে সজীব এই বৈজ্ঞানিক সত্যটুকুই তার জন্য যথেষ্ট। ভাষার এই সজীবতা তার আবহমানতায়। যা বহমান তার কুলের প্রয়োজন --শুধু নিজেকে ধরে রাখতেই নয়, আপন শক্তিটুকুকে নিঙড়ে নিঙড়ে বার করতেও ; বাঁকের সৃষ্টি এভাবেই। বাংলা সাহিত্যে প্রত্যেকটি যুগন্ধর স্রষ্টার হাতে যুগে যুগে এই বাঁকের সৃষ্টি হয়েছে।

কিন্তু আধুনিক কালে যে বাঁকের প্রয়োজন হয়েছে তা' এখনও সৃষ্টি হয় নি। বাঁকের প্রয়োজন হয়েছে শুধু এজন্যেই যে, একাল কেবল রবীন্দ্রোত্তরকাল নয়, তিরিশোত্তর যুগও নয়, এটা পাকিস্তানোত্তর কাল।

ভাষা এখানে এখন কি রূপ নেবে প্রায় একযুগ কেটে যাওয়ার পরও সেই শৈশবপ্রশ্নেই আমরা বাস করছি। এ-পর্যন্ত কি রূপ নিল এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে তার ভবিষ্যৎ রূপের দিকটা কি তা, জরীপ করা সম্ভব হচ্ছে না। কোন ভাষাবিদ বলেন, সাহিত্য সম্পর্কে ভাষার দাবী সবচেয়ে বড় এবং 'জাতীয় সাহিত্য' রচনার ক্ষেত্রে জাতীয় ভাষার অবাধ ব্যবহারের দাবীতে ও আপন রাষ্ট্রীয় চেতনাকে রূপ দেবার অধিকারে প্রথম দিকে কিছু অসহিষ্ণুতা ও উগ্রতা আবশ্যক। পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যের সমৃদ্ধরূপ অবশ্যই কাম্য, সেই সংগে ভাষারূপেরও।

কিন্তু সমৃদ্ধি এবং পরিবর্তন এক কথা নয়। সাহিত্যের পরিবর্তন মানে ভাষার পরিবর্তন। কিন্তু ভাষা সহসা পরিবর্তিত হয় না। —শব্দের নতুনতর ব্যবহারও ভাষার সংগে সংগে গৃহীত হয় না। পরিবর্তনকে এবং নতুনকে গ্রাহ্য হয়ে উঠতে হয়। —তাকে সৌন্দর্যশালী এবং ব্যবহারিক দিক থেকে সহজ অথচ দৃপ্ততাব্যঞ্জক হয়ে উঠতে হয়। মানুষের মুখে অর্থাৎ উচ্চারণে, ব্যাকারণে, প্রভাব ফেলতে হয় এবং তার একটা রাজনৈতিক উৎপত্তিও থাকতে হয়। তবেই মানুষ তার ধ্বনিগত দিক থেকে এবং সাহিত্যিক তার অর্থগত দিক থেকে ভাষার একটা জাতীয় রূপ ও চরিত্র দান করতে সক্ষম হয়।

লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, ভাষার পরিবর্তন হয় দু'ভাবে। এক—ধ্বনির দিক থেকে, দুই—অর্থগত দিক থেকে। এবং এক'শ বছরে ভাষার আকৃতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন স্পষ্টই লক্ষ্য করা যায়।
কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের ভাষার পরিবর্তন নিয়ে যে প্রশ্ন উঠেছে, তার তাৎপর্য আরো গভীরে।

প্রসঙ্গতঃ নভোকভের কথা স্মরণ করতে হয়। দেশত্যাগী হয়ে নিজস্ব অনুপ্রেরণাকে কোন্ ভাষার রূপ দেবেন এ সমস্যা তাঁকে পীড়িত করতে থাকে। অবশেষে তিনি ইংরেজীর মাধ্যমকেই গ্রহণ করেন। পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যিকদের যদি একই সমস্যা হোত, তবে বিশ্ব সাহিত্যের একটা উন্নতি হতেও পারতো হয়ত। কিন্তু এ সমস্যা অন্ত্যজভাষাশ্রেণী কেন্দ্রিক, অতএব, এ সমস্যা তুলনামূলকভাবে নিম্নস্তরের। প্রতিভার কাছে ভাষা-রূপ কোন

সমস্যা নয়, ভাষা সমস্যা সাধারণ স্তরের জন্যে। প্রতিভা একাই ভাষার ঐতিহ্যকে ভেংগে দিতে পারে (যেমনঃ মাইকেল, নজরুলের ভাষা) কিন্তু সাধারণস্তর থেকে যখন সেই ভাঙনের প্রশ্ন ওঠে তখন তার স্বরূপটা অনেক সময় মহৎ নয়।

পূর্বোক্ত আলোচনা একান্তে রেখে আমরা মোটামুটি বিষয়টাকে এই ভাবে বিচার করতে পারিঃ

১। আমাদের ভাষারূপ কি ছিল, তার সমৃদ্ধি কি ভাবে কতদূর হয়েছে।

২। পাকিস্তান-যুগে তার কি রূপ দেখা গেছে এবং তার ভবিষ্যৎ কি।

৩। আমাদের ভাষারূপ কি হবে, অন্ততঃ হওয়া উচিত এবং তার রূপ দিতে সাহিত্যিকদের কি কি দায়িত্ব রয়েছে।

বাংলা ভাষা আধুনিক ভাষাগুলির মধ্যে পুরাতন। এর বিবর্তনের ইতিহাস অনেক দীর্ঘ। তবে ১৮০১ থেকে এর একটা যুগান্তকারী বিবর্তন শুরু হয় এবং মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার থেকে সুধীন দত্ত পর্যন্ত তার অলংকার মণ্ডণও সম্ভব হয়েছে। অবশ্য এর মধ্যে যে বারবার সমস্যার অবতারণা করা হয়নি তা নয়, প্রথম যুগে আরবী-পার্শী শব্দ ব্যবহার, দ্বিতীয় সংস্কৃত শব্দরাজি ব্যবহার, তৃতীয় যুগে কথ্যবুলি ও তদ্ভব শব্দ প্রয়োগ সবই তার মধ্যে পড়ে। সুধীন দত্ত এই সবগুলি প্রশ্নকেই এড়িয়ে গেছেন তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ গদ্যে। উল্লেখযোগ্য যে, বাংলা গদ্যের ইতিহাস খুব বেশী দিনের না হলেও এই স্বল্পকালপরিধিতেই এর বহু বিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। তা কখনও সরল থেকে জটিল এবং জটিলতর হয়েছে। আবার ঋজুবন্ধন মুক্তকরে সহজ প্রকাশমুখী হয়েছে; কিন্তু এখানে তা থেমে যায় নি। ক্রিয়াবর্জিত বাক্য ব্যবহারের সুচনা হতে সংস্কৃত ও বিদেশী শব্দ চয়ন ও নতুন নতুন শব্দ সৃষ্টির প্রয়াস দেখা গেল; বিদেশী গদ্যের মত বাংলারও একটা বেগবান ও ধাবমান গতিরূপ স্পষ্ট হয়ে উঠলো। বিষ্ণু দে প্রমুখের গদ্য এমনি বেগধর্মী আবহাওয়াকে রূপ দিতে সক্ষম, সেই সংগে তা classic। মনোজ বসু-মুজতবা আলীর গদ্য ঘরোয়া বা বৈঠকি বা মজলিসি; বুদ্ধদেব এদের ব্যতি-ক্রম। সে কেবল নিজস্ব ঢং-এ মাত্র। এই ধারার উৎস নজরুল কিনা— সেকথা ভাবা যেতে পারে।

এদের সকলের চেষ্টায় বাংলা ভাষা একটা জাতীয় চেহারা গ্রহণ করেছিল; স্থিতিশীলতার প্রশ্নকে এড়িয়ে। বিভিন্ন মননধর্মিতায় এর বিভিন্ন প্রকাশ ঘটলেও একথা প্রমাণ হয়েছিল যে, ভাষা ব্যক্তিবিশেষের নিয়মে চলে না, ভাষা একটা গোটা জাতির সম্পত্তি। মননশীলতা জাতীয় ভাষারই কারুকাজ মাত্র এবং এই কারুকাজের জন্য মুখের ভাষা সাহিত্য অপসারিত হয়, বিবর্তিত হয় না। প্রাচীনকালেও এর প্রমাণ আছে সংস্কৃত থেকে প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন পরিবর্তনে। কিন্তু যা সত্য মানুষ তা আজো ব্যবহার করছে। যা কৃত্রিম মানুষ তা চর্চা করেছে, দুয়ের সামঞ্জস্য ঘটছে না। কেননা, সাহিত্যের পদ্ধতি synthetical নয়। যা ঘটে তা একটা প্রাণের যোগ মাত্র।

বাংলা ভাষা সাহিত্যের ক্ষেত্রে মুসলমানদের আন্দোলনের গোড়াতে যে সমস্যা হিন্দুপ্রভাব বা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ধারার প্রভাবে বা অন্য কোন কারণবশতঃই উদ্ভূত হয়নি, পাকিস্তান যুগে তার স্বরূপ জোরদার ভাবে দেখা দিল। উনবিংশ বা বিংশশতকের সাহিত্যের পরিধিতে হিন্দু আবহাওয়া বিধায় মুসলিম গণমানসের মূর্তি ছিল না। অথচ মুসলমানদের পক্ষে তখন নানা কারণে বৃহত্তর জীবনে অংশ গ্রহণও সম্ভব ছিল একথা বলা যায় না। পাকিস্তানযুগে তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। এবং সেই সংগে স্বাতন্ত্র্যবোধ ও জাতীয়তাবাদী ইসলামী জীবনবোধের রূপায়ণ সমস্যাও। এ সমস্যা ব্যক্তি বিশেষের নয়, মুষ্টিমের সাহিত্যিকদেরও নয় গোটা মুসলিম সম্প্রদায়ের। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংগে সংগে এ সমস্যার ব্যক্তিরূপটাই স্পষ্ট হয়ে উঠলো এবং সর্বত্র তার প্রশ্রয়ও জুটলো। ফলেঃ

১। ভাষাদেহের ঐতিহ্য ও বিকাশধর্ম হলো অস্বীকৃত;

২। সমাজের শ্রেষ্ঠ মানসিকতার ধরনে গণমানসের চারিত্র ও চরিত্র রইল না;

৩। 'ইসলামী জীবনের' নির্দিষ্ট অর্থ গ্রহণ সম্ভব হোল না;

৪। এই পরিবেশে যে গোষ্ঠীয় সাহিত্য সৃষ্টি হলো সারস্বতশর্ত গ্রহণে তা ব্যর্থ হলো;

৫। মুক্তমনে যাঁরা সাহিত্য সৃষ্টি করতে চাইলেন তাঁদের ওপর হিন্দু-সংস্কৃতি-ভাবাপন্নতার দোষ চাপিয়ে তাঁদের সাহিত্য প্রয়াসকে দমিত করার চেষ্টা হলো ; এবং

৬। নির্দিষ্ট পথ গ্রহণ করার আগেই ঢাকামুখী কলকাতার ভাষায় উপভাষা ও উচ্চারণ-তর্কের সৃষ্টি হলো।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে আজ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যপ্রয়াস ও তার ধারাকে বিশ্লেষণ করলে এই কথাগুলি প্রমাণও হয়ে ওঠে। আমরা গায়ের জোরে ভাগীরথী তীরের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং সাহিত্যিক প্রামাণ্য ভাষাকে বর্জনের প্রশ্ন তুলেছি কিন্তু বিকল্প কোন সাহিত্যিক ভাষার অনুশীলন বা experiment করিনি। যা করা হয়েছে তাকে গ্রাম্য বর্বরতা বলা চলতে পারে। যিনি (রবীন্দ্রনাথ) চিঠি লিখতে লিখতে চলতি ভাষার অপূর্ব স্বাদ গ্রহণ করেছিলেন, সাহিত্যে তাকে প্রতিষ্ঠা করতে আপনার মধ্যেই অনেক বাঁকের সৃষ্টি করেছিলেন তিনি। কিন্তু অনুশীলন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং অভিজ্ঞতা ব্যতিরেকেই যখন কেউ লিখতে বসেন 'বড় পেরেশানী মালুম কচ্ছি,' তখন কবুল করে নিতে হয় কপালে পেরেশানীই আছে। 'তোমারি এ হাল দেখে দিল মেরা আছে বেকারার' এর কাব্যিক আবেদন মনোরম, কিন্তু Amen ! Amen ! ! বলতে পারি না। এরা লেখেন 'ব্যাজার ব্যাজার' এঁদের ক্রিয়া-পদের রূপটা কখনও 'আজ বাইর হওন যাইবে না'। কখনো 'পিছল বল্‌ইয়া বস্‌ইয়া নাই'। আবার কখনো তা আরো কষ্ট-উচ্চারণ ও দুর্বোধ্য। এমনি সাহিত্যিক প্রয়াসের মূল্যটা হয়ত একেবারেই শূন্য নয়। কিন্তু ভাষার নির্দিষ্ট গতি ও সাধারণ স্থিতিশীল মানের দিকে এরা প্রাগ্রসর নয়।

এ প্রশ্ন ভাষাতাত্ত্বিকদের মত গ্রহণই সঙ্গত। মুহম্মদ আবদুল হাই বলেন, 'ভাষা-সহসা পরিবর্তিত হয় না। শব্দের নতুনতর ব্যবহার ও ভাষার সংগে সংগে গৃহীত হয় না এবং 'উপভাষাগুলির শক্তি অনস্বীকার্য। তবু আমাদের সাহিত্যে সাধারণভাবে এ উপভাষার যে কোন একটির ব্যাপক ও বহুল প্রয়োগ উন্নত সাহিত্য সৃষ্টিতে পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে।' অধ্যক্ষ হাই সাহেব, বাংলা ভাষার নতুনতর শব্দ (যেমন অচলতি শব্দ) প্রয়োগকে

যে-অর্থে সমস্যা হিসাবে দেখেছেন, উপভাষার প্রশ্রয়টাকেও তেমনি। ভাষা-বিজ্ঞানী এ জাতীয় Experiment করতে গিয়ে বেহুদা ২০।২৫টা বছর কাটিয়ে দিতে চান না এবং অনতিদূর ভবিষ্যতে একটা সুপ্রতিষ্ঠিত ভাষায় কুলধর্মের বেহাল ভেবে কঠোর আপত্তি জানিয়ে ঐতিহাসিক দায়িত্বই নিষ্পন্ন করেন। এবং ভাষাবিজ্ঞানের উপর দ্বিতীয় প্রশ্ন চলে না।

মুখের ভাষাই মূলপুঁজি। প্রমথ চৌধুরী বলেন, তারপর তা সুদে-আসলে বেড়ে গিয়েছে। মোহিতলালের 'ভাষাঘটিত বাস্তববাদের' নিন্দা 'সোমপ্রকাশে, টেঁকোনি। অতএব বলা যায়, ভাষাব্যাপারে, Puritanism বা শুচিবাই কোন প্রশ্নই নয়। ভাষার চলতি রীতির যে সুবিধার দিকে প্রমথ চৌধুরীর নির্দেশ, ভাষাবিজ্ঞানীও সেই সুবিধাকেই সকল সময় একটা পদ্ধতিগত রীতিতে আবিষ্কার করেন। পাকিস্তান পেয়েছি বলে, দেদার অচলিত পুঁথির আধুনিক সংস্করণ বার করে রাতারাতি ভাষার ভোল পালটে দেওয়া দরকার এই ভাবটা যত তাড়াতাড়ি দূর হয় ততই ভাল। কেননা, এই জাতীয় সুবিধা গ্রহণ এ ভাষার মৌলধর্মেরই বিরোধিতায় দাঁড়াবে মাত্র।

কিন্তু ভাষার কোন পরিবর্তনকে যদি একান্তই ত্বরান্বিত করার প্রয়োজন এসে থাকে, তবে তাকে সহজভাবে গ্রহণ করাই শ্রেয়। এতে আধুনিক সাহিত্যিকদের মুক্তমনে এগিয়ে আসতে হবে ; তাদের উপর দায়িত্ব থাকবে ঃ

১। Dialect-এর সহজ শ্রেষ্ঠত্ব সন্ধান ;

২। Standard dialect কে স্বীকার না করে সভাদেশের আদর্শে নূতনতর গতির সন্ধানে নতুন Dialect এর দিকে দৃষ্টিপাত করা ;

৩। নতুন ভাবের পোষকতার নতুন শব্দসৃষ্টিতে বিকৃত বা উচ্ছৃঙ্খল মানসিকতা ত্যাগ করে নতুন প্রাণাবেগ সঞ্চার করা ;

৪। আমদানীকৃত ঋণশব্দে (আরবী, পারশী, প্রয়োজন হলে অন্যান্য বিদেশী শব্দ) প্রচলিত ভাষার সাযুজ্য সন্ধান ;

৫। ভাষার গতি যে dialect-মুখী তার সংগে পুরাতন ঐতিহ্য এবং জীবনের

রসঘন মুহূর্তের যোগ করে ক্রমে ক্রমে সার্বজনীন উচ্চারণ ও অর্থবোধগম্যতার দিক থেকে একটা সাধারণ মানে উন্নীত করা ;

৬। এসব ক্ষেত্রে মানসিক প্রস্তুতি বড় Factor ;

৭। জাতীয় আদর্শ ও ঐতিহ্যকে জানার মাধ্যমে ও দ্বি-করণ সাধন প্রয়াসে ভাষাসংস্কারের দায়িত্ব গ্রহণ ও পালন করতে হবে।

এ ছাড়া সাধারণ ভাবে কতকগুলো দায়িত্ব সবার ওপর বর্তাবে, যেমনঃ

১। আঞ্চলিক ভাষা-সাহিত্যের একটা প্রামাণ্য দলিল (অন্ততঃ অভিধান) প্রস্তুত করা ;

২। আধুনিক ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে উপভাষাগুলোর সীমা নির্দেশ (dialect geography) করা ;

৩। অঞ্চল বিশেষের উচ্চারণ অভ্যাস ও তার উপভাষার বাক্যবিন্যাসরীতি ও অন্যান্য ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গবেষণা করা এবং এ-সম্পর্কে তথ্যগুলো সাধারণ্যে প্রচার ;

৪। জাতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সংগে সংগে দেশীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি ও কৃষ্টিকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তুলে ধরা ;

৫। বিশেষ পোষাকী ধরনের উচ্চারণ সম্পর্কে আলোচনাকে আরো বাস্তবমুখী করে তোলা এবং সেজন্য মধ্যে মধ্যে চিন্তাবিদদের আলোচনা সভা (seminar) ডাকা ;

৬। Speech Training Centre প্রতিষ্ঠা করা এবং সহস্র প্রচার পত্রিকা ও পুস্তিকা প্রচলন করা।

ভাষা ক্ষেত্রে আরেকটা পরীক্ষা রয়েছে, উপভাষাগুলি এখনও দ্বৈতস্বরধ্বনি প্রধান এবং তাদের স্বরসংগতি ঠিক কিসের উপর নির্ভর এবং প্রতিটি শব্দের ব্যুৎপত্তি এবং ধ্বনির প্রকৃতি কি—এসব প্রশ্নকে জটিল না করে সবার কৌতুহলকেই সাহিত্যিক কৌতুহল হিসেবে এর-মধ্যে ঢোকাতে হবে।

বাংলা গদ্যে পদক্রম

[১]

ব্যাকরণে শব্দ বহুতর সমস্যার উদ্ভাবন করেছে। বাক্যে 'শব্দের অবস্থান' এবং 'অবস্থানগত ক্রিয়াশীলতা' ভাষা সম্পর্কিত পঠন পাঠনের ক্ষেত্রে এমনি একটি উদ্ভাবিত সমস্যা। ধাতু বা শব্দের রূপগত বিচারাতিরিক্ত সম্প্রতিক গবেষণায় কেবল অর্থবোধের ওপরই জোর পড়ে না, অন্যবিধ প্রবনতাদি [যদি থাকে] কে কেন্দ্র করেও তার আলোচনার সম্পূর্ণতা বিধানের চেষ্টা হয়ে থাকে।

অষ্টাদশ শতকেই বাক্যের গঠনরূপের সমস্যাটি প্রথম আলোচনার মূল্য পায়। তবে সন্দিগ্ধতাপূর্ণ জটীলতত্ব রূপে তা প্রথম প্রকাশ পায় Cobbett এর ব্যাকরণে, উনিশ শতকে। পরবর্তীকালে Alexander Bain (An English Grammar, 1863) শব্দগঠন ও পদগঠনের ঐতিহাসিক ও গঠননীতির আলোচনা উপস্থিত করে ক্ষেত্রটিকে প্রসারিত করেন বলা যায়। এ ভাবেই তৃতীয় ধাপে The king's English (1906)'[১] Dictionary of Modern English Usage (1926) প্রভৃতি-গ্রন্থ প্রদর্শিত ধারা Partridge, Robert Graves ও Alan Hodge পর্যন্ত এগিয়ে আসে। এরাই প্রমাণ করেন বাক্যে প্রধানতম একক একটি স্বতন্ত্র বস্তু, সমাস্যাগত দিক থেকে এবং অবস্থান ও রূপগতধর্মে তা বিশিষ্ট এবং বিভিন্নও। এই বিভিন্নতা ধরা পড়ে ব্যাকরণের দ্বিকরণতত্বেঃ (ক) রূপ বা গঠন তত্বে (=Accidence), তার এক পরিচয়; Morphology এবং Etymologyতে আগে তা ব্যাখ্যাত হোত। আরো পরে একে Inflexion-তত্বরূপে দাঁড় করাতে হলো, কেননা তাই হোল বাক্যের 'একক'-বিচারে

১ 'Nesfield (1905) is dogmatic' – G. H. Vallins.

কনিষ্ঠতম পদ্ধতি[২] এবং এই বিচারে বোঝা গেল ভাষার ক্ষেত্রে, পরিবর্তিত মানসিকতায় ও ভাষাব্যবহারের ক্ষেত্রে পরিবর্তিত সুবিধায় আদিম সরলতারই প্রত্যাবর্তন ঘটেছে। অর্থাৎ, আজ ভাষার পূর্ণ ব্যবহারের উপযোগিতা বৃদ্ধি ঘটাকালে মানুষ ব্যাকরণ-চিন্তা, ক্রিয়া এবং শব্দের ক্রম-ব্যবহারের রক্ষণশীলতা প্রভৃতিকে পরিহার করার বাস্তব প্রবনতাকে অর্জন করেছে—আদিম মানুষের ভাষা ব্যবহার চিন্তায় যেমন কোন ব্যাকরণ ঘটিত জটিল সমস্যার পীড়ন উপস্থিত ছিল না। তবে এ দুয়ের যে পার্থক্য তা কালগত পার্থক্য মাত্র। (খ) এই তত্ত্বের বলে বাক্যরীতি বা পদক্রমরীতি একটি গতানুগতিক রীতিতে পর্যবসিত হলো। তবে এই দ্বিতীয় রীতিই বাক্যের সেই অনন্য এককের স্বাদ ও রংকে আমাদের কাছে স্পষ্ট করে।

[২]

ব্যাকরণের সজ্ঞা নির্ণয়ে আজ ভাষা বিজ্ঞানী অতি সতর্ক অনুসন্ধানী, বাংলা ব্যাকরণ—চিন্তায়ও।[৩] পদক্রম বিচারেও এই পরিবর্তিত দৃষ্টিভংগী ভাষা-বিজ্ঞানীদের মনে কাজ করছে। প্রাচীন ব্যাকরণের চতুর্বিধ অধ্যায়ে 'বাক্য' বা বাগধারা অধ্যায়টি অবশ্যই অধীন-অধ্যায় রূপে বিবেচ্য হোত। এ বিষয়ে G. H. Vallins এর উক্তি স্পষ্ট কিন্তু সত্য: 'It is notewortuy that until the later part of the eigteenth century grammarians and writers did not concern themselves with points of syntax or what we should call usage'[৪] বাংলা ব্যাকরণের ভাগ গুলিও এই দৃষ্টিভঙ্গী জাত ছিল—তবে পুনর্বিবেচনার জন্য আমরা ভাবিনি। Orthography (বর্ণ), Etymology (শব্দরূপ ও ধাতুরূপ), Syntax, এবং Prosody (ছন্দ প্রকারণ প্র:) দিয়ে ছাত্রদের পণ্ডিতিকরণ প্রয়াস চলে এসেছে একটা সাধারণ নিয়ম স্বরূপে। সেকালে অভিধানে পর্যন্ত তা খারিজ

২। 'Inflexion is a younger process than syntax and one which we may reasonably suppose grow out of it.' The Origin of Grammer, দ্রঃ Psychology of English by M. Bryant.

৩। দ্র. সাহিত্য পত্রিকা বাংলা বিভাগ, ঢা. বি। সংখ্যা নং ৯.১ (বর্ষা ১৩৭২); ১১.১ (বর্ষা ১৩৭৫), Pakistani Linguistics (1962) প্রভৃতি।

৪। The Pattern of English, p. 112 (1956)

বস্তু হিসাবে অনেকে দেখেছেন।[৫] Cobett-ই প্রথম সেই সূত্রের উল্লেখ করেন—'Which teaches us how to put words togather so as to form sentence' ; এই সরল ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চেতনার ভিত্তিতেই পদক্রম-তত্ব নির্দিষ্ট হোল। প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ এবং পাদরীদের ভাষা ব্যবহারের যথেচ্ছচারিতার প্রতিবাদে তিনি প্রথমত এই নীতি নিয়ম আবিষ্কারে আগ্রহী হন।

অর্থবোধসহ শব্দের সু প্রয়োগের প্রশংসা বেদেও শোনা যায়, এবং এই দিক থেকে মন্ত্রার্থ হৃদয়াঙ্গমে সহায়ক হিসাবে ব্যাকরণ বেদের অঙ্গ হিসাবে প্রসিদ্ধ। শ্রী গুরুপদ হালদার এর কারণ দর্শিয়ে বলেন, "ব্যাকরণ-নিমিত্তিক পদ-পদার্থের বোধ ব্যতীত তন্মূলক বৈদিক বাক্যার্থের বা বাক্যাবসায়ের জ্ঞানোপলব্ধি সম্ভবপর হয়না।"[৬]

প্রাচীনকালেই বাক্যের গুণদোষ সম্পর্কে ভারত সাহিত্য কর্মীদের অবহিত করেন বলে জানা যায়। পরবর্তী পণ্ডিতগণের মধ্যে ভরতানুসারী তেমন কেউ ছিলেন বলে মনে হয় না। প্রাচীনকারদের ব্যাকরণ দর্শন বিচার করে তিনি এই দশটি বিষয়ে সীমা দিয়ে বাক্যকে নির্দিষ্ট করেন ঃ (১) বাক্যেগূঢ়ার্থান্তর, (২) অপ্রাসঙ্গিক উল্লেখ (৩). অসম্বদ্ধ বাক্য (৪), ও বাক্যে বহু অর্থ—প্রয়োগাদি (৫), ভিন্নার্থ (৬) অভিপ্লুতার্থ (৭) ন্যায়াদপেত অর্থাৎ প্রমাণ বর্জিত বা বিরুদ্ধ বাক্য (৯) বিষম বা ছন্দঃপতন (৯) বিসন্ধি বা শব্দের সংশ্লেষ ক্রিয়ার অভাব বা প্রয়োগাভাব এবং (১০) শব্দহীন (ব্যাকরণ দুষ্ট) শব্দের প্রয়োগ। প্রকৃত প্রস্তাবে এই দশটি সীমার আলোচনায় ও বিশ্লেষণে পূর্ব সূরীদের ব্যাখ্যাকেই তিনি আরো সহজ করে আনতে সাহায্য করেন। পরবর্তীকালে বাক্যরীতির বহির্ভূত বলে এ গুলোর উল্লেখ হোত ঃ অপার্থ, ব্যর্থ, একার্থ, সংশয়, অপক্রম[৭] যতিভ্রষ্ট, ভিন্নবৃত্ত, বিসন্ধি, দেশকালকলালোকান্যায়াগম বিরোধী।

ভামহ আরো দশটির উল্লেখ করে গেছেন—যথা, নেয়ার্থ, ক্লিষ্ট, সন্যার্থ অবাচক, গূঢ় শব্দাভিধান, অযুক্তিমৎ, শ্রুতিদুষ্ট, অর্থদুষ্ট, কল্পনাদুষ্ট, শ্রুতিকষ্ট। মম্মটপ্রভৃতি

৫। ঐ, ঐ, পৃঃ ১১২—১১৩।
৬। ব্যাকরণ দর্শনের ইতিহাস, শ্রী গুরুপদ হালদার দ্র. ভূমিকা।
৭। কাব্য বিচার ; সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত—"আমাদের অতি আধুনিক নূতন বাংলা রীতিতে অপক্রমটি গুণ হইয়া দাঁড়াইতেছে।" পৃঃ ৩০।

ক্রমে ষোড়শ পদদোষ উল্লেখ করেন। এবং বাক্যগত দোষের উল্লেখে প্রতিকূল বর্ণনা, উপহত লুপ্ত বিসর্গ ও বিসন্ধি, হতবৃত্ত বা ছন্দপতন, সমাপ্তপুনরাত্তা, অর্দ্ধান্তরৈকবাচকতা, অভবন্মতযোগ প্রভৃতির ব্যাখ্যা রীতিমত বিশ্লেষণাত্মক। বাক্যে অন্বয় স্থাপনে সংকীর্ণ, গর্ভিত, ভগ্ন প্রক্রম, অক্রম ও অমতপরার্থতার ইংগিতও এখানেই নিহিত। মম্মট বাক্য গঠনে অর্থস্থাপনার ওপরও জোর দিয়েছেন এবং তার অভাবে কি প্রক্রিয়ায় বাক্য অপুষ্ট, কষ্ট, ব্যাহত বা দুক্রম, সন্দিগ্ধ ও নির্হেতু প্রসিদ্ধি বা বিদ্যাবিরুদ্ধ, অনবীকৃত প্রভৃতি উৎকটাচরিত হয় তার ব্যাখ্যা করেছেন।

এই সব বাক্যতত্ত্ব আলোচনা মূলতঃ রসশাস্ত্রের অন্তর্গত এবং তার আলোচনা বা সমন্যাদি মৌলিক হেতু চার ভাগে আলোচ্য—

পদগত, বাক্যগত, বাক্যার্থগত ও রসগত।

আমাদের আলোচনা এই বিস্তৃতিকে গ্রহণ করে না। E. P. Morris বলেন, "Syntax is concerned directly only with meaning.' এবং পূর্বে উল্লেখকৃত বরাতে বলা যায়, বাক্যের 'একক' বিচার ও 'একক' ব্যবহারের অর্থভিত্তি নির্মাণেই এর সীমা নির্দিষ্ট। এবং তার উপায়, পৌর্বাপর্য রক্ষা মাত্র।

[৩]

ঐতিহাসিকতঃ পদক্রম শব্দবিন্যাসের দায়িত্বে নিবদ্ধ। গ্রীক Syn=অর্থ একত্র ; taxis=অর্থ সাজানো। শব্দার্থতত্ত্বে বুৎপত্তিজাত অর্থ সরাসরি অর্থ মাত্র, ব্যবহার সঙ্গে তার অর্থের বিস্তার ও গভীরতা আসে। আবার ক্ষয়প্রাপ্তিও ঘটে।[৮] এজন্যই বলা হয়। 'Language, being a growing human product can never be classified and set out with any thing like the precision of mathematical phenomena'[৯] পরিবর্তনশীল ভাষার শব্দরাজির মধ্যে যে চরিত্র জন্মে তা-ই ক্রমে এমন এক ধারণার মুখে আমাদের আনে যা পূর্ববর্তী ধারণা অপেক্ষা বিপ্লবাত্মক, অন্ততঃ যা নিয়মানুবর্তি নয়। এবং পদক্রম শব্দের তথা বাক্যের রূপচরিত্র ও বাচ্যার্থ নিরূপণে সকল সময় নিয়মানুগ হতে

৮। শব্দে শব্দে যোজনা প্রবন্ধ পৃঃ ১৭ দ্রষ্টব্য।

৯। The English Language C.L. wren. Methuen 1964, P. 130

বাধ্যও নয়।[১০] কারণ বাক্য কেবল শব্দরাজির শৃংখল নয়, একটি কাঠামোও, যার মধ্যে একজন বক্তা তার কথাবলার বিশেষ ভঙ্গীটিকে প্রকাশার্থে সংযোজন করতে পারে। বক্তা কখনও কাঠামো নির্মাণ করে না ; এটি একটি উত্তরাধিকার সম্পদ বা গৃহীত চুক্তি বা একরার। এই কাঠামোই পদক্রমের লক্ষ্য। কিন্তু তার একটি স্বাধীন রীতি আছে।

অধুনা এই 'কাঠামো' তত্ত্বটিতে structuralistগণ অতীব সন্দেহসহ দৃষ্টি নিবদ্ধ করছেন। ফলত পূর্ববর্তীদের ঐতিহাসিকবাদ এখন খণ্ডিত, বিবৃতিবাদই এখন মূল উপপাদ্য। ফলে বাগখণ্ড (phrse) ও বাক্যাংশ (clause)-ই অধুনা মূল আলোচনাকে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তমুখী করতে সহায়ক হয় বলে বিবেচিত হচ্ছে।

বাগখণ্ড আসলে বিধেয়হীন বাক্য (শব্দদল)। বাক্যাংশে শব্দদল সমূহ বাক্যগুণে বর্দ্ধিত হবার আকাংখা রাখে। অর্থাৎ উদ্দেশ্য বিধেয় তার অপরিহার্য। উদ্দেশ্য বিধেয় বিভক্ত-রীতিতেই গ্রহনীয় হয়, কিন্তু অবিভক্ত রীতিতেও কোনও কোনও ভাষায় সুলভ। উদাহরণ, ল্যাটিন ইত্যাদি, চেক, চীন প্রভৃতি। তবে অধিকাংশ ভাষাভাষীদের মধ্যে বিশেষত বিবৃতিমূলক ভাষায় এই বিভক্ত করণের পক্ষপাত রয়েছে। এটা, অতএব, একটি নিয়মমাত্র ভাগ যেখানে একদিকে বিশেষ্য ও অপরদিকে ক্রিয়া প্রভৃতি। কোন কোন ভাষায় কখনও কখনও এই বিশেষ্য ক্রিয়ার ভেদটি স্পষ্ট না হতেও পারে।[১১] তবে সাধারণতঃ পদমধ্যে এদের অস্তিত্ব বড় স্পষ্ট। এবং সকল ভাষায় বিধেয়করণ একটি সামান্যগুণ।

দুভাবে বাক্যাংশের প্রয়োগ হয় Parataxis ও hypotaxis। অর্থাৎ স্বাধীন ও অধীন প্রয়োগ। বাক্যাংসসমূহ পরস্পর স্বাধীন ভাবে বসে পাঠকের ওপর যোগ করা বা যোগারণের ভার ছেড়ে দিতে পারে ; অথবা, একটি বাক্যাংশ অপরটির

১০। 'Syntax is concerned with free froms only.' Modern Linguistics : Simon Potter. Norton Library (1964) P 104 দ্রষ্টব্য।

১১। Noun and verb are not , however, distinct in Tagalog a member of the Malayo-polynesian family of languages ; or in Nahuatl the language of the ancient Aztec civilization of Mexico, which can still be studied as a living tongue.' — M. L. (S. potter) p 107.

অধীন হতে পারে। বাংলা বাক্যরীতি (গদ্য) ইংরেজীরীতিকেই গ্রহণ করেছিল।[১২]

পদকে সাজানোই বাক্যের সমস্যা। তবে সমস্যাটি সাধারণ নয়। তাহলে ইংরেজী ভাষাকে বিশেষতঃ ফ্রান্সের দ্বারস্থ হতে হোত না। বাংলার ক্ষেত্রেও তাই সংস্কৃতের দ্বারস্থ হওয়া এক সময় প্রয়োজন ছিল তবে একই যুগে একই সাথে গৌড়ীয় ও বৈদর্ভীরীতি গৃহীত হওয়ায় (যথা মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার) বাংলা গদ্যরীতির ক্ষেত্রে সেই পরিমাণে সংস্কৃতের পীড়ন ঘটেনি, প্রভাব ঘটেছে। সমকালীন সাক্ষ্যে পাওয়া যায়; "প্রথমতঃ বাঙ্গলা ভাষাতে আবশ্যক গৃহব্যাপার নির্বাহের যোগ্য কেবল কথাগুলিন শব্দ আছে এ ভাষা সংস্কৃতের যেরূপ অধীন হয় তাহা অন্য ভাষার ব্যাখ্যা ইহাতে করিবার সময় স্পষ্ট হইয়া থাকে"। অতএব বিবৃতিমূলক ভাষাকেও এই সংশ্লেষধর্মী ভাষার প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করতে দেখা যায়। ঐশ্বর্যবান ভাষার বৈভবাসক্তি এড়ানো কঠিন; দ্বিতীয়ত, প্রাচীনের প্রতি আকর্ষণ আমাদের মজ্জাগত।

তবু লক্ষ্য করার মত ব্যাপার এই যে, বাংলা গদ্য জন্মমাত্র স্বাধীন বাক্-ক ঠামো গ্রহণ করেছিল, প্রথম সংবাদপত্রটি-ই তার সাক্ষ্য। অবশ্য কাঠামো ও শব্দ প্রযুক্তি এক ব্যাপার নয়। শব্দ নিজস্ব নির্বাচনের বিষয় তার গ্রহণ বর্জনে রুচি শিক্ষা ও অন্যান্য প্রবণতা ক্রিয়াশীল থাকে। বাক-কাঠামোটি থাকে স্থির। অবশ্য তারও নানা ঢং বা Pattern হতে পারে। আমরা তার মধ্যে আমাদের শব্দরাজিকে প্রোথিত করি। বাক্য তাই শব্দরাজিকে সংশ্লেষণতায় বিশেষ অর্থপ্রোদক করে। শিশু শব্দাদি না জেনেও পূর্ণ কথার কাঠামোটি যে বোঝাতে চায়, তার মূল কারণও এই। আমরা শব্দ শিখি কিন্তু উত্তরাধিকার সূত্রে গ্রহণ করি, তাকে রক্ষা করার দায়িত্বে। এই কাঠামোটি একটি বিশেষ ভাষাভাষীর কাছে এত

১২। প্রবন্ধ সংগ্রহ : প্রমথ চৌধুরী—পৃঃ ৭৩/৮০/৮৮/৮৯/৫২৪-২৫; প্রভৃতি। তিনি আশুতোষ মূর্তির পাদপীঠে উৎকীর্ণ শিলালিপির উল্লেখ করেছেন : 'The mother's tounge has been put in the step mother's hall' বস্তুতঃ, 'চন্দ্রাহত সাহিত্যিবদের' ইংরেজী গদ্যের অনুকরণ ও অনুবাদ এবং আইডিয়াবদ্ধতা বাংলা গদ্যের সমস্যাকে চরমে ঠেলে দেয়।

সাধারণ যে বলা যায় যে একজন কেউ কথা শুনে বুঝবার আগেই তাকে সেই কথাটি কাঠামোর চেতনায় উপলব্ধি করিয়ে দেওয়া যায়। এই জন্যই আমাদের বাগধারার উৎস কেবল এখানেই সীমিত নয় — IE ভাষা পর্যন্ত তা সুদূর বিস্তৃত। Sapir তাই বলেন, বাক্য আসলে একটি কথার (proposition) ভাষাতাত্ত্বিক প্রকাশ।

বাক্যে পদের অবস্থান, এদের ক্রম ও পারস্পরিক সঙ্গতিই প্রধান বিচার্য। পদসমষ্টিই বাক্য বা বাক্যের একক। কোনও বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে বক্তার মনোভাবকে প্রকাশ করাই এই পদের বা পদ সমষ্টির লক্ষ্য। সমষ্টি করণেই তাহলে মনোভাব প্রকাশন ঘটে বা স্থিরীকৃত হয়।

বাড়ী থেকে ঢাকা অনেক দূর ঃ এখানে এই সমষ্টিকরণের মূল্যমান='ক'।
অনেক দূর থেকে ঢাকা বাড়ী ঃ ,, ,, ,, ='—ক'।

'ক' এবং'—ক' একই মনোভাব প্রকাশক উক্তি নয়। 'ক'-কে 'ক' ই হতে হয়। একারণে 'ক' একটি সর্ত সাপেক্ষে গড়ে উঠা 'সমষ্টিকরণ'। এই সর্তসমূহ সকল সময় বোধগম্য ভাবার কারণ নেই। তবু সুবিধার্থে বলা যায়, এই ক মূলতঃ তিনটি বিষয়ের উপরই অস্তিত্বশীল ঃ (১) যোগ্যতা বা compatibility বা propriety (২) আকাংখা বা Expectancy এবং (৩) আসত্তি বা নৈকট্য অর্থাৎ Proximity. যোগ্যতার কারণে ক্রম ও ভাবগত সঙ্গতি; আকাংখার কারণে বাক্যে পদের অবস্থান এবং আসক্তির কারণে অন্বয় ঘটে, পদ বিভক্তি ও অনুসর্গ প্রভৃতির যথাস্থাপন সম্ভব হয়।[১৩] এই ভাবে কেরানীকে মাছির হাত থেকে রক্ষা করে বলি—

ক ঃ 'মাছি-মারা কেরানী'। অথচ কি বিপদই ঘটে যখন—
—ক ঃ 'কেরানী মারা মাছি'—এর উপদ্রব শুরু হয়, অর্থাৎ উপরোক্ত ত্রিগুণের অভাব ঘটে। অতএব আকাংখা আসক্তি ও যোগ্যতার ওপরেই বাক্যস্থিত পদের আবশ্যকতা, অবস্থান, ক্রম, পারস্পরিক সঙ্গতি ও বাক্যের অর্থবোধ নির্ভর করে। ফলতঃ পদের সমষ্টিকরণ এই আকাংখা আসক্তি ও যোগ্যতারই সমীকরণমাত্র। এই সমষ্টির আকাংখা আসত্তি ও যোগ্যতাগুণেই একটি পরিণত বাক্যের জ্রূণ।

১৩। বিস্তৃত আলোচনার জন্য ডঃ আধুনিক সরল বাংলা ব্যাকরণ ঃ শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী পৃঃ ২১৩।

পূর্বে বলা হইয়াছে, বিশেষ্য ও ক্রিয়ার ভেদ ও অভেদ রূপ বাক্য তথা ভাষার চরিত্র নিরূপক সত্য। উদ্দেশ্য ও বিধেয় তথা বিশেষ্য ও ক্রিয়ার সম্পর্ক কারণে Nexus বা একটি বাক্য সম্পাদন তত্ত্ব সৃষ্টি হয় ; গঠনরীতিতে এর প্রতীক এইরূপ ঃ

স (র্ক্ত+র্ম) + স (ক্রি)

অর্থাৎ সম্প্রসারকসহ কর্তা ও কর্ম তথা বিশেষ্য সম্প্রসারকসহ ক্রিয়ার সংগে যুক্ত অবস্থায় বাক্যগঠন কর্ম বা ভাবের অর্থগত সম্পূর্ণ রূপটি সম্পাদনা করে। অতএব, বিবৃতিমূলক ভাষায় পদসমষ্টি বাক্যস্থ SP বা উদ্দেশ্য ও বিধেয়র অন্তর্গত হয়। ফলে একটি বাক্য নিম্নভাবে অবস্থান করে,

উদ্দেশ্য		বিধেয়	
সরল	সম্প্রসারিত	সরল	সম্প্রসারিত
কর্তৃপদ		সমাপিকা ক্রিয়া পদ	
	বিশেষণ		ক্রিয়া বিশেষণ
	বিশেষণ স্থানীয় পদসমষ্টি		ঐ-স্থানীয় পদসমষ্টি
	সম্বন্ধ পদ		ঐ-স্থানীয় বাক্যাংশ
	সমকারক পদ		কারক
	বিশেষণ স্থানীয় বাকাংশ		বিধেয় বিশেষণ

একটি জটিল বাক্যের ব্যাখ্যায় এই ছকটির আকৃতি এই রকম নাও থাকতে পারে। অর্থাৎ আমরা বাক্যে পদসমষ্টির আস্তিত্বকে ও অবস্থানকে নির্দিষ্ট প্রকরণেই পাই তা বলা যায় না। যদি সময়মাত্রা ও ঘটনার নির্দিষ্টতা দিয়ে পদক্রমটি পাওয়ার চেষ্টা করি তা হলেই দেখবো একটি বাক্য ভিন্ন ব্যাখ্যার অন্তর্গত হয়েছে। যেমন,

কালাধিকরণ	সম্বন্ধ পদ ও ক্রিয়া বিশেষ্য (verbal noun)	ক্রিয়া (নঞার্থক ভাব)
আজ	তোমার যাওয়া	হবে না

এই বাক্যটি যদি হোত ঃ তবে কি তোমাকে যেতে হবে না ? তাহলে কি

পদক্রমের উপরোক্ত নির্দেশক শ্রেণীকরণ খাটতো বলা যায়? অথবা যদি বাক্যটি হোত এই রকম: 'তোমার যাবার দরকার নেই।'?

অর্থাৎ পদক্রমে 'শ্রেণীকরণের' সাধারণ প্রচলিত ধারণাটি আজ অবশ্যই অকেজো হয়েছে। বাক্য মধ্যে পদের অবস্থান শ্রেণীকরণজাত নির্দিষ্টতা মেনে নিয়ে ঘটে না।

পদের সাধারণ শ্রেণীকরণ এইরূপ: ১। নাম ২। ক্রিয়া।

১। নাম (ক) সব্যয় অথবা (খ) অব্যয়। (ক) সব্যয়ের উদাহরণ (১) বিশেষ্য, (২) সর্বনাম (৩) ও বিশেষণ। (খ) অব্যয় প্রয়োগ সাপেক্ষ বিভিন্ন। এই শ্রেণীকরণে উপরোক্ত বাক্য সমূহে তোমার/তোমাকে; যাওয়া/যাবার এবং না/নেই প্রভৃতির ব্যবহারগত পার্থক্য সূচিত হয় না। অবস্থানগত ধর্মেরও হেরফেরটি উপলব্ধি করা কঠিন হয়।

[৪]

ভাষাতাত্ত্বিক নিয়মে ভাষার যেমন পরিবর্তন ঘটে, পদক্রমেরও তেমনি নানা পরিবর্তন ঘটেছে। সামান্য উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যায়, যেমন

(অ) 'The syntax of old English is natural in that is reflects the succession of mental images as they occur where as Modern English syntax imposes a discipline which makes clear the relation of one idea to the next.'

বাংলা গদ্যের পদক্রম বিচারেও একথা অপ্রযোজ্য নয়। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজী গদ্যের ভারসাম্যহীনতা, অনুচ্ছেদ ও যতি প্রভৃতির দুর্বলতার পেছনে এই শৃঙ্খলাবত্তিতার অভাববোধটাই পীড়াদায়ক। সংস্কৃত প্রকরণ ও ইংরেজী প্রবণতা দুই উচ্চ গ্রামতাই এর কারণ। গৌড়ীয় ব্যাকরণকার তা উপলব্ধি করতে পারে স্বভাবতই প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন—

১। "সংস্কৃত সন্ধি প্রকরণ ভাষায় উপস্থিতি করিলে, তাবৎ গুণদায়ক না হইয়া বরঞ্চ আক্ষেপের কারণ হয়; ...

২। এরূপ পদ (সমাস) গৌড়ীয় ভাষাতে বাহুল্য মতে ব্যবহারে আইসে না।...

প্রভৃতি...। তৎসঙ্গে—"পণ্ডিতি যুগের অবসান হইল এবং ইংরেজী যুগের সূত্রপাত হইল। ইংরেজী সাহিত্যের আদর্শেই আমরা বঙ্গ সাহিত্য রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।'[১৪] তাই "আইডিয়া বাদ দিয়ে বাংলা আজ আমরা কেউ লিখতে পারি নে।"[১৫] ফলেই রামমোহনের 'পদে পদে পূর্বপক্ষকে প্রদক্ষিণ করিয়া অগ্রসর হওয়া' রোধ হোল ; বিদ্যাসাগরের 'অন্বয়' গুণান্বিত সংস্কৃতবহুল ভাষায় কেবলমাত্র কলানৌচিত্যই যথেষ্ট বিবেচিত হয়ে রইলো না। ভাষার স্থিতিস্থাপক রূপ আবিষ্কারে এই মনীষীদ্বয় সংস্কৃত পদাদির বর্জন কিংবা সংযোজন কোন পন্থাতেই আধুনিক হলেন না। তবে তৎপূর্বে 'অন্বয়ের' পন্থা বা Syntax রচন ছিল না। সেখানে ভিন্নতর মনোবৃত্তি ক্রিয়াশীল ছিল। এবং বিদ্যাসাগরই সর্বপ্রথম লেখক যাঁর ভাষার মর্যাদা "তার সংস্কৃতবহুলতার উপর নয়, তার Syntaxএর উপর নির্ভর করে।"[১৬] এবং উপরের বরাতে বলা যায়, "Syntax imposes a dicipline which makes clear the relation of one idea to the next" বাংলা গদ্যে এই বস্তুরই অভাব ছিল। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার ও রামমোহন উভয়েরই সমস্যা ছিল এই অন্বয় নিয়ে। রামমোহন অন্বয়ের হিসাব বলে দিয়েছিলেন সত্য কিন্তু বিচার পদ্ধতির হিসাবে ভুল করেছিলেন। বিদ্যালংকারও প্রায় দার্শনিক বচনে সুখ উচ্চারণ করেছিলেন মাত্র ঃ "অন্যান্য দেশীয় ভাষা হইতে গৌড়দেশীয় ভাষা উত্তমা, সর্বোত্তমা সংস্কৃত ভাষা বাহুল্যহেতুক।" বৈজ্ঞানিকবোধ থাকলেও এই স্বাদেশিক উচ্ছ্বাস বিশ্লেষণ রহিত উদাহরণবিরল। তাঁর ভাষার নমুনা ঃ

'অস্মদাদির ভাষার যুগপৎ বৈখরীরূপতামাত্র প্রতীতি সে উচ্চারণ ক্রিয়ার অতিশীঘ্রতা প্রযুক্ত উপর্যাধোভাবাবস্থিত কোমলতর বহুল কমলদল সূচীবেধন ক্রিয়ার মতন।'[১৭]

১৪। ঐ, পৃঃ ৮০

১৫। ঐ, পৃঃ ৩৩২

১৬। ঐ, পৃঃ ৩২৪

১৭। লেখকের ভিন্নধর্মী রচনাও বিরল নয়, তবে তা গ্রাহ্য হয় নি। পণ্ডিতগণ "বিদ্যালংকার মহাশয়ের গৌড়ীয় রীতিকেই গ্রাহ্য করিয়া তাহাকে সহজবোধ্য করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।" প্রবন্ধ সংগ্রহ, পৃঃ ৭৭।

(আ) দ্বিতীয় পরিবর্তন দেখা দিল অব্যয়ের বিমূর্ত প্রয়োগে। প্রথমতঃ এই প্রয়োগ স্থূলবাচক ছিল; অথবা অনুরূপ নির্দেশকতার প্রয়োগে সীমিত ছিল, সেখানে বহুল পরিবর্তন ঘটলো—'to express a wide variety of abstract relations.'

(ই) বাক্যমধ্যে শব্দপ্রোথিত ভাবের যৌক্তিক পারম্পর্য বিধান ঘটিত চিন্তারও সংগে সংগে পরিবর্তন সূচীত হয়েছে। ইংরেজী বাক্যরীতিতে এরই ফলে "two negatives make an affirmative" বোধ জাগ্রত হয়ে বাক্যের মধ্যে চসারীয় নঙার্থক অনর্থকতাকে দূর করেছে। তবু যা আছে তার ব্যবহার ইতর-ভাষিত, যেমন I'll never do nothing no more for none of you, no, never no more, কেবলমাত্র নঙার্থবোধক অর্থেরই সীমায়ন এই নবকাব্য-রীতির লক্ষ্য নয় – তুলনার ক্ষেত্রে—এমনকি superlative [ক্রম শ্রেষ্ঠ] বুঝাতেও যৌক্তিকতার প্রাধান্য বিবেচনায় জোর বোঝানোর অহেতুক প্রবণতাকে বর্জন করা হয় এই বাক্যরীতিতে।

অর্থাৎ দ্বিত্ব তুলনা, দ্বিত্ব শ্রেষ্ঠক্রমপ্রভৃতি আর এখন বুঝানো হয় না। বাংলা গদ্যে বিশেষণ প্রয়োগের সামান্যতাতেও সেই ধারণা কার্যকর হচ্ছে।

(ঈ) শব্দবিন্যাস বা ক্রমস্থাপনার প্রতিও ইংরেজী বাক্যের প্রবণতা একটি আধুনিক রেওয়াজ। পূর্বে কেবল বাক্যার্থের ওপরই জোর দেওয়া হোত। শব্দবিন্যাসের প্রচলিত একটি ধারা অবশ্য ছিল কিন্তু তা ছিল ঘোরালো।

বাংলা বাক্যে এই ক্রম নির্দেশনাও ছিল একটি সমস্যা। এই ক্রমই বাংলা গদ্যের অন্তর্নিহিত ছন্দের উদগাতা। বাংলা গদ্যের এই 'ছন্দভিত্তি' স্থাপনে 'কলা-নৈপুণ্য' গুণের প্রয়োজন হয়েছিল। কলেজী গদ্য থেকে বাসুদেব চরিত পর্যন্ত একভাষা বন্ধের অভাব শ্রুতিকটু ও কষ্টকল্পিত শব্দাড়ম্বরতা ও নির্দিষ্ট রচনারীতির অভাব তো ছিলই, পরন্তু ইংরেজীর মত জীবন্ত ভাষার সংগে পরিচিত শিক্ষিত সমাজ তখন ভাষার কোনও রীতিকেই মেনে চলতে প্রস্তুত ছিল না। রাধানাথ ও প্যারীচাঁদের এই বৈদর্ভী প্রিয়তা, মৃত্যুঞ্জয়ের দোলাচলবৃত্তি, সংস্কার প্রিয় কৃষ্ণ মোহন বন্দোপাধ্যায়ের খ্রীষ্টপ্রিয়তা ও পাশ্চাত্যবোধ, ঈশ্বরগুপ্তে লঘুতর মিশ্রণ নির্দিষ্ট

বাক্যরীতি নির্মাণে খুব সহায়ক হয়েছিল মনে হয় না। কেননা বাক্যে শব্দের ক্রম আবিষ্কারটি অবহেলিতই হয়েছে বলা যায়। কয়েকজন লেখকের [কালক্রম রেখে] থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া যাক :

১। কেরীসাহেব : 'আপনি একটি সুমানুষের কন্যা স্থির করিয়া আনুন...'

২। রাজীবলোচন : 'রাজ্যের লোকদিগের কোনও ব্যামোহ নাই। ভৃত্য-বর্গেরা নিজ নিজ কর্ত্তব্য কার্য্যে প্রাধাণ্য করিয়া কাল-ক্ষেপণ করে।...'

৩। রামরাম বসু : 'ঘড়িয়ালেরা তাহাদের ঘড়িতে নিরক্ষণ করিয়া থাকে দণ্ডপূর্ণ হবামাত্রেই তারা তাহাদের ঝাজের উপর মুদ্গর মারিয়া জ্ঞাত করায় সকলকে।

৪। মৃত্যুঞ্জয় : কোকিল কলালাপবাচাল যে মলয়াচলানিল, সে উচ্ছলচ্ছি করা ত্যচ্ছ নির্ঝ'রাম্ভঃ কর্ণচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে।' (প্রবোধচন্দ্রিকা)

৫। রামমোহন : 'এদেশের পুরুষ মৃত্যুর নাম শুনিলে মৃতুপ্রায় হয়, এথাকার স্ত্রীলোক অন্তঃকরণের স্থৈর্য দ্বারা স্বামীর উদ্দেশ্য অগ্নিপ্রবেশ করিতে উদ্যত হয়।'

'ব্যাকরণ দুই প্রকারে বিভক্ত হইয়াছে, এক বর্ণ, দ্বিতীয় পদ।' (১৮৩৩)

৬। তুলনামূলক ভাবে কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়ের ভাষায় জটিল বাক্যবন্ধ রীতিও প্রাঞ্জলতাপূর্ণ ; তিনি ঈজিপ্তের বর্ণনা প্রসংগে লিখছেন : "একপ্রকার হংসরাজের বিষয়ে কথিত আছ যে সে ম্রিয়মান অবস্থার ব্যতীত জীবদ্দশায় কদাপি গান করে না। কিন্তু আসন্নকাল উপস্থিত হইলে মধুর স্বরে গান করে একথারও মূল লৌকিক অবিদ্যা মাত্র, তথাপি কবিগণ সদ্বক্তা এবং দর্শনবেত্তারা তদ্বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন......' [উপদেশকথা, ১৮৪০]

এ ভাষার প্রতিষ্ঠা না পাওয়ার কারণ তার খৃষ্ট ধর্মাবলম্বনজনিত জনবিরুদ্ধতা।

৭। বিদ্যাসাগর বেতাল পঞ্চবিংশতির এক একটি বাক্য নিয়ে বিভিন্ন সংস্করণে ছন্দ সংস্থাপন উদ্দেশ্যে কি পরিশ্রম করেছেন দেখা যেতে পারে ঃ

১ম সংস্করণ ১৮৪৭ ঃ যাহা কহি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। এবং তদনুসারে-
৭ম সংস্করণ ১৮৫৮ ঃ যাহা কহি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। শুনিয়া তদনুসারে-
১০ম সংস্করণ ঃ যাহা কহি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া, তদনুযায়ী – ইত্যাদি।

স্পষ্টই বোঝা যায়, লেখক নিজের বক্তব্য গুছিয়ে প্রকাশের জন্য ও ভাষায় ছন্দঃস্পন্দ ফুটিয়ে তোলার জন্য নিরন্তর চেষ্টা করে চলেছেন। আপন চেষ্টায় তিনি ধ্বনিজ্ঞান অর্জন করেছেন যার ফলে পরবর্তী সংস্করণে উপচ্ছেদ (susidiary sense pause) ব্যবহারে সেই ক্রমধ্বনি সচেতনতাকেই এগিয়ে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন। ইংরেজী গদ্যের সংগে পরিচয় বৃদ্ধির সংগে সংগে ভাষার অঙ্গ সংস্থান, পূর্ণাবয়বগঠন ও কলাসম্মত সৌন্দর্যবিধানে তাঁর মনোযোগ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ধ্বনিগত প্রসাধন বৃদ্ধির সংগে সংগে তাই রূপগত প্রসাধন বৃদ্ধিও ঘটতে থাকে। বাংলা বাক্য যে বাক্যাংশের সমষ্টি মাত্র, আবার এই বাক্যাংশগুলি শ্বাসপর্ব ও সার্থপর্বে চিহ্নিত হবার উপযোগীতা তিনিই প্রথম উপলব্ধি করলেন ঃ—

"যে ব্যক্তি দিবাভাগে / অথবা রাত্রিকালে / অসিত, আর্তিমান ও সুনীথকে / স্মরণ করিবে, / তাহার / সর্পভয় থাকিবে না।। (মহাভারত)—এখানে ছেদ (sense pause) ও যতি (breath pause) যেমন একত্র বসেছে, তেমনি যতির ছেদ-নিরপেক্ষ সংস্থানও হয়েছে। এই ছেদ যতিজ্ঞানই বাক্যের প্রধান শক্তি শব্দের অর্থ যোগ্যতা বৃদ্ধি ঘটিয়ে অন্বয়রীতি নির্মাণকে সহজ করে আনে। সাগরীগদ্যের পূর্বে পাঠ্যপুস্তক রচনার যুগে গদ্যের দুর্বলতা ছিল এখানেই ; সুসমঞ্জস প্রবাহ ও গতি এবং স্থিরতার অভাব ছিল—কোথায় থামতে হবে কোথায় অগ্রসর হতে হবে তা সুগ্রথিত অন্বয়রীতি বা পদ্ধতি বিশেষে জানা হয় নি, দূরান্বয় রীতিতে তা সাধিত হত মাত্র। তাতে অর্থের স্পষ্টতা দানের দায়িত্বও ছিল অল্প। রামমোহন সেই দায়িত্ব অনুভব করেছিলেন তাই ব্যাকরণের সংজ্ঞায় "অন্বয়রীতি যে গ্রন্থের অভিধেয় হয়" তা তিনি বারবার বলেছিলেন এবং বুঝিয়েছিলেন যে এ গ্রন্থের দ্বারাই "যথাযোগ্য স্থানে পদবিন্যাসের ক্ষমতা হয়।"

বলা দরকার যে আজকের দিনের মত তখন ভাষার রূপ (accepted usage) ভেঙেচুরে—ব্যাকরণ, অন্বয়রীতি, শব্দক্রম ও বাক্য গড়নের ছাঁচকে বিপর্যস্ত করে এবং নতুন ঢং-এ সাজিয়ে তার সম্ভাবিত সংকেত-লক্ষণা ফুটিয়ে তোলার প্রশ্ন ওঠে নি। রামমোহনের রচনায় ভাষায় যে যুক্তি দৃঢ় ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপনের প্রয়াস দেখা দিল বিদ্যাসাগরের রচনায় সেই শক্ত ভিত্তির ওপরই অঙ্গবিন্যাস হলো এবং অস্থিরতা ও উচ্ছৃংখলতার নিরসন ঘটলো।

[৫]

ভাব বা অর্থের উৎপাদনই অন্বয়রীতির উদ্দেশ্য। এই অন্বয় রূপের সিদ্ধি ও তার সংহতি দানের ইতিহাসই বাংলা গদ্যের ইতিহাস। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের উক্তি দিয়েই সেকালের সাধারণ রচনাকারদের মানস অবলোকন করা যায়ঃ "শাস্ত্রে বাক্যকে গো শব্দে যে কহিয়াছেন তাহার কারণ এই ভাষা যদি সম্যক রূপে প্রয়োগ করা যায় তবে স্বয়ং কামদুঘা ধেনু হন, যদি দুষ্টরূপে প্রয়োগ করা যায় তবে সেই দুষ্ট ভাষা সন্নিষ্ঠ গোত্ব ধর্মকে স্ব-প্রয়োগ কর্তাকে অর্পন করিয়া স্ববক্তাকে গো রূপে পণ্ডিতদের নিকটে বিখ্যাত করেন।... অতএব বাক্যতে অত্যল্প-দোষও কোন প্রকারে উপেক্ষণীয় নহে।"

বাক্যে দোষ এনেই বাক্যের দোষ খণ্ডাতে চেয়েছেন আমৃত্যুঞ্জয় বিদ্যাসাগর পণ্ডিতবর্গ। পদক্রম বিচারে তাদের ইতিহাসই প্রধানভাবে স্মরণীয়। এখানে সেই ইতিহাসটুকুই তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। বাংলা গদ্যের রূপতাত্ত্বিক আলোচনা অবশ্য নতুন নয়। উনিশ শতকী আলোচনায় উনিশ শতকের জাগরণকেই তুলে ধরার প্রবণতা অধিক। আর প্রমথ চৌধুরী পর্যন্ত পাই পণ্ডিতদের হাত থেকে ভাষাকে রক্ষা করার সংগ্রামের ইতিহাস। তবে তাঁদের সমগ্র আলোচনায় বোঝা যায় যে তাঁরা বাক্যের গঠন প্রকৃতিতে মৌখিক বাক্যের (ব্যবহারিক বাক্য) রূপটি প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছেন, কেননা বঙ্গীয় রীতি বা কাঠামোতে শব্দাদির সমষ্টিকরণ রূপটি সুঅন্বিত প্রকাশ পেয়েছে, অন্বয়রীতি কষ্টকল্পিত পরানুকরণদুষ্ট এবং দূরান্বয়[১৮] বশতঃ অর্থস্ফুটনে দুর্বল কিংবা সরাসরি নয় বলে বিবেচিত

১৮। "ক্রিয়া হইতে বহুদূরে কর্তা ও কর্মের অবস্থান, বাঙ্গালা বাক্য-রীতির অনুমোদিত নহে। সেই হেতু, ও বক্তব্যের সংক্ষেপের জন্য, অনেকগুলি বাক্য সম্মিলিত করিবার চেষ্টা সাহিত্যের গদ্যে দেখা গেলেও, বাঙ্গালায় যতদূর সম্ভব ছোট-ছোট বাক্যই প্রশস্ত।"—ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ ঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় পৃঃ ৪৬৩।

হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সাধু গদ্য এবং চলতি গদ্যের পার্থক্য তাই রূপগতভাবে সামান্য ঃ

"স্মৃতির পটে জীবনের ছবি কে আঁকিয়া যায় জানি না। কিন্তু যে-ই আঁকুক, সে ছবিই আঁকে। অর্থাৎ যাহা কিছু ঘটিতেছে, তাহার অবিকল নকল রাখিবার জন্য সে তুলি হাতে বসিয়া নাই। সে আপন অভিরুচি অনুসারে কত কী বাদ দেয়, কত কী রাখে।" (জীবন স্মৃতি)

অথবা,

"জ্ঞানের ভাষা যতদূর পরিষ্কার হওয়া চাই ; তাতে ঠিক কথাটার ঠিক মানে থাকা দরকার।"

রবীন্দ্র গদ্যে অন্তর্নিহিত এই তাৎপর্যটি বংকিম উপলব্ধি করেই কি হুতোমকে অপবাদ দেন (১৮৭৮), কিন্তু য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রতে (১৮৭৯) নিশ্চুপ ক্ষমা দেখান ?

আঙ্গিক ও সমস্যা

উপন্যাস ঃ প্রথম চিন্তা

মানব বিকাশ ধারায় ইচ্ছা-অনিচ্ছা, রুচি-প্রবৃত্তি, শিক্ষা-সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও ঐহিক বৃত্তি, আহ্লাদ ও প্রবণতা প্রভৃতি এক উদ্দীপক অবলম্বন। এবং সকল কিছুর মূলে মানুষী চিন্তা তথা সু ও কু-এর দ্বন্দ্ব। হাবিল-কাবিলের জীবন—জীবনটাই-নির্দ্বান্দ্বিক আদম-ইভের পার্থিব জীবনকে অস্বীকার করার এক অমোঘ দলিল। আদমের পূর্ব জীবনের ক্লান্তিকর সুখ এখন থেকে প্রশ্ন চিহ্নিত পথে যাত্রা শুরু করলো। বিচ্ছেদ এলো মিলনের প্রশ্নকে স্থায়িত্ব দেবার, রং দেবার, আলো নিয়ে। বিচ্ছেদ এলো সাহিত্যের কামনাকে রং দেবার অছিলায় সত্যকে নিয়ে। তারপর বাইবেল বর্ণিত যুদ্ধের পর মানুষ কোলাহল করে পৃথক হলো, পৃথক ভাষা নিয়ে কোলাহল করলো। আবার একত্রিত হবার জন্য কোলাহল করলো। একত্রিত হয়নি, মিলনের প্রতিষ্ঠাও হয়নি, সাহিত্যও ঘটেনি এবং কবির এই আপাতঃ ব্যবধানে ক্ষুব্ধ হয়ে লিখেছে Lines written in the early spring. নাট্যকারের পাত্র-পাত্রীরা ব্যঙ্গের ধার মুখে নিয়ে Le Bourgeous Gent il homme (মঁসিয়ে জোয়ারদেঁর কাহিনী – মলিয়ের) করেছে অভিনয়—সাহিত্যের প্রশ্ন তুলেছে, বিরোধের অভিযোগ এনেছে।

কিন্তু সকল প্রশ্নের অন্তরালে সাহিত্য-প্রীতি ও সাহিত্যবোধের চিত্রিত লেখা আজো আমাদের অভিভূত করে রেখেছে। সাহিত্য ঘটেনি কিন্তু সাহিত্য হয়েছে। সাহিত্য হবে বলেই মিলন হলো না।

এ কথা কেউ বোঝেনি, এ কথা প্লাতো বুঝেছে, তার শিষ্য বুঝেছে।

প্রথম খোলা জানলায় আলো আর বুলবুলি কবে খেলা করেছিলো কেউ জানে না। কে দেখেছে, কে বলেছে এসে? কেউ জানে না। প্লাতো জানে। হয়ত জানে। কেননা এখন, এই আজ পর্যন্ত, মানুষের যত জ্ঞান তার ভিত্তি

রেখেছে প্লাতোরই পরিক্রমার ওপর। প্লাতো নিজেই জ্ঞানের উৎস, নিজেই জ্ঞানের বৃদ্ধি, নিজেই এক Epos, নিজেই কোন এক Epic; এরিষ্টটল তার Poetics-এ প্লাতোকেই রেণু রেণু করে ছড়িয়েছেন মোরগ তার পাখায় যেমন বালু ঝাড়ে। আজিলীর পথর থেকে টেন্ কম্যাণ্ডমেণ্ট্সের পাথর, চামড়ায় লেখা Old Testament থেকে জোহান ওটেনবার্গ-এর ছাপাখানার বই, কি তারো পরে পিকোডেলা মিরানদোলা, লুথার—আরো পরে ম্যাকিয়াভেলি—এঁরা যে ইতিহাস দেবে তা কেবলি বুদ্ধির ইতিহাস। সর্বশেষ সৌন্দর্যের দিকে এগিয়ে যাবার ইতিহাস। প্লাতো তারই চূড়ান্ত চেতনার এক বুদ্ধ। রকেটের যুগে তাই আর আমরা কেউ আশ্চর্য হই না।

কিন্তু দ্বিধা জাগে। দ্বিধা জাগে প্লাতোরও। কবিদের দণ্ড দিয়ে তাই তিনি বিখ্যাত। আবার ভালবাসার এক আশ্চর্য ফতুয়া দিয়ে তিনি স্বনামধন্য।

পৃথিবীর জিজ্ঞাসা পৃথিবীর শ্রম ও নিষ্ঠাকে এগিয়ে দিয়েছে, জিজ্ঞাসাকে পেছনে ফেলতে পারেনি। তাহলে জীবনের মূল্য নিয়ে মিরানদোলারা এতো হৈ চৈ করতে পারতো না। মার্কস—লেলিন আর দার্শনিক মূল্য নিয়ে প্রশ্ন তোলেনি—সেইখানেই ত শেষ হয়ে গেছে সেই সব প্রশ্ন। প্রথমে কি হারিয়েছি তাই নিয়ে কথা উঠলো, তারপর কি হারাচ্ছি। এই থেকেই দ্বিতীয় পৃথিবীর জন্ম।

সেই দ্বিধা, সেই প্রেম, সেই ভালবাসার পৃথিবী আজো আছে, কিন্তু সেই মানুষ আর রইলো না। প্রথম খোলা জানালায় মৃদু আলোর শিহরণ কখন সরে গেছে।—এখনকার রোদের উত্তাপ সৃষ্টিশীল সত্তার ক্রিয়ায় স্পষ্ট প্রত্যয়ীভূত।

উপন্যাসের চিন্তা এযুগে তাই দুই পৃথিবীর মনের মাঝে মীমাংসা অথবা নতুন চেতনার মূল্যায়ন অর্থে এক অন্তিম মুক্তি। শ্রীমতি বেভোয়ার উপন্যাসে অথবা অধুনাতম উপন্যাস চিন্তায়, প্রিষ্টলে যা-ই বলুন মানুষী চিন্তাই উপন্যাসকে বিশিষ্ট করেছে। তাই দেখি রাশিয়ার শেষতম উপন্যাসও টলষ্টয়ী জিজ্ঞাসাকেই নতুন দেহাবয়বেই সাজায়। বরিস পস্টারনাকের Last Summer-এ সেরেজহার উক্তিগুলি, কেবল যুক্তিই নয়, বিশ্বাসও। এক জায়গা থেকে সামান্য উদ্ধৃতি অনুবাদ তুলে দেওয়া যাক—'আগের সংকল্প অনুযায়ী সেরেজহা শেষ পর্যন্ত

বললে যে ইন্দ্রিয় পরায়ণতা সম্বন্ধে আরিস্তের যা মনোভাব তা টলষ্টয় থেকেই ধার করা, আর রাশিয়াতে নামের সেরা টলষ্টয়।'

অস্তিত্ববাদের ধারণা যাদের মনে খুব স্পষ্ট, জীবনের পটভূমি বিস্মৃত হলে সেই অভিজ্ঞতায় তাদের মনও কুয়াশাচ্ছন্ন হতে বাধ্য। সার্ত্রে'র প্রশ্ন ছিল চেতনাকে নিয়ে, বার্নার্ড শ'-এর প্রশ্ন ছিল Tyranny of sex নিয়ে, পষ্টারনাক প্রশ্ন তুলেছে 'কোন নারীর অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে হলে তোমরা তার মধ্যে কোন একটা অশোভন রহস্য আরোপ কর। তোমরা সুস্থ জীবন যাপন করছো না।'

মূলতঃ সব প্রশ্নই এক। সুস্থ মানবিক চেতনা এবং অবিকৃত মানব জীবন আজকের উপন্যাসের প্রতিপাদ্য। চেষ্টার ত্রুটির প্রশ্ন এখানে অবান্তর, এতদিন পরে এই নতুন প্রশ্নের ডাঙ্গায় উঠে এসেছি সে কেবল লক্ষ্যই মরীচিকাপ্রতিম ছিল বলে। ব্যবহারিক জীবনে আজ আমরা মানুষ, এই নতুন সত্যের বেদ উপন্যাস বলার আগে আর একবার বলতে চাই, শ্রদ্ধেয় মানুষ ভাষাকে জীবনের হাতিয়ার করেছে চেতনার সংগে মিশিয়ে ; তাই উপন্যাস আজ অপরিহার্য।

নাটক প্রসঙ্গ

নাট্যান্দোলনের প্রেক্ষিতেই যে কোন নাটকের আলোচনা বিবেচনা প্রস্তুত হয়, কারণ পশ্চাদভূমি এবং আবহাওয়া দুই মিলেই কোন সৃষ্টিকে সম্পূর্ণ করে। নাটকের সাধারণ ধর্মই হলো এই যে, জাতীয় জীবনে ভাবে হোক কর্মে হোক যে কোন চৈতন্যে ও সাফল্যের কারণে যে প্রতিক্রিয়া জন্মে তার একটা অবশ্যম্ভাবী ও নির্ভুল রূপচিত্র সে নির্মাণ করে। মানুষের "অনুকৃতি-স্বভাবের" এই নাট্য স্ফুরণের ইতিহাসও সে কারণে বড় বিচিত্র। প্রাচ্য-প্রতীচ্য সকল দেশে অভিনয় কলার লৌকিক নির্মিতিটি অবশ্যই এই প্রতিক্রিয়াজাত; প্রকাশ রূপটি যতই বিচিত্র হোক।[১]

অর্থনৈতিক জগতের পরিবর্তন মানুষের অনুকৃতি কর্মের সকল কারণকে বিজ্ঞানের অন্তর্গত করেছে; অভিনয় কলার রূপে আবশ্যিক এবং বৈজ্ঞানিক স্বচ্ছতায় ক্রমে ধরা পড়েতে শুরু করেছে ঐক্য-বিজ্ঞান, গতি সঞ্চারণ বিজ্ঞান, ট্র্যাজেডি তত্ত্বের রূপান্তর, প্রভৃতি নাট্য বিজ্ঞানের বিষয়াদি এবং বেন জনসনের কালে তো তা পুনর্বিবেচনা ও পুনর্পরীক্ষারই বিষয় হয়ে উঠল। নাটকের এইরূপ কলা-কৌশল ও আদর্শ-চিন্তা কোন অঞ্চল বিশেষে সীমিত থাকেনি—পৃথিবীর সর্বত্র তা নাট্যরচনার প্রেরণা জুগিয়েছে। Noel Coward-এর cavalcade রচনার পর তা আর অস্পষ্ট থাকে নি।

১। গ্রীসে মুখোস পরার রীতি থাকতো, আর খোলা আকাশের নীচে বিশ ত্রিশ হাজার লোকের সামনে মুখভঙ্গীর বিচিত্র প্রকাশলীলা তথা অভিনয় হোত, চীনে প্রত্যেক অভিনয়ের একটা মৌলিকতা থাকতো—আবার নাটকের রসাস্বাদনে ব্যর্থকাম ব্যক্তিদের জিভ দোজখের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে—এই সংস্কার ছিল অত্যন্ত বদ্ধমূল।

বিংশ শতকের তৃতীয় দশকের সর্বনাশ প্রথম দশকে কেউ কল্পনা করে নি—অন্তত: আমাদের দেশে—ফলে পৃথিবীর অন্যত্র নাট্যরীতিতে যে সব রূপান্তর ঘটে যাচ্ছিল, আমরা তার থেকে একটু দূরেই ছিলাম। একটা বিশেষ রাজনৈতিক ধূম্র আবেশে আমাদের নাটক জাতীয় জীবনের এক বিশেষ চৈতন্য-সমৃদ্ধ জগৎকে উপস্থাপনে ব্যাপৃত ছিল।

অবশ্য নাটকের আর একটি প্রধান সূত্র এই যে, জাতীয় উদ্দীপনাদি যে সগৌরব মহিমার চিত্রময় আকাশকে নাটকের উত্থানের মধ্যে বিচিত্র করে, জাতীয় অবসাদের সাথে সাথে তা স্তিমিত হয়ে হয়ে যায়ঃ Aeschylus-এর Persae নাটকটি Confederacy of Delos-এর একচ্ছত্রতার যে পূর্ণ মধুর চিত্র ও তৎকালীন গ্রীসের অন্তরের উল্লাসের যে ছবি তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিল, Pelepo-nesus-এর হাতে এথেন্সের নির্যাতন শুরু হওয়ার সাথে সাথেই সেই গৌরব-সূর্যের স্বপ্নকে জাগ্রত চিত্তে ধারণ করার মানসিকতাও দুর্লভ হয়ে উঠে। রোমেও তো তাই, Quintus, Enuis, Lucis, Accins প্রভৃতি নাট্যকারদের মধ্যে জাতীয় উদ্দীপনার বেগ তখনই সম্ভব ছিল, যখন রোমের 'টার্গেট' ছিল কার্থেজ কিন্তু Euripedes কে অনুকরণ করে হতভাগ্য Seneca অগাষ্টান যুগের মোহাবিষ্ট আবর্তন থেকে বেরিয়ে আসার পথ কি পেলেন? যে নাটক তিনি লিখলেন, তা না হল গ্রীক, না হল রোমান।[২]

কর্ণেইর (Cornelli) আগে মধ্যযুগীয় অলৌকিকতা মিশ্রিত এক ধরণের ধর্ম-নাট্যের প্রাবল্য বিরাজমান ছিল ফারাসীতে: সেনেকা প্রবর্তিত New-classic (বিকৃত?) ধারানুসরণে কর্ণের হাতে বেরুলো সিড (cid), রাসিন (Racine) প্রভৃতি প্রতিভাবন নাট্যকারগণও এর প্রভাবকে এড়াবার কথা ভাবতে

২। পরবর্তীকালে এহেন নাটকও রুচিবিকারগ্রস্থ ইউরোপের জন্য সম্মুখ আদর্শ হয়ে ওঠে। কারণ Classical সাহিত্য চর্চার তাগিদ যখন ইউরোপে আবার ফিরে এলো, তখন ঐতিহাসিক সংনিষ্ঠার মূল গ্রীক অন্বেষণের প্রবৃত্তি, ক্ষমতা এবং সুযোগ ইউরোপের ছিল না· গ্রীক অনুককরণে লিখিত লাটিনই তখন হয়ে ওঠে একমাত্র আদর্শ। ফারাসীতে এই অনুকরণ শুরু হয় প্রবলভাবে। (Hamlet-এ Saneca সম্পর্কিত উক্তি স্মরণীয়)।

পারলেন না। মলিয়েরে তখন অভিনয়ের দল বেঁধে দেশে দেশে ঘুরছেন এবং রাসিনের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতরণের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এই সময়ই একটি ছোট্ট টেনিস খেলার মাঠে মলিয়েরের ছোট্ট একটি অভিনয়ে এই রাজকবির সকল দুর্বলতাগুলিকে প্রকট করে তুলে ফরাসী নাট্য-জগতে মঞ্চব্যবহার, সংলাপ ও চরিত্র নির্মাণ এবং নাট্যবিষয়গত পরিবর্তন আনলেন।

ঘটনা হিসাবে মলিয়েরের আবির্ভাব ঐতিহাসিক। প্রথমতঃ, সমগ্র ইউরোপ তখন তথাকথিত ক্লাসিকাল প্রথানুসরণের বিরূপতা করতে তথা রাসিনের বিরুদ্ধে কলম তুলতে সাহসী ছিল না; দ্বিতীয়তঃ, ফরাসীগণ এমনি-তেই নিজেদেরকে দ্বিতীয় গ্রীক বলে মনে করেন আচারণে, সংস্কারে প্রভৃতিতে; এবং তৃতীয়তঃ, বহু দিন ধরে তখন রাজন্যবর্গের ভীষণতম ভয়ঙ্করতম অত্যাচার জনমানসের মেরুদণ্ডটিকে বক্র করে রেখেছিল। "I am the state" তত্ত্বই তখন একমাত্র রাজনীতির দণ্ড, ফলে এক বিশেষ মধ্যবিত্ত চেতনা সেই গ্রীক অদৃষ্টবাদীদের মনে বল সঞ্চার করতে থাকে। তার্তুফ রচয়িতা মলিয়ের প্রায় সমাজ সংস্কারই করেন।

এই প্রেক্ষিতটি গ্রহণের কারণ শুধু ভিন্ন সমাজ পরিবেশের বা স্পষ্ট ঘটনার কোন বৈশিষ্ট্য কি বিশেষ ধরনের নাট্য-আন্দোলনকে সফলতা দান করে তার ইতিহাস প্রণয়নই নয়—আমাদের মধ্যবিত্ত জীবনের নানা কর্মপ্রবাহের মধ্যে ফরাসী ধারার সংগে মিলটুকু আবিষ্কারও। কারণ প্রেক্ষণটি ভিন্ন হলেও অর্থাৎ ইংরেজী রোমান্টিক নাটকের অনুকরণে আমাদের নাট্যধারার বিকাশ ঘটলেও জীবনযন্ত্রনার অভিজ্ঞতাটি আমাদের এক,—ফরাসীদের থেকে খুব দূরবর্তী নয়। কর্ণেই, মলিয়ের, রাসিন ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ লুইএর গৌরবে মণ্ডিত শতাব্দীর নাট্যকার ছিলেন—Richelien, Mazarin প্রভৃতি সচিব প্রধানদের কর্ম বহুল জীবনের দিনগুলি যাদের সাহিত্যের পাতায় অমর হয়ে রইল। কিন্তু ফারাসীতে অকস্মাৎ যে পরিবর্তন সঞ্চারে সবলে জীবনকে উচ্চকিত করে তা সমরসচীব Louvois এর ক্ষমতাকে স্বীকার এবং অস্বীকারের ভিত্তিতে, এবং চতুর্দশ লুই এর সিংহাসনারোহণের ঠিক নির্দিষ্ট মুহূর্তে। সেই Le grand monarque লুই ফরাসীকে অকস্মাৎ স্বর্ণযুগে উত্তোলন করেন: "France suddenly and wonderfully came to her maturity,' ফরাসী নাটকের অভ্যুত্থানের সেই এক কাল।

সংযম এবং তীব্রতা যার "একক" (Dramatic Units)।

গ্রীক নাটকের অদৃষ্টবাদের ও হাহাকারময় জীবনের অবরোধবাদের মধ্যে চরিত্রের পৌরুষ ও বীর্য ছিল মহত্তম প্রকাশের বিষয়। ক্রমে নাটকের বিষয় ও দেহে প্রবেশ করলো খণ্ডীকরণের তত্ত্ব। Chorus হলো situation, আবার situation হলো characterisation. অর্থাৎ মৌলিক পরিবর্তনকে মেনে নিল নাটক। নাটক হলো Romantic : মানবমনের অজেয় শক্তির বিকাশ ঘটলো তাতে, দ্বন্দ্বের বিচিত্র এবং ভয়ংকর রূপগুলি ফুটে উঠলো ঠিক বিপরীত তাৎপর্য নিয়ে এবং সেখানেই চরিত্র শুধু একটা অবক্ষয়ের রূপ নিয়েও অসম্ভব বাস্তব এবং দীর্ণ ক্ষুধায় বলিষ্ঠ ও নিঃসংকোচ প্রত্যয়াভিসারী হয়ে উঠলো। অবশ্য ঘটনার বাহুল্যও প্রবৃত্তির নানাবিধ প্রকাশের ন্যায় সৃষ্টি করলো বহুতর জটিল ও অতিরিক্ত সমস্যার। কারণ সেই অলৌকিক নির্মম শক্তির হাত থেকে মানুষ নিজেকে মুক্ত করে নিজেরই রহস্যের কাছে ধরা পড়ে গেছে—আজীবন তাকে বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতের বাধাগুলি পীড়ন করছে।

আসলে এই ধারাটি জীবনে বহুরকম জটিলতা এবং প্রশ্ন এসে ভিড় করেছিল বলেই জন্ম নিতে বাধ্য হয়েছিল। বিজ্ঞান এবং অর্থনীতির ধারণায় তথা আমাদের পরিবর্তিত মানসিকতায় এর জন্ম। ইংল্যাণ্ড এবং স্পেনের Turin নগরের আন্দোলনে এর বিকাশ, শিলারের Don Carlos ও Wallenstein গেটের Faust, Egmont Iphigenie-তে এর পুষ্টি।

বাংলা সাহিত্যে বিচ্ছিন্নভাবে কখনো ফরাসী কখনো জার্মানীর চর্চা হয়ে থাকলেও আমাদের 'বঙ্গদর্শন' ঘটেছে ইংরেজদের ও ইংরেজী সাহিত্যের মাধ্যমে। মনোমোহন ঘোষ ঠিকই বলেছেন, (দ্র, সাহিত্য-শিল্প পৃ ৯৫) "শেক্সপীয়ার থেকে শুরু ক'রে বেন জনসন পর্যন্ত ইংরেজী নাট্য সাহিত্যের যে কৌশল ও আদর্শ দাঁড়িয়েছিল, তাই ছিল বাংলা নাট্য সাহিত্য গ'ড়ে ওঠার ব্যাপারে প্রধান প্রেরণা।" স্পেনের আর্মাডার পতনের পরই ইংলণ্ডে যখন স্বর্ণ যুগের সূচনা দেখা দেয়—ইংরেজী নাটকের প্রকৃত সূত্রপাত ঘটে তখনই। বহুকাল বিবাদের পর ফরাসীদের সাথে তখন মৈত্রাও স্থাপিত হয়েছিল, অর্থনৈতিক ও গৃহী জীবনের তখন এক পরম নিরুপদ্রবতার কাল—বহির্বিশ্ব আবিষ্কারেও ব্রিটিশ দ্বীপবাসীদের আগ্রহ অন্যান্য-

দেশের সংগে প্রতিযোগিতায় চলছে। গ্রীস ও ইতালি প্রভৃতি দেশে দেশপ্রেমের উচ্ছাস নেমে এসেছিল মহাকাব্যের স্রোতে — ইংলণ্ডে এই সময় দেশপ্রেমের গাথা গাইল নাট্যকারগণ, বিশেষতঃ ঐতিহাসিক নাটকের মধ্য দিয়েই তা ফুটলো অধিকতর পরিস্ফুট হয়ে। জাতির সেই অদম্য উৎসাহ, স্ফূর্তি, জীবন আবিষ্কার ও তার স্বাদ গ্রহণের গভীরতম আহ্লাদ এক বিশেষ দেশাত্ববোধমূলক বাধাবন্ধনহীনতায় রোমান্টিক নাটকের রূপককে ধরা পড়লো--রোমান্টিক নাটকের এক আশ্চর্য উৎকর্ষ সাধিত হলো এই ভাবে।

মনে রাখতে হবে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ ভিন্ন ভিন্ন দেশে অভিনয়ে মাইমেসিস ও মিমিক্রি-সত্যে মনোযোগ ও আকর্ষণ লাভ করেছিল নিজস্ব ভঙ্গীতেই। অতএব চীনের মত, পাক-ভারত উপমহাদেশেও অন্য-রীতির নাটক ছিল—পশ্চিমের এই রীতির সংগে তার মিল ছিল না আদৌ। যদিও ১৪শ শতকের ইংলণ্ডে উত্থিত Miracle play-র সাথে কণিষ্কের সমসাময়িক অশ্বঘোষের নাটকের তুলনা দেখতে চেয়েছেন অনেকেই এবং অনেকে গ্রীক নাটকের সংগে। গ্রীকের মহাকাব্য ও পুরাণের (Mythology) একটা ব্যবহারিক উপযোগিতা ছিল যা আমাদের ছিল না। ফলতঃ নাট্যরচনায় চরিত্র ও পরিবেশ অংকনের হেতু ভারতীয় মহাকাব্য ও পুরাণাদির ব্যবহারে যে বিসদৃশতা দেখা দেয়, তার থেকেই জন্ম নেয় সংস্কৃত নাটকের স্থান কাল পাত্রের অনৈক্য ও অন্যান্য সীমাবদ্ধতা। উত্তররামচরিতের ১ম ও ২য় অংকের মধ্যে ব্যবধান ১২ বছরের, এ ছাড়া নাটকীয় উপযোগবাদিতা সম্পর্কে আমরা ছিলাম চরম সংরক্ষণশীল (আশাবাদী ?)। Tragedy তো ছিল না। কেবল কতকগুলো Type চরিত্র নিয়ে কি করে নাটক ও কাব্য সমৃদ্ধ হয়েছিল এ উপমহাদেশে সে এক বিস্ময়। এ দেশীয় নাটকে লৌকিক জীবন বা সাধারণ সংস্কৃতির সংবাদও যেমন থাকতো না, বিদগ্ধ সংস্কৃতির তেমনি (যে জীবন অজন্তা ইলোরায়, সাঁচিতোরণে কিংবা অন্যত্র খোদিত, নির্মিত, চিত্রিত) থাকতো না কোন পথচিহ্নও। চারুদত্ত (ভাস) মৃচ্ছকটিক (শূদ্রক), মুদ্রারাক্ষস (বিশাখ দত্ত), মালতী মাধব (ভবভূতি) প্রভৃতি কয়েকটি হাতে গোনা ভিন্ন প্রকরণ মাত্র। এ দেশে নাটকের জন্ম হয়েছিল নগরে, বাৎসায়ন যার অধিবাসীর লক্ষণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, যিনি নাগরিক তিনি হবেন ধনী, সুরুচিবান, প্রসাধনপ্রিয়, সুপরিচ্ছদ, এবং তিনি লোধ্ররেণু ও গন্ধদ্রব্য মেখে মালা হাতে

প্রিয়াম্বেষী পথিকও ; তিনি সুকণ্ঠ ও কাব্যামোদী। পিঞ্জরের পাখিকে কথাশেখান তিনি, তিতিরের ও মেড়ার লড়াই দেখাই তাঁর কাজ। কাননে গল্প করে, মধ্যে মধ্যে বারাঙ্গনাগৃহে চাটুকার পরিবৃত হয়ে সাহিত্য চর্চা করে তবেই তিনি নাগরিক বলে পরিচিত হবার দাবী রাখেন। —এ হেন যে জীবন, তার মধ্যে গ্রীকদের ভীষণ-তর রহস্যের তমসাকে অনাবৃত করার, দুজ্ঞে'য়কে চাক্ষুস করার দুর্বার বাসনা কই ? কেবল খ্রীষ্টীয় ৫ম থেকে ৮ম শতাব্দীকাল মধ্যের কালিদাস, দণ্ডিন, বিশাখ দত্ত, শ্রীহর্ষ, ভবভূতি সে এক রহস্য মাত্র।[৩]

অতীতের এই ধারা, নাটকের এই জীবন রহস্য এবং তার বিকাশ বাঙালী জীবনে সন্ধান করা বুঝি নিরর্থ— কেননা, নাটক বলতে সংস্কৃত সাহিত্যবিদগণ যা বুঝতেন বা পাশ্চাত্য সাহিত্যশাস্ত্রীরা যা বুঝে থাকেন তেমন ধরণের দৃশ্যকাব্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ছিল না। বাঙালী আসর জমিয়ে মঙ্গলগীত প্রভৃতি গাইত মাত্র। কোন কোন ইতিহাসবেত্তাগণ একথা প্রমাণ করতে উদ্যোগী হয়েছেন যে 'চৈতন্য জীবনীর অলৌকিক রসাবেশের সংগে অন্তরঙ্গ পরিচয়ের ফলে বাংলা সাহিত্যে নাট্যকলাস্ফ রণের প্রবণতা দেখা গিয়েছিল' (শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)[৪] ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পালার[৫] অভিনয় প্রথা সেই সম্ভাবনার ইতিহাসের ক্ষুদ্র কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হিসাবেই অনেকে মেনে নিয়েছেন। এখান থেকেই বাংলা নাটক 'মিশ্র সাহিত্য' কিনা এ প্রশ্নের উদ্ভব ঘটেছে। মধ্যযুগীয় বাংলার জনপ্রিয় অভিনয় সাহিত্যকে প্রতিষ্ঠা দিয়েই উনিশ-শতকীয় নবনাট্যরীতির জন্মকে স্বীকৃতি দেওয়ার পেছনে এ-তত্ত্বের গুরুত্ব।

বাংলায় অভিনয়-কলা প্রবর্তনের ইতিহাসে সাক্ষাৎ গতভাবে সম্ভবত গীতগোবিন্দ বা প্রসন্ন রাঘবের অবদান প্রচুর। চণ্ডিদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন, শ্রীশ্রীরূপগোস্বামীর

৩। অবশ্য ল্যুডার্স সাহেবের পাঠোদ্ধার মতে তুরফানের বালুর মধ্যে পাওয়া সারিপুত্র প্রকরণ (অশ্বঘোষ) প্রভৃতির ইতিহাস ধরলে তবেই কিছুটা আশ্বস্ত হওয় যায়।

৪। দ্রঃ বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা, বৈদ্যনাথ শীল পৃঃ ১৪। ষোড়শ সপ্তদশ অষ্টাদশ শতকে বাংলায় নাট্যরচনার সম্ভাবনার উল্লেখ তিনি করেছেন।

৫। কবি চন্দ্রশঙ্কর চক্রবর্তী প্রভৃতি রচিত।

বিদগ্ধমাধব ও ললিত মাধব, গোবিন্দ দাসের সঙ্গীত মাধব, বিক্রমপুরের রাজা বিজয় (১৭১৭-র পূর্বে) এবং ভারতচন্দ্রের চণ্ডী নাটকের উল্লেখ করে সে ইতিহাসকে পুনর্নির্মাণ করা যায়। ১৭০৭/৮ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীতে বিদ্যানাথের চিত্র-যজ্ঞের অভিনয় সংবাদও এ পর্যায়ের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এতদ্ব্যতীত নেবারী হরফে লেখা নেপালে বাংলা নাটকের অভিনয়ের কথাও কোন কোন ঐতিহাসিক গুরুত্বসহকারে উল্লেখ করেছেন। (দ্র, ইতিবৃত্ত, হাই ও আলী আহসান পৃঃ ৩৬০)।

নাটকের প্রধান বাহন গদ্য। মধ্যযুগের সাহিত্যের বাহন ছিল কবিতা এবং সঙ্গীত। পদ্যে নাটক অচল নয় কিন্তু সে পদ্যে গদ্যের মত একটা পারুষ্য এবং স্পষ্ট ও সরাসরি বক্তব্য উপস্থাপনার শক্তি থাকা চাই। অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দরে তাই নাট্যভাবনা সম্ভব হতে পারে নি।[৬] সেজন্যই বাংলায় কিছু কিছু নাট-গীত রচিত হয়েছিল।[৭]

নাট্য সাহিত্যের আবির্ভাব তখনই হয়ে থাকে যখন সমাজ জীবনে একটা প্রবল আলোড়ন জন্ম নেয় এবং তৎপ্রসূত নানাবিধ জটিল দ্বন্দ্ব সমাজ মানসে ভেতরে ও বাহিরের প্রতিক্রিয়াকে সজীব বা সক্রিয় করে তোলে। ইসকাইলাস ইউরিপি-দাসের গ্রীক নাটকাবলী কিংবা মৃচ্ছকটিক, মুদ্রারাক্ষস কি উত্তররামচরিত থেকে কুমার সম্ভব, অভিজ্ঞান শকুন্তলা তো রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের দুর্লভ চেতনার জন্মদায়িনী সময়ের স্বর্ণচিহ্ন। রেনেসাঁ রিফরমেশনের যুগে ইউরোপেও সেই সব শ্রেষ্ঠ বুর্জোয়া নাট্যসাহিত্য এক প্রবুদ্ধ সৃষ্টির ইতিহাস নির্মাণ করেছিল। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের জন্মলগ্নে বাঙ্গালীর জীবনে প্রবল কোন তরঙ্গ চাঞ্চল্য অনুভূত হয়নি চৈতন্যদেবের আবির্ভাবেও। তাহলে কেবল মাত্র করুণ মধুর গীতি কবিতায় তা নিঃশেষিত হতে পারেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে তাই সমাজ ব্যবস্থার কাছে মার-খাওয়া মানুষ মুক্তি খুঁজে পায়নি; দৈবী রোষে মানুষ দুঃখ পেয়েছে, দৈবী-কৃপায় সে দুঃখ থেকে পরিত্রাণ আশা করেছে।

৬। 'আধুনিক যুগের প্রারম্ভকালে ভারতচন্দ্রের রচনার উজ্জ্বলতা ও শ্লেষ নৈপুণ্যই তাঁহার কাব্যরসকে নাট্যরসে রূপান্তরিত করার প্রেরণা যোগা-ইয়াছে।' শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (ঐ)।

৭। দেবোৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত নৃত্যগীতকে নাট্যগীত বলা হোত। জয়দেবের গীতগোবিন্দ, চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রভৃতি নাট্যগীত-জাতীয় রচনা।

মধ্য যুগের সাহিত্যে মানবাত্মা অপলাঞ্ছনার পুতুল মাত্র হয়ে বিশাল মঙ্গল সাহিত্যের প্রায় সবখানি জুড়ে[৮] ছিল ; ভিতরে বাইরে এই প্রবল দীনতার মাঝে সে-যুগে তাই মধ্যযুগীয় ধর্ম রক্ষা করে সাহিত্যে নাটক অনুপস্থিত থেকেছে।

এক সময় পলাশীতে নবাব এবং বাংলার ভাগ্যের পরিবর্তন হলো ; তা' নিয়েও বাঙ্গালী মাথা ঘামায় নি। ১৭৬৫ সালে কোম্পানী যখন এ দেশের সত্যিকার রাজা হয়ে বসল, সম্রাট শাহ আলম কোম্পানীকে বাংলা-বিহার উড়িষ্যার দেওয়ান করে বেনিয়াতন্ত্রের কাছে প্রকারান্তরে নিজের পরাজয়নামা লিখে একটা যুগের অবসান ঘোষণা করলেন, বাঙ্গালীর জীবনে তখনই প্রথম এলো দুঃসহ দ্বন্দ্ব। অবশ্য সেই সংগে একটা সম্ভাবনাও।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার ফলে বাংলা সাহিত্য-চর্চায় তথা কথিত নতুন রীতি গড়ে উঠল, নতুন শাসনের প্রেক্ষিতে। পাশ্চাত্য সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শনাদির আলোচনার সূত্রপাত ঘটলো। শিক্ষিত বাঙ্গালী দেখলো ইউরোপে ব্যক্তি মানুষের মুক্তি ; সে মুক্তিতন্ত্র বাঙালী জীবনেরও অবধারিত পরিবর্তন সূচনা করলো। রামমোহন-বিদ্যাসাগরের সংস্কারের যুগ তখন ; মধুসূদন ইয়ং বেঙ্গলেরা উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে মুক্তির স্বাদ পাবার চেষ্টা করছেন ; আর বঙ্কিম শিক্ষকের ভূমিকায় জাতিকে অনুশীলন মন্ত্রে দীক্ষিত করতে ব্রত গ্রহণ করছেন। রামমোহনের ব্রহ্মবাদ, বিদ্যাসাগরের সমাজ-সংস্কার, মাইকেলের বিদ্রোহ, বঙ্কিমের শিক্ষা নবজাগ্রত বাঙালীর মানসলোকে যে দুঃসহ দ্বন্দ্ব এবং নব জাগৃতির সম্ভাবনা এনে দিয়েছিল, বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তার অন্যতম প্রত্যক্ষ ফসল উনবিংশ শতকের প্রহসন, যার যথার্থ পরিণতিঃ বাংলা নাটক। উনিশ শতকের এক দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ পরিবেশে বাংলা নাট্যমঞ্চ অনুকূল আবহাওয়াকে আবশ্যিক কারণে গড়ে নিতে বাধ্য হলো ; জন্ম দিল সৎ ও তন্নিষ্ঠ (Serious and sophisticated) বাংলা নাটকের।

বাংলা নাটকের জন্ম কীর্তি বিলাস বা ভদ্রার্জুনে নয়। উনবিংশ-শতকের আত্মশক্তির জাগৃতির চিহ্ন স্বরূপে রত্নাবলীর প্রবল প্রতিবাদে মূর্ত হয়েই বাংলার

৮। চাঁদ সওদাগরের পরিকল্পনায় পূর্ব বঙ্গীয় রীতিতে একটা ব্যতিক্রম কল্পনা করেন অনেকে।

প্রকৃত নাটক স্ব অবয়বে অকস্মাৎ আত্মঘোষণা করে।[৯] আসলে তা একটা প্রতিক্রিয়ামূলক তাৎক্ষণিক সৃষ্টি "তাহার পিছনে কোন প্রবল দেশব্যাপী ভাবান্দোলন ছিল না।" ১৮৫৭ সালের জাগৃতির স্পৃহা এক্ষেত্রে কতটুকু দায়ী থেকেছে সে গবেষণা স্থানান্তরে হবে, এখানে এটুকু উল্লেখ বাঞ্ছনীয় যে, মঞ্চহীন দেশে 'গীতি প্রাধান্য ও ভক্তি প্রতিপাদক' সংস্কৃতির বৈষ্ণবতাকর্ষিত ভূমি যে নাট্যকর্মে স্ফূর্তি পেল তা নিছক অতীত চিন্তারই লালনকর্ম। মাইকেলের একক প্রয়াস কর্মে তা উজ্জ্বলিত। তৎপূর্বে দেশব্যাপী নাট্য-পালার অভিনয়রূপ সন্ধান করে শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়[১০] ডঃ সুশীল দে এবং মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান[১১] এক বিশেষ অভিনয় রসাবেশের সম্ভাবনারই ইঙ্গিত করেছেন মাত্র। ঐতিহাসিক সূত্রে তাদের উল্লেখ ব্যতীত অন্য গুরুত্ব আরোপন সেখানে বৃথা।[১২] তবু এই ইতিহাসটুকু উল্লেখ করে এই কথাটা বলা যায় যে ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে অভিনয় মাধ্যমের যে পরিবর্তন ঘটে, বিষয়, সংলাপ ও আঙ্গিকের যে 'বৈপ্লবিক' রূপান্তর ঘটে তার জন্য নব জাগ্রত কৌতুহলই দায়ী;

৯। মধুসদন সম্পর্কে রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের উচ্ছ্বাস স্মর্তব্য। কুলীন কুলসর্বস্ব (১৮৫৪) সম্পর্কে বিবিধার্থ সংগ্রহ (৩৫ খণ্ড দ্রঃ) যেখানে মন্তব্য করে "দৃশ্যকাব্যের অত্যল্পগুণ বর্তমান দেখা যায়" মধুসদনের প্রথম নাটক দেখেই কেন রাজা ঈশ্বরচন্দ্র বলে উঠেছিলেন The Drama is complete success, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

এখানে আর একটা কথা বলে রাখা প্রয়োজন মনে করি, কুলীন কুলসর্বস্ব অভিনয়গত কারণে ভদ্রার্জুনকে ম্লান করে থাকতে পারে কিন্তু নাট্যরচনার কৌশলের দিক থেকে তা পূর্ববর্তী নাটকগুলির চেয়ে মোটেই ওপরে নয়। (এ বিষয়ে ডঃ মনোমোহন ঘোষের আলোচনা আছে।)

১০। বাংলা সাহিত্য নাটকের ধারা, বৈদ্যনাথ শীল, গ্রন্থ পরিচয় পৃঃ ১৪—১৬ঃ 'হয়ত জনসমাজে গীতপ্রধান পালার অভিনয় চলিত, কিন্তু ইহাদের কোন স্থায়ী লিখিত রূপের সন্ধান মিলে না।...'

১১। ইতিবৃত্ত পৃঃ ৩৬০।

১২। "তবে নাটকের দু একটি সুপরিচিত লক্ষণ যে যাত্রা থেকে এসেছে সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই।" মনোমোহন ঘোষঃ পৃঃ ৮৮

মাইকেল, মনোমোহন ঘোষ, দীনবন্ধু এই নব নাটকের দেহ থেকে প্রহসনিক ইতরতা, সমাজ চিত্রোদ্দক ব্যঙ্গ প্রবণতা ও পৌরাণিক কাহিনী আশ্রিত ভক্তিরসের আপ্লুত গোঁয়োতার অপসারণ ঘটিয়ে নব নাটককে ক্রমে রঙ্গালয় মুখী করে তোলেন, প্রেক্ষাগৃহেরও পরিবর্তন ঘটান।

বাংলা নাটকের আঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরিক্ষা তখনই অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে।

কবিতা সমস্যাঃ প্রাচীনকাল ও আমরা

[১]

আমাদের সাহিত্যে আজ এক মহৎ সাধনার সূচনা ও যথার্থ রূপায়ণ ঘটেছে কবিতার ক্ষেত্রে। সাহিত্যের প্রত্যেক যুগ ইতিহাসে এইটাই স্বাভাবিক। তাই বলা চলে, যে কোন সাহিত্যে তার কবিতা-সমস্যা এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও চিরন্তন সমস্যা।

বাংলা সাহিত্যের জন্ম ইতিহাস খুব প্রাচীন নয়। তবু এর যত নাতিপ্রাচীনত্বের দাবী, তার মধ্যে যুগ-বিভাগটাও নেহাৎ কম নেই। কিন্তু বিশেষ লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে যে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক বিবর্তন ও সমস্যা প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় একই ভাগ্য টেনে এসেছে। যতদিন যতবার এর মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব বহিরাক্রমণ কিংবা স্বায়ত্বশাসনের আন্দোলন চলেছে, আজ পর্যন্ত তার একটা পুনরাবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায় এবং প্রতিবারই বাংগালী তাকে যে ভাবে গ্রহণ করেছে, তার মধ্যে একটা উদার ভাবই সাধারণঃ তাই নিজের মধ্যে তার প্রতিফলন নিঃসন্দেহে সুন্দর সুষ্ঠু—অসাধারণ—প্রগতিশীলও। তাই বলব, সে সব কবির বীর্যস্তুশক্তিমদবিলাস, তার বৈচিত্র্য কিংবা অনুশীলনের বিভিন্ন সত্তাবোধ আজকের দিনে আমাদের হাতে এক অমের সম্ভার দান করেছে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস খুব প্রাচীন না হলেও, তার এই ঐতিহ্যে এক বিরাট সম্ভাবনার ক্ষেত্র তৈরী হতে পারে।

ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে এটাই হচ্ছে আশার বাণী। কিন্তু সে সব যুগে কোন সমস্যাই সাহিত্যিকদের পোয়াতে হয় নি, একথা ঠিক নয়। বরং এটাই সত্য যে, সে যুগে সংকটকালেও তাঁরা সাহিত্য-সমস্যাকে রাজণ্যপ্রবণতা ও অতি উচ্ছ্বাসে এমন ভাবে রসবেত্তাদের কাছে তুলে ধরতেন যে, তাঁদের ঐ বিশেষ প্রকাশ রীতি থেকেই ভুল হওয়া স্বাভাবিক যে কোন নিজস্ব সত্তাকে বুঝি তাঁরা

প্রাধান্য দিতেন না, পলায়নী মনোবৃত্তিটাই মুখ্য থাকতো। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের কোন অতিক্রান্ত যুগেই সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে এমন কোন সাধ্যাতীত প্রশ্ন ছিল মনে হয় না, যা আজকের দিনের মত পাঠক রুচি ও মনন কীতিকে ব্যাহত করতে পেরেছে।

[২]

আমাদের জীবনে যুদ্ধের কথা বাদ দিলেও স্বাধীনোত্তর কালটা যত প্রধান ও সমস্যাবহুল, ততই পরিবর্তনশীল বা নিত্যবহ। এর জটিলতা আজ সাহিত্যাশ্রয়ী। এ যুগের এই বিপর্যয়ের ইতিহাস শিল্প-সৃষ্টির ক্ষেত্রে যে সংঘাতের সৃষ্টি করলো এ যুগের সাহিত্যে তাই হলো বিশেষত্ব। আজকের সাহিত্যিক চেতনা তাই চিরাচরিত প্রথার বিরোধী নয় কিন্তু স্বীকার ভিত্তিকও নয়। এই বিশিষ্টতাই এর মৌলিকত। এই মৌলিকতা প্রধান ভাবে বিস্তৃত আজকের কবিতায়। আজকের কবিতা শব্দ-উপমার, রূপকল্প বা প্রতীক ব্যবহারে এবং আংগিকে মৌলিক।

আজকের কবিতায় আরো বিশেষ কিছু লক্ষণ দেখা দিচ্ছে। মাইকেল থেকে বিহারীলালে যে নতুন পদক্ষেপ তাতে উভয়ের মধ্যেই একই শিক্ষা এবং একই ঐতিহ্যের অভাব না থাকলেও অনুশীলনের ক্ষেত্রে একই বিশেষত্বের দ্বিত্ববোধ আমরা লক্ষ্য করি। আজকের কাব্যশরীরে এই দ্বিত্ব লক্ষণ নেই, কিন্তু ক্ষেত্র হিসাবে অনুশীলন আজ ব্যাপক এবং বহু। এ এক নতুন ধরনের রেনেসাঁ। জীবনের ঐক্যধারার ভাংগন-ক্রিয়া আজ যতই অব্যাহত—ততই নতুন জিজ্ঞাসা এবং 'ছিন্নভিন্ন বিশ্বাসের বেদনায়' জীবন আজ আলোড়িত। আমাদের জীবনের ক্ষেত্রে এত বড় সংঘাত আর দেখা যায় নি। [সামগ্রিক ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ একজন বিরাট ভাস্কর; তবু সমস্যা হিসাবে যেন তাঁর পট-ভূমিই অনেক বিশাল ও গুরুত্বপূর্ণ এক বিরাট ও পরিণত অধ্যায়, এবং সংগে সংগে বাংলা সাহিত্যের সকল সমস্যার একক সংঘাত ছিল রবীন্দ্রনাথে। তাই একদিক থেকে মনে হয় রবীন্দ্রনাথ তাঁর অতুল শক্তি দিয়ে সেই সংঘাতকে এত সহজ করে দিয়ে গেছেন যে উত্তর-সাধকদের আজ কোন দায়িত্বই নেই।] তবু রবীন্দ্রনাথে কোথাও বা সর্বত্র যদি আমাদের অনেকের জটিলতাকে না

পাই, যদি তাঁকে আজ (সংকীর্ণ অর্থে) আমাদের জাতীয় জীবনের অধীত পুরুষরূপে প্রতিষ্ঠিত না দেখি—এটাই আমাদের আজকের যুগলক্ষণ ও ধারাকে বুঝতে চেষ্টা করবে। নিঃসন্দেহে সমস্যা ও তার গুরুত্বের দিক দিয়ে এরি মধ্যে আমরা একটা যুগকে অতিক্রম করে এসেছি এবং একটা 'যুগ-তফাৎ' এরও সৃষ্টি হয়েছে এই একটা যুগ থেকে অন্যযুগে আবর্তনকালে। কিন্তু দুই যুগের এই মৌলিক তফাৎটা এবং তার কারণটা স্পষ্ট হয়নি কোথাও—কেননা এটা হয়েছে বিপ্লবের মাধ্যমে; আজকের পাঠকরা তাই কবিদের এই নতুন প্রচেষ্টার অংশীদার হতে পারেন নি। তাই উভয়ের মধ্যে প্রীতি-সম্বন্ধের পরিবর্তে যে টাগ অব ওয়ার সৃষ্টি হয়েছে, তার পরিণতির কদর্য সম্ভাবনা আজ বাংলা সাহিত্যের সমস্ত পুণ্য আবহাওয়াকে এবং এত দিনের সমগ্র সাধনার প্রতিষ্ঠাকে যেন সামান্য করে তুলেছে।

কিন্তু বৌদ্ধ দোহা (চর্যাপদ) থেকে ইংরেজ আমলের যীশুস্তুতিকাল পর্যন্ত যে বিরাট কাব্যধারা ছিল একান্তভাবে সাধারণ মানুষের সম্পদ—উত্তরকালে তারই পরবর্তী ধারা একটা নতুন যুগের সূচনাতেই সাধারণ রসবেত্তাদের জীবনে সঞ্চারিত হতে পারল না—যোগসূত্র ক্ষীণ হয়ে গেল, একটা অশুভ ইংগিতে বাংলা কাব্যে এলো সংশয়ের দোলা; ঐতিহ্যশালী কার্যধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এ যুগের কবি প্রকৃতিতে এলো হতাশার প্রশ্ন—

এক বর্ষার বৃষ্টিতে যদি মুছে যায় নাম
কী তবে পেলাম, কী তবে হলাম।

[নরেশ গুহ]

[৩]

আজকের কাব্য সাহিত্য [ও তার প্রকৃতি] কে বিশ্লেষণ করে ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে এই নৈরাশ্যের একটা সমাধান ও তার গুরুত্ব নিরূপণের চেষ্টা করা উচিত। আমার মনে হয়, আধুনিক কবিতার সমস্যা ক্ষেত্রে এই লক্ষণগুলিকে যুগ-লক্ষণ বলা যায়। ইতিহাস নির্ভরতার প্রশ্ন তাই এখানে স্বাভাবিক। আজকের শিল্পীরা (দায়িত্বশীল শিল্পীরা) রবীন্দ্রনাথের আশ্রয় ত্যাগ করে এসে আজ

অনেকখানি নিঃসঙ্গ এবং একই কারণে কোথাও কোথাও 'স্বেচ্ছাচারী'। নানা-রকম ছন্দ নিয়ে আংগিক নিয়ে দুঃসাহসিক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে আধুনিক কবিতা আজ সমৃদ্ধশালী ; এদের বুদ্ধি-মুক্তি ও যুক্তিবাদ, প্রকৃতিবাদকে সরাসরি উপেক্ষা, Satirical দৃষ্টি ভংগী, মানবিকতাবাদ ও দেশকালের উর্ধ্বে বৃহত্তম দৃষ্টিভংগী প্রভৃতি যে সব লক্ষণে আধুনিক কবিতা গুণান্বিত হচ্ছে—তার সব কিছুর মূলে জীবন সম্বন্ধে নতুন জিজ্ঞাসা। কিন্তু মহৎ প্রতিভার অভাবে আজকের জীবনের জটিল গ্রন্থির উন্মোচনের কাজ অনেক পেছিয়ে গেছে—জীবন মন্থনে আজ কেবল দুর্বোধ্যতার গরলই উঠে এসেছে ; কিন্তু কবির নীলকণ্ঠ হলেও সাধারণ অংশীদারগণ অমৃত ভোগ লিপ্সু। অথচ আজকের কবিদের হাতে ক্ষমতা সীমাবদ্ধ—এটাই যুগ সন্ধিক্ষণের স্বাভাবিক লক্ষণ।

বর্তমান সাহিত্যের ক্ষেত্রে আজ এটা খুব স্পষ্ট মনে হয় যে, রবীন্দ্র প্রতিভার দ্বিতীয় জন্ম যত সুদূরসম্ভাবনা, তার অন্বেষায় অনেকের সমগ্রসৃষ্টিতে একক দর্শন তত নিশ্চিত সম্ভবা। এটা ইতিহাসে এমন কোন উল্লেখযোগ্য সংযোজন নয় বা অভিনব বস্তুও নয়—এটা ইতিহাসেরই একটা অনন্ত-পুনরাবৃত্তি। ইতিহাস এ কথা পরিষ্কার করেই বলে যে, গণজীবনের ভূমিকায় একক চিন্তানায়কের ক্ষেত্র বিচরণ অল্পই সম্ভব (যদিও এইসব মনীষীর কালে সাধারণ মানুষ একটু স্বস্তি পেয়েছে মাত্র), কিন্তু বহু নায়কত্ব ; কি ইতিহাসে, কি রাজনীতিতে বা দর্শনে কিংবা সাহিত্যক্ষেত্রে স্বীকৃতি পায় নি কিংবা স্বর্ণযুগগুলির চেয়ে সেইসব মধ্যবর্তী যুগগুলির ন্যূন মর্যাদায় মানুষ পীড়ন বোধ করেছে এমন বলার কোন যুক্তি সংগত কারণ নেই। কেন না, সম্ভব কীর্তির চেয়ে সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতি আশাবাদী মানুষের জীবনে অনেক কল্যাণকর। পুরাকালে এশিরীয়গন (Assyrians) তরবারির চেয়ে দরবারী সাহিত্যের গুণ-বিশেষত্ব স্বীকার করতো না ; কিন্তু ব্যাবিলনের ঐশ্বর্যের চেয়ে তার সাহিত্য সম্ভাবনা—সেই কৃষ্টিসহ জাতির জাগ্রত চেতনাই ছিল তাদের ঈর্ষার বস্তু ; অসুরবাণীপলের একক সাধনার ঐতিহ্য তাই এই সেমেটিক গোষ্ঠীর কাছে ছিল অভিনব এবং স্বপ্ন ফসল। তেমনি হিব্রুজগতের সুলেমানের সম্ভাবনার চেয়ে ডেভিডের কাব্যসৃষ্টির প্রয়াসই নিঃসন্দেহে যুগ-প্রসূ। গ্রীক, রোমান ইতিহাসে এই আদর্শের একটা নতুন দিক পাওয়া যায়। তাই দেখি, মারাথন যুদ্ধোত্তর শিল্পক্ষেত্রে কিংবা কার্থেজ ধ্বংসোত্তর ইতালী একত্রায়ণযুগ—এক দিকে সোফিক্লিস

য়ুরিপিদে কিংবা ইসকাইলাস—অরিসটেফনে; অন্যদিকে শূলা, ভারজিল, ইবিদ, লাইভি—যে যুগ সম্ভাবনা সৃষ্টি করে গিয়েছিলেন হোমারের একক যুগ কিংবা পেত্রার্কের একক গুরুদেবীর চেয়ে তাঁদের ক্ষেত্র চয়ন বা সামগ্রিক শক্তির একত্রনিবেশ বহুলাংশে শ্রেষ্ঠ। ফরাসী বিপ্লবোত্তর বা আধুনিক ইউরোপীয়গণ সাহিত্যেও তার আভাস সুস্পষ্ট—সে কথা মিথ্যা নয়। বাংলা সাহিত্যের উত্তর সাধকদের আজ এমনি এক সমষ্টি-সৃষ্টির ইতিহাস গড়ে উঠেছে—তাকে বিশ্লেষণ করলে আমরাও এক যুগপ্রসূতির গন্ধ পাবো।

সমষ্টি বা গোষ্ঠীগত চিন্তা ও শিল্প প্রচেষ্টাই হচ্ছে যুগসন্ধিক্ষণের চরিত্র। কিন্তু এই সন্ধি-যুগের বিশেষ তাৎপর্য এই যে, অতিক্রান্ত বা অতিক্রান্ত-প্রায় যুগের শিল্পমানসের ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া ঘটাতেই সে উৎসুক। কারণ, এই নবযুগ রচনার ভার এই সমষ্টিচেষ্টার ওপর নির্ভর করে বলেই হয়ত একটি বিশেষ যুগমানস সৃষ্টি বা তাকে গ্রহণ সে করতে চায় না। সে চায় গতানুগতিকের একটি ব্যতিক্রম, সৃষ্টিকে ইতস্ততঃ খুঁজে বেড়াতে এবং এখান থেকেই শুরু হয় বিপরীত দিক থেকে ব্যক্তি-শক্তি বিশেষে তীব্র বা রংগীন আলোকপাত। তবে এই পরিবর্তন অংগিকের ক্ষেত্রেই স্পষ্টতর। মধ্যযুগের পারস্য সাহিত্যকে এর একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হিসাবে নেওয়া যেতে পারে। কাদেশীয় যুদ্ধোত্তরকালে পারসিকদের জীবনে নতুন সংঘাত এলেও সাহিত্যের আংগিকে বৈচিত্র্য ঘটলো কেবলমাত্র রাজহিক মাত্রায়। সেই যুগে এলো প্রতিপাল্যগণের অতিমাত্রায় রাজভক্তি—পারসী সাহিত্য হয়ে উঠলো জনগণমন বিচ্যুত অধিনায়ক-সভা-সাহিত্য, বিকৃত অর্থে আরবী সাহিত্য। পরবর্তী শতক এর সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। সম্পূর্ণভাবে আরবী শব্দ বর্জন করে এবার গড়ে উঠলো বিশুদ্ধ পারসী সাহিত্য। কিন্তু জামীর যুগে আবার এলো প্রতিক্রিয়া। আরবী-পার্সীর সংমিশ্রণে এবারে এক নতুন আংগিকের রচনা হলো। 'এই ঘাত প্রতিঘাতের ভিতর দিয়েই সমাজ সংস্কৃতি সব এগিয়ে চলে এবং ধীরে ধীরে যুগ প্রকৃতির স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়।' (বিনয় ঘোষ)

বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে নতুন আংগিকের সূচনা মাইকেলের থেকে; কিন্তু এই নতুন ছন্দ প্রয়োগ সে যুগের সাহিত্য সৃষ্টির ইতিহাসে অলৌকিক ঘটনা হলেও মাইকেল তাঁর অনুসারীদের বেশীদূর আকর্ষণ করতে পারেন নি। হেম-নবীনের

পরবর্তী কালটা তাই সন্ধানী যুগ। রবীন্দ্রনাথ তার অন্বিষ্ট। কিন্তু সমস্যা সেখানেই শেষ হয় নি ; রবীন্দ্রনাথকে এড়াবার মত পাপ-প্রশ্নও একদিন মনে আমল দিতে হলো।

কিন্তু পথ ? এড়াবার মত পথ দেখেছিলেন নজরুল। কিন্তু সে পথ চিরন্তন ছিল না বলেই হতভাগ্য মাইকেলের মতো মিশে গেলেন তিনি। তারপর নিঃসঙ্গ যাত্রার পালা। সামনে কেবল সংঘাত ঃ সমস্যার সেই স্তূপের ওপর বিভা:-গোত্তর কালের সংঘাতটা একটা অত্যন্ত জটিল যোগ মাত্র (জীবন সমস্যার সংগে এও ভুললে চলবে না, বহু কবি উদ্বাস্তু হয়ে পড়েছিলেন সাংস্কৃতিক-কেন্দ্র থেকে। উৎখাত হয়ে পড়ায় এবং সংস্কৃতিবান ও সুশিক্ষিত শিক্ষক এবং অন্যান্য বিভাগীয় পরিচালকগণের অভাবে জাতীয় জীবন-যাত্রার মানে হঠাৎ প্রচণ্ড একটা নৈতিক আঘাত পড়েছিল···ইত্যাদি)।

[৪]

জীবনের প্রশ্ন আজ অনেক বড় হয়েছে ; কিন্তু এ সত্য যে, ঐতিহাসিক বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্য কোন কালের শিল্পকার্য ব্যাহত হয় না। সংঘাত তো প্রতি-সংঘাতেরই জন্য আর সেইতো সাহিত্যের প্রাণ। তাই আধুনিক চীন কিংবা রুশ সাহিত্য, শোনের কাব্য কিংবা সুদূরের নেরুদার গান যখন ঝড়ের সাথে করতালী দিয়ে বাজে, ইতিহাসের গতি প্রকৃতিটা আমরা চিনি এবং জানি বলে আজ আমরা তাতে বিস্ময় প্রকাশ করি না। জনডিউঈ কাল´ ফসলে কিংবা হুইট্‌ম্যানোত্তর আমেরিকান সাহিত্য ইতিহাসের এই প্রবাহমানতারই একটা স্বীকার মাত্র। কালের যাত্রার পথে Waste Land-এর প্রয়োজন হয় বাঁকে বাঁকে, মোড়ের জন্য ; সেখানে আবাদ হবে না বলে যে নৈরাশ্য দেখা যায়, সেখানেই অডেন-ডেলুই স্পেণ্ডারের সবুজ প্রাণের আশ্চর্য বিকাশ হতেও দেখা যায়। আর এঁদের সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় সত্যটাই এই যে—

"They came like a breath of fresh air after a generation of self love and self disgust of determination and frustration,"

আমাদের 'পোড়ো জমিতে'ও এমনিভাবে নানা ফসলের আবাদ ও তার পরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে। পূর্ব পাকিস্তানের কবিদের বিশেষ সত্তার স্বভাব বৃহত্তম সামাজিক পরিধি আজো হয়ে ওঠেনি সত্য, কিন্তু এর আছে বৈচিত্র্যের দুঃসাহসিক অভিযান। এদের নতুন জীবনবাদ ও মননের পরিচর্যা এদেরকে একান্তভাবে বুদ্ধি-নির্ভর ও প্রতীকবাদী করে তুলেছে। কিন্তু ইতিহাস কালের ধারক এবং বাহক দুই-ই। আজকের দিনের সেই কাব্যবক্তব্য সেই হতাশাকেই মুছে দিতে চায়।

আধুনিক কাব্যে আঙ্গিক ও "উচ্চারণ" প্রসঙ্গ

'Forgive him ladies
for he is a scholar from nottingham'

১· উচ্চারণ সম্পর্কে যত না আলোচনা করেছে, উচ্চারণের পটভূমি অর্থাৎ একটি বিশেষ কাব্যরীতির স্ফুরনের সম্ভাবনার ইতিহাসকে অনুসন্ধান করতে চেয়েছি তারও বেশী। কিন্তু রীতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে দেখেছি কাব্যান্দোলনের বিভিন্ন পর্যায় কবিদের বিশেষ বিশেষ আত্মজাগরণের উপাদান জুগিয়েছে যা নব নব কাব্যরীতির উদ্ভাবনে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ধরা পড়েছে এবং যেহেতু একটা প্রতিক্রিয়া অতএব এর আন্তরিকতায় সন্দেহ জাগে না, কিন্তু সমাজ একে গ্রহণ-বর্জণের পক্ষে স্বীকৃতি দিয়েছে অর্থাৎ, কখনো সরাসরি বর্জ্জন করেছে, কখনো পারিত্যক্ত আন্দলন ধারার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা দিয়েছে।

২· ডানের মধ্যে Metaphysical কাব্যগুণের অস্তিত্ব আবিকার করিয়ে দিয়ে যিনি সরে গেলেন তিনি লক্ষ্যও করলেন না যে, সে ধারা একসময় পরিত্যক্ত হয়ে আবার জটিলতর জনমানসচিত্তে তার প্রভাব স্থায়ীরূপে ধরা পড়েছে; কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হয় যে, সমাজের প্রতিক্রিয়াই আন্দোলন, কবির উদ্ভাবনী তার যোগান মাত্র। এই যোগান সামাজিক প্রতিক্রিয়া জন্মাবার আগেও সম্ভব হয়ে উঠতে পারে, পরেও।

৩· এই কাব্যান্দোলন কি কাব্যরীতির ওপর প্রভাব আনে? অনেকের সংগে এক মত না হয়ে আমি বলতে চাই, না। কাব্যরীতির পরিবর্তন কাব্যান্দোলন কিনা বলা শক্ত, কিন্তু আমার মনে হয়েছে কাব্যান্দোলনই কাব্য-রীতির র্তন নয়। প্রত্যেক কবির কাব্যরচনারীতি ভিন্ন, তাই-বলে প্রত্যেক কবিই কাব্যান্দোলন সম্ভব করে তোলেন নি। সোনার তরীর কবিও না, যদিও

বলাকার কবি সীমিত ভাবে এবং পুণশ্চের কবি সম্পূর্ণত কাব্যান্দোলনের ব্যাখ্যাতা এবং স্থপতিও।

৪. পরিশেষে এ আলোচনার সমস্ত সীমাবদ্ধতা সত্বে যে প্রশ্ন ভিত্তিতে এ আলোচনার দৈর্ঘ যুক্তির ডাঙ্গা পায়, তা' একটা বৈজ্ঞানিক সমীকরণের প্রস্তাব মাত্র। কাব্যান্দোলনেই কাব্যান্দোলনের সার্থকতা না তারও 'দর্পন' নির্মাণও প্রয়োজন এই কথাটিও সংগে সংগে অনুধাবন যোগ্য।

উচ্চারণ—১

All the earth and air
with thy voice is loud.

সহস সচকিত প্রকাশের পর উচ্চারণ তাঁর সম্প্রতি (জুলাই '৬৮) কবিকর্ম। কবি সৈয়দ আলী আহসান এতে মূলবক্তব্য প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত রচনাসহ ৮৩টি বিভিন্ন উচ্চারণকে প্রকাশ করেছেন। ক্ষুদ্রতম ৭টি লাইনের একটি বা বহুভগ্ন উক্তির 'একক' প্রকাশরূপ যেমন সুলভ, পৃষ্ঠাধিক চরণে (গদ্য, পদ্য, উভয়ের) বাণীরূপও তেমনি সুদুর্লভ নয় এ গ্রন্থে।

উচ্চারণ পাঠ করে মনে হবে কখনো বা একাধিক বোধন বিভিন্ন উচ্চারণকে স্পষ্ট করেছে, আবার কখনো বিভিন্ন উচ্চারণ একই বোধণের কেন্দ্রকে আলোড়িত করেছে। অর্থাৎ, একই কথ হয়ত দুবার দুভাবে বল হলো, আবার এক বিষয়েই হয়ত অনেক বলা হলো। তেমনি কেবল ভাবরূপের গৌরব বিধানের হেতু কবিকর্মে (আঙ্গিকে) সামান্য জটিলতাও আরোপ করা হয়েছে কোথাও কোথাও। এই ভাবেই একটা কবিতাই বিবিধ ভঙ্গীতে রচিত হয়ে মূল বক্তব্যের দিকে সহজতর ভাবে এগিয়ে এসেছে কিংবা বিষয় চরণের সমৃদ্ধি মূলক চিন্তার নানাবিধ ব্যঞ্জনার কারুকর্ম এসে জড়িয়ে গেছে। একটা পূর্ণতর বৃত্ত নির্মিত হয়েছে এইভাবে।

ভূমিকার কবি বলেছেন যে, কবির তো সম্বল বলে কিছু নেই, কিছু থাকতেও

পারেন না, প্রতিদিনের সূর্য আর অন্ধকারে কি এমন সম্ভাবনা যার জন্য কবির দীর্ঘ প্রতীক্ষা অমূল্য হয়ে ওঠে? কবির যা কিছু সঞ্চয় তাতো ঐ 'পিঙ্গল মৃত্তিকায় নেমে আসা কুয়াশা'র ফুলঃ হয়ত তাকেই বলি কণ্ঠবাণী অথবা উচ্চারণ—'এখানে প্রতিদিন এটুকুই আমার সম্বল।'

উচ্চারণের এই সম্মোহবৃত্তি খুঁজে খুঁজে কবি দেখলেন,

'অনেক অতীত থেকে প্রবাহিত যে সমীর
আনন্দহীন বেদনাহীন সচলতায়

শুধুমাত্র মোহময় আর্তস্বরের
অস্পষ্ট কলরোলে
আমার সকল উচ্চারণকে ভাসিয়ে নিলো।'...

তাকেই ফিরিয়ে আনার সাধনা করেছেন কবি, কারণ সেইটুকুই তো কবির আনন্দ। আর,

যখন কোন আনন্দই থাকলো না
যখন প্রেমের কথাগুলোও
শিশিরের মতো ঝরে ঝরে
প্রথম রৌদ্রের দৃষ্টি ছুঁয়ে নিঃশেষ হল,

কবি তখনই নিঃস্ব।

অবশ্য এ কথা সত্য যে এই শব্দ 'বৃক্ষপত্রের' মত 'সময়ের প্রান্তরে প্রত্যহ ঝরে পড়ছে'. কিন্তু তাই বলে তো তার উৎসকে রসরিক্ত হয়ে পড়লে চলবে না। কথাই তো অমৃত আর অমৃতস্য পুত্রাঃর সকল সম্ভাবনার শীর্ষে অথবা অন্তে অনবরত কথা বলার আনন্দেই তো 'তোমার কাছে' 'আমার' মহিমা। সৃষ্টির মূলে ধ্বনিরই উচ্চারণ; সত্ত্বঃ রজঃ তমঃ ত্রিগুণান্ত সৃষ্টি তো উচ্চারণের মহিমারই নিবিষ্ট।

তাইতো নিঃশোষিত শব্দ মেঘলায়,
অন্তিমের দিকে সমান্তরাল পথ যাত্রায়
তুমি আমার অনবরত
কথা বলার আনন্দ।

কবির এই অবিনাশ চিন্তা নেতিবাচক রূপেও ধরা পড়েছে। যেমন, 'নিস্তরঙ্গ শব্দহীনতাও সর্বকাল বেঁচে থাকে'। এই বোধন থেকে এই বাণীরূপ এসেছে ঃ "যে শব্দ উচ্চারিত হয়েছিলো, ও শব্দ উচ্চারিত হল এবং যে শব্দ উচ্চারিত হবে সবই যেন একই অনিঃশেষ কলকণ্ঠের বন্যাধারা।"

এউক্তি Paradoxical কিনা সে তর্ক ভিন্ন। আপাত বিরোধিতা আসলে একটা সত্যকেই এখানে প্রোথিত করেছে। আবার কেবল গন্ধ ভঙ্গীটি থাকার ফলেই তার আবেদন হয়েছে নেতিরূপা।

কিন্তু এ আলেখ্য বক্তব্যের গভীরে সরাসরি চিন্তাকে প্রবেশ করায় না। বরং পৃঃ ৭ এ এসে কবি যখন আপনার আনন্দ হওয়ার কারণেই চুর্ণ চুর্ণ শব্দগুলি আহরণ করেন এবং শব্দকণাগুলি ছড়িয়ে দেওয়ার বিপুল ক্ষেত্রকে উপলব্ধি করেন তখন কবি তাঁর প্রথম কবিতার কান্নাকেই যেন প্রায় স্পর্শ করেন। বক্তব্যকে একটা কেন্দ্রে এনে উপস্থিত করেন এবং কেবল অনুভবই তখন একমাত্র দিকযন্ত্র হয় না, পরিবেশ এবং অভিজ্ঞতার বাস্তব চেতনাও জীবন দর্শনের গ্লানিময় পরিণতিকে প্রকট করে তোলে। কবি তখন তাঁর কণ্ঠ নিস্থত শব্দের ব্যবহারিক মূল্যকে যাচাই করার এক পূর্ণ অবকাশ এবং ক্ষেত্র লাভ করেন।

যুগের প্রেক্ষিৎ বা সময়ের বাস্তবতার উচ্চারণের তৃতীয় রূপ আবিষ্কার করেন কবি ভিন্নতর প্রশ্নে। উচ্চারণ তো বাতাসে শুয়ে থাকে, তাকে কি কেবল শ্রুতিগোচর মাধ্যম হিসাবেই গ্রহণ করতে হবে—তার এই সীমালক্ষণ কি সম্ভব নয়? ২৩নং কবিতায় তার উপলব্ধি আছে।

কিন্তু উচ্চারণ ব্যবহারের মাত্রা কি? কবি তাও ভেবেছেন, যারা সময়ের আলোকে অবিমৃষ্যকারী হঠকারী বিশেষ, এ উচ্চারণের কুহু বেদনার ইতিহাস তাদের কাছে অবলুপ্ত ঃ 'বায়সের আর্তনাদের মতো তাদের সমস্ত উচ্চারণ বাতাসে হারিয়ে যাবে।' (পৃঃ ৩৭)

তাহলে 'উচ্চারণ' একটি তত্ত্বে পরিণত হলো ক্রমে ক্রমে। মাত্রাভেদে এ তত্ত্বের মূল্যভেদ নির্ণয় করেছেন কবি। যা কিছু শ্রব্য, দৃশ্য অথবা ইন্দ্রিয়বোধ্য,

উচ্চারণের গতি তার সব কিছুই ভেদ করে বিশেষ এক সত্যের আলোকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনতে পারে। আবার এমনও সত্য আছে যা আছে বলে প্রমাণ করা যায় না—তাকে কখনও বুদ্ধিতে নির্মাণ করতে হয় অথবা কখনো কেবল উপলব্ধির দ্যুতিতে অনুসরণ করে স্মৃতির কুয়াশা নদীতে ঘুমের আঘ্রাণে ইন্দ্রিয়ের অবসাদে আপনা থেকে নিতে হয়। উচ্চারণ তো সেখানেও এক মিনার। দেখুন—

'কখন যে চড়ুইগুলি এসে কলরব করে চলে যায় জানি না, আম গাছের নতুন পাতাগুলি দেখতে চেয়েও দেখা হয় না। শুধু যখন পাতায় শব্দ করে কাঠ বিড়ালী গাছ বেয়ে ওঠে এবং একটি কাক হঠাৎ আর্তনাদ করে তখন মনে হয় আনন্দের সঞ্চয়গুলি বুঝি হারিয়ে গেল।'

অথবা—'বিপুল পৃথিবীর জন্য কবিতাটি' (পৃঃ ৬৩)

অথবা, পৃঃ ৭৩ঃ

'হঠাৎ অরণ্যের কপাট খুললো
বিপুল অরণ্যের একটি প্রজাপতি
আমাকে ঢেকে ফেললো
এবং আমি যেন তখন ঘাসের একটি পাতা।'...

'শব্দ উচ্চারণের চেষ্টায় আমি যে
আগুন জ্বালিয়েছি
সে আগুনের তাপে আমি হীরক খণ্ড হলাম
কিন্তু আকাশের তারা হতে পারলাম না।'

এমন কি কামায়ণভাস্কেও নারীর চিত্র সংলাপের আধারে অত্যন্ত তীর্যকভঙ্গীর এক ভাস্বর চিত্র হয়ে ওঠে (পৃঃ ৭৭)।

উচ্চারণ গ্রন্থে উচ্চারণের বিভিন্ন মাত্রা (dimension) আবিষ্কারে কবির খেয়াল মাত্র নয়, গণিতের ছকও নয়, কিছু তার উপলব্ধির নির্মিতি, কিছু বা আনন্দের উৎস সন্ধানে বুদ্ধিময় অভিযাত্রা। ফলতঃ, এই উচ্চারণের ক্রিয়া প্রেমে, কর্মে এবং মৃত্যুতে ত্রিবিধক্ষেত্রে উপলব্ধির বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েছে। বিশেষতঃ প্রেমের ক্ষেত্রে তা অত্যন্ত হাহাকারময় এবং কর্মে ও জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে তা এক দার্শনিক ঔদাসিন্যে ধরা পড়েছে বলে মনে হয়। আবার মৃত্যুতে তা সর্বদা

অস্বীকৃতি বা নেতি ধর্মের আশ্রয়ী, অর্থাৎ কবি নিঃসন্দেহে অস্তিবাচকতার প্রার্থী হয়েছেন (কবির ভূমিকা দ্রষ্টব্য) সময়ের পদঘাতে এবং মৃত্যুর পথ যাত্রার অবক্ষয়ের নিশ্চিত রূপে নিজেকে তো তিনি সেখানে অভিসারী করে তোলেন। কেবল পৃঃ ৭১-এর শেষ চরণে 'হঠাৎ অবাক হয়ে দেখি—হৃদয় সরিয়ে আমরা দুজন পাথরের প্রতিভাস মাত্র।' – এর ব্যাখ্যা দুরূহ হয়ে ওঠে। কেননা তখন উচ্চারণকে আরো একটি মাত্রা (dimension অর্থে) সংযুক্ত করে দেখতে হয় এবং তা প্রকৃতির পরিবেশে ; - তখন সৈয়দ আলী আহসান Wordsworth না হয়েও যেন বলেন, 'tongues in trees, books in the running brooks, sermons in stones and good in eveny thing.'

কিন্তু এও কি বিশ্বাস্য ?

উচ্চারণের এই চতুর্মাত্রিক বিন্যাস দার্শনিক পটভূমির অতিরিক্ত অন্যবিধ ক্ষেত্রেও একই সত্যকেই পুনর্নির্মাণ করেছে। আবার একই সত্যের পুনর্নির্মাণে পটভূমিকে কয়েকটি জটিলতর স্তরে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

আমাদের আলোচনার এ পর্যায়ে উচ্চারণের বক্তব্যে যে সমস্যা তা অধীতজ্ঞান প্রসূত এবং কবি মানসের মৌলরূপের বিভিন্ন উপাদান মিশ্রণজাত। উচ্চারণের কবি কেবল 'সহসা সচকিত' কবি-বোধে অনির্ণেয় কবি-সমস্যার সমাধানের দার্শনিক নন, তাঁর সম্পর্কে এ সত্যগুলো স্মরণ রাখা উচিত ;

১. কবিতার কলাকৌশল সম্পর্কে তাঁর সমকালে তাঁর চেয়ে অধিক কেউ ভাবেন নি, তথা আহরণও করেন নি, প্রয়োগ কৌশলও আয়ত্ত করেন নি ;

২. বিভাগ পূর্ব ও বিভাগ পরবর্তী কালের সকল কাব্যান্দোলনের শাখার প্রথম ও প্রধান নেতা ছিলেন তিনি (উদাহরণতঃ (১) নো-আন্দোলন, (২) প্রাচীন কাব্য ও লোকগাথা অবলম্বনে কাব্য রচনার ধারা, ও (৩) ইসলামী রোমান্স অবলম্বনে কাব্যধারা সৃষ্টি, (৪) বুদ্ধি বাদী আন্দোলন ও কাব্যের আঙ্গিকের পরবর্তী পরিবর্তন চিন্তা প্রভৃতি।)

৩. পূর্ব পাকিস্তানী কবিদের মধ্যে আন্তর্জাতিক কবি খ্যাতি লাভ ও

আন্তর্জাতিক কবিদের সংগে অন্তরঙ্গতা লাভের সুযোগলাভও তাদের কাব্যান্দোলনের সংগে যুক্ত হওয়া প্রভৃতি কারণে কবিতা সম্পর্কে অধিক ভাবার অধিকার তিনি পেয়েছেন।

৪· মানসিকতার দিক থেকেও তিনি অত্যন্ত জাগ্রত, কাব্য উপাদান প্রয়োগ সচেতন, বুদ্ধিধর্ম, আবেগ ও যুক্তির মিশ্রণ সম্ভাবনায় বিশ্বাসী এবং অন্যের প্রভাব এড়াবার ক্ষমতায় অধিকারী (যেমন তিনি সমকালীন কোন জনপ্রিয় কবিরই অনুকারী নন—ফররুখ আহমদেরও নন ; ফররুখ আহমদ ও আলোচ্য কবি ১৯৪২/৪৩-এর কাব্যান্দোলনে সতীর্থ ছিলেন বিধায় এ রূপ চিন্তা অনেক সমালোচকের মনে ঠাঁই পেয়েছে।)

৫· কবিতার বিষয় আহরণে উপমারূপকের আশ্রয়ে একটি অখণ্ড প্রবাহকে নির্মাণ করে সেই আলোকে সমগ্র কাব্যকে আধুনিক প্রকাশ দান করার ক্ষমতায় সম্ভবতঃ আলী আহসান একক এবং অভূতপূর্ব।

তাঁর অনেক আকাশ (১৯৫৬) এবং একক সন্ধ্যায় বসন্ত (১৯৬১) পার হয়েই তিনি উচ্চারণের গভীরে ও বিস্তারে অবতরণ করেছেন। উক্ত গ্রন্থ দুটির প্রধান বৈশিষ্ট্যই হলো বৈদেশিক কাব্য আলোড়নকে * বাংলা দেশের জানালা খুলে দেখা, এবং কখনো কখনো গৃহমধ্যে তাকে তীব্রভাবে অনুপ্রবেশের প্রশ্রয় দেওয়াও। বিশেষ ত্রিতরঙ্গাদর্শী (moves) কবিতাগুলি তাঁর সম্পূর্ণ সকৃতিত্ব আমদানী (কাজী নজরুল ব্যতীত বাংলা সাহিত্য এহেন কাব্যরীতির পরীক্ষা দুর্লভ)ঃ 'আমার পূর্ব বাংলা' নজরুলের 'সিন্ধুর' মতই আরোহণ অবরোহণ ও অনুসরণ এই তিনটি ভাব তরঙ্গের সংকোচন, প্রসারণ ও বিভক্তির প্রয়াসে এক বিখ্যাত সৃষ্টি। এ কবিতা লারকা, স্পেণ্ডার, সিলোনী প্রভৃতি কবিদের ব্যক্তিগত সংসর্গে আসার ফল।

উচ্চারণে সেই আকাশকে স্পর্শ করেছেন কবি কিন্তু মৃত ধারার আলোড়নকে বা তার শেষ শিহরণকে অনুভব করে। উচ্চারণের একটি বিশেষ ধারার কবিতা তাই অতিরূপাত্মক বা Metaphysical poetry-র আদর্শে লিখিত। পৃঃ ৪০ ; ৮২। অধীতজ্ঞান প্রসূত সমস্যাদি এ কাব্যের আঙ্গিককে যত গুণিত করেছে, বিষয়কে

* সহসা সচকিত গ্রন্থে বৈষ্ণব কাব্যের রসধারার পুনঃকল্পনা স্পষ্ট।

তত সমৃদ্ধ করে না। এর একটা কারণ হয়ত এই যে বাংলা কবিতার বিষয় এই নির্দিষ্ট জ্ঞানকে, প্রকাশক্ষম কারণকে, ধারণ করে নি আজো। ফলে উদ্ভটত্ব এবং চিত্রকরদের রঙিন জমিতে অন্ধকার নির্মাণের কুইক্সটিক কসরৎ-এর মত প্রতিভাসিত হয় যদিও আলী আহসানের ভাষার ভারসাম্য বোধই এবং উপমা ও চিত্ররূপ নির্মাণের নিজস্ব প্রক্রিয়াটির কারণে আত্মঘাতী অপবাদ পেতে হয় নি তাঁকে।

ঠিক সে মুহূর্তে তোমাকে
আর কখনও শব্দে
চোখের পলক ফেলায়
ঘাসের মধ্যে দুজনের পায়ের সাড়ায়,
পেলাম না।

এখানে Metaphysical স্পর্শতা দূয়াভাসিত; এবং তার পেছনে ভাষাবয়ণের ও শব্দ সাজানোর চাতুর্যও তো অব্যক্ত নয়। দ্বিতীয়তঃ, এই অবদেহী রূপ-কল্পনা না-রূপী বা নেতী ধর্মী চিত্ররূপে বিবৃত—(লক্ষ্য করুন এ কবিতার শেষ চরণে কবি আস্তিকাবাদী) বিজ্ঞান প্রয়োগে অযথারূপচিত্র এখানে নেই, কিন্তু সেই ব্যবহৃত 'মুহূর্ত' আর যদি কখনো না ফেরে তবে তার বেদনা কি কেবল মাত্র হৃদয়ের জ্বালা হয়ে থাকবে, যুগটাকে নির্মম ভাবতে বাধ্য করবে না?

অথবা—'একটি নির্ভরতায় তখন
আমার সৌন্দর্যের সকল কথা
তোমার দেহের দেয়ালে
চিরদিন ছবি আঁকে।।

এর চরম উদাহরণঃ

এর পর তুমি যখন
আমার সন্ধান করবে
তখন আমার কবরের মধ্যে
মাথা রাখবার জন্য
একটি শুকনো হাড় পাবে,
যা একদিন আমার বাহু ছিল।

অধীত জ্ঞানের সর্বচিন্ততা কবি আলী আহসান কৌশলে এড়িয়ে নব নির্মিতির দ্বার অনুসন্ধান করেছেন। অবদেহীতত্বমূলক রচনাগুলিতে বিষয়গত বৈচিত্র তেমন নেই। কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ের কবিতাগুলি তিনটি বিষয়ের ক্রমে শীর্ষ এবং ভূমির (pv) তরঙ্গ নির্মাণ করেছে (১) প্রেম ও রমনী (২) স্মৃতি ও জাগৃতি (৩) অস্তিত্ব ও আত্মচেতনা (৪) অভিজ্ঞতা ও দর্শন (৫) এবং বিবিধ। প্রতিটি বিভাগের রচনাগুলি স্বতন্ত্র আকারেই যে পূর্ব ধারণাবশতঃ লিখিত তা মোটেই নয়— স্বাভাবিক গতিতেই তা স্বাতোৎসারিত। আমাদের পূর্বধৃত আলোচনার প্রেক্ষিতেই এই শ্রেনীভাগের মূল সমস্যাগুলিকে ধরতে হবে। তবেই বোঝা যাবে যে সৈয়দ আলী আহসান এতদিন যাবৎ কেবল রূপকর্ম ও ভাবানুষঙ্গের প্রবাহকে নিয়ে কাব্যতরঙ্গ এবং প্রতীক প্রবাহ সৃষ্টি করেই নিঃশেষিত হতে চান নি, তার সৃষ্টি ক্ষমতা আরো অন্যতর সম্ভাবনাকেও আগ্রহী আলিঙ্গন জানাতে চায়। Pro-sui ও Ensui তত্ত্বের মত অস্তিত্বের পূর্বচিন্তা পরবর্তি সজীব অস্তিত্বের ধারাকে এখন নির্মাণ করছে; উচ্চারণের কবিতাগুলির শ্রেণীকরণ থেকে তার দার্শনিক ভিত্তির সাবিক আলোচনার কেন্দ্র বিন্দুটি পর্যন্ত এগিয়ে গেলে এ বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না।

উচ্চারণ – ২

I am moved by fancies that are cured
Around these images and cling. (Eliot)

প্রশ্ন উঠবে উচ্চারণ কি কাব্য? অথবা এর এই অভিনবত্ব বাংলা সাহিত্যে কতদূর গ্রাহ্য? অথবা একে কাব্য হিসাবে গ্রহণ করার ভিত্তি কি?

লরেন্সের পেঙ্গুইন সংস্করণ প্রকাশের পর সাহিত্য বনাম নৈতিকতা প্রশ্নটি যখন খুব রোচক হয়ে ওঠে তখন কোন এক আইনজ্ঞ ধর্মপণ্ডিত বিচারালয়ে সাক্ষ্যদান কালে যে উক্তি করেন এখানে তার পুনরুক্তি করছি। তিনি বলেন, Sex-এর পুনর্মূল্যায়ণ প্রশ্নটি একটি অত্যন্ত জরুরী বিষয় এবং কোন বর্তমান লেখক যে অন্ধভাবে Chirstian Valuation of six-কে চিরস্থায়ী মূল্যবোধে আটকে থাকবে এটা বর্তমান সাহিত্যের জন্য মোটেই স্বাস্থ্যপ্রদ নয়।

উলউইচের বিশপের মত সুনীতিবোধ ও কাণ্ডজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি যখন এরূপ

ভাষণ উচ্চারণ করেন, তখন একথা ভাবতেই হয় যে মানুষের উদ্ভাবনী শক্তির সীমাকে রোধ করে কোন ক্রমেই সমাজে নিষ্পাপ থাকা চলে না। এই শক্তির প্রেরণা কিংবা তার উৎস কেবল শিল্পগত কারণেই নয় ব্যক্তি তথা সমাজ উজ্জীবনের প্রশ্নের সংগে জড়িত বলে মহৎমূল্যে নির্ণীত হওয়াই বিধেয়।

সাহিত্যে এই 'উজ্জীবন' কেন এবং কি ভাবে আসে তার সুত্র কোন সূক্ষতম বৈজ্ঞানিক হিসাব যন্ত্রেও ধরা যায় না। যেমন যদি প্রশ্ন করা যায় ১৮৫৭-র সিপাহী বিদ্রোহকালে যদি রত্নাবলী অভিনীত হওয়ার দুর্বার কারণে ঘটেও থাকে তবে অকস্মাৎ বাংলা নাটকের বিষয় সংলাপ ও চরিত্রের গুণগত বৃদ্ধি সংঘটন জরুরী হয়ে ওঠে কেন এবং তখন শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় একথা বলেও থাকেন যে "তাহার পেছনে কোন প্রবল দেশব্যাপী ভাবান্দোলন ছিল না" অর্থাৎ আসলে তা একটা প্রতিক্রিয়ামূলক তাৎক্ষণিক সৃষ্টি কর্মমাত্র তবে তো কোন সমাজ সত্যের প্রতি নীতিবাগীশ মনের অধিকারের প্রয়োগ করা হল এমন অপবাদ কেউ দেয় না? 'উজ্জীবনের' যথার্থ ব্যক্তি সচেতনতার একক নীতিতেই প্রতিষ্ঠা পেয়ে থাকে, সমাজে প্রচলিত ধারণা বা নীতি তখন অত্যন্ত একটা গেঁয়ো কুসংস্কার রূপে ভাবিত হয় সেই উজ্জীবিত শিল্প জগতে।

সেই দিক থেকে 'উচ্চারণ' বর্তমান দশকের একটি শ্রেষ্ঠ পরীক্ষামূলক কবি-কর্ম। লক্ষ্য করলে ধরা যায় যে, সৈয়দ আলী আহসান তাহার দরবেশ থেকে সহসা সচকিত পর্যন্ত তাঁর সমগ্র কাব্য ধারায় বারবারই আপন কাব্য পরিবেশের কেন্দ্র থেকে দূরে সরে একটা ভিন্ন পরিমণ্ডলে পর্যটন করেছেন—ইকবাল এবং সেণ্ট ক্লেয়ার লুই এর অনুবাদ কর্মে নিবিষ্ট থেকেও আত্মতৃপ্তির ছায়ানুসরণ করেছেন, তিনি নিজেকে প্রবাসীর মত ভেবেছেন সমগ্র পথ পরিক্রমায়। উচচারণে তাঁর অবচিত্ত মনের সেই সব সূক্ষ্ম চারিত্র সমুহের বর্ণাঢ্যতার শেষ পৃষ্ঠাগুলি যেন ইচ্ছাপূর্বক খুলে দিলেন। যেন কোন সমুদ্রগামী ডোডো আকাশের বুকে ডানা ভাসাবার গভীর আহ্লাদকে অচেনা দ্বীপের এক বৃক্ষ আশ্রয়ে বসে স্বপ্নাচরণের মত উপলব্ধি করছে অথবা নিজেকেই খুঁজছে বাতাসের প্রতিটি তরঙ্গে তার পথভ্রমের ভাবনাগুলিকে সামনে ছড়িয়ে রেখে। উচচারণ সেই দিক থেকে, সেই দৃষ্টিকোন থেকে অজস্র বক্তব্যের এক ঐক্যতান সম্ভব অর্গান।

উচ্চারণকে তবুও গ্রহণের আপত্তি থেকে থাকলে একথাও সংগে সংগে এসে যায় যে বাংলা দেশে যে সব কাব্যগ্রন্থ এ যাবৎ প্রকাশিত হয়ে এসেছে তারাই তাদের অন্তর্গত কবিরচনা বা কবি কর্মের আদলের আদর্শে আমাদের মনে কবিতা সম্পর্কে কতকগুলি স্থির ধারণা (দেহ ও ভারগত) জন্ম দিয়েছে যার পরিবর্তন বা সামান্য রূপান্তরে মৌল ধারণার কাঁচের পাত্রটি শতখণ্ড হয়ে যায় তৎক্ষণাৎই। জীবনানন্দ দাশই প্রথম বাংলা দেশে এই পাত্রটির দুর্বলতার সংবাদ জানতেন। এবং সেজন্যই তাকে স্পষ্ট ভাবে মিশনারীদের মত উচচারণ করতে হয়েছে। 'কবিতা বহু রকম হয়।'

বাংলা কবিতার দেহ নিয়ে রবীন্দ্রনাথও ভেবে দেখেছেন কিন্তু সেভাবনাকে এঁকেছেন ছোট ছোট ছকে। যেমন সিঁড়ি ভাঙ্গা ছন্দ, যেমন গদ্যকে লালিত্যময় রেখে, সৌরভে ফুলের মত ফুটিয়ে তুলে।

কিন্তু বাঙালী তখনও জানতো না কবিতাকে কবিতার মধ্যে আকর্ষণ করা এবং কবিতাকে কবিতা থেকে বিকর্ষণ করার প্রশ্নটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে জীবনের মৌলবোধগুলিতে চীর ধরে উঠলে সঙ্গীতের প্রতিও মানুষ বীতরাগ হতে থাকে, কারণ মানুষ তখন মানুষকে হত্যার যজ্ঞে উৎক্ষিপ্ত, সারাদিন ব্যাপৃত, সারারাত পরিকল্পনার কদর্য গভীরে অনিদ্র—হিরোশিমার লক্ষ্যে মানুষ অখৃষ্টান, ঈশ্বরদ্রোহী এবং স্বঈশ্বর। অতএব বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই কাব্যে, সাহিত্যে, চিত্রে ও সঙ্গীতে সমধারায় ও সমান্তরাল প্রক্রিয়ায় পরিবর্তনের একটা ধাপ এগিয়ে এসে এসে বিভ্রান্ত বিপর্যস্ত মানুষের রূপকে সম্পূর্ণ অবয়ব দিল যখন, তখন 'শিল্প শক্তির' সেই 'সম্ভাবনাই' মানুষের একতম 'প্রতিদ্বন্দ্বী' হয়ে উঠলো। মৌলিক সৃষ্টির ক্ষেত্রেও নার্ভাল বা বালজাক থেকে র‍্যাম্বো, গীয়ম-এ্যাপোলীনেয়ার কিংবা ১৯২৪-এর আঁদ্রে ব্রেতোঁ যেমন স্বপ্ন, নিদ্রা, তন্দ্রাচ্ছন্ন অনিদ্রা, জাগৃতির স্তরগুলিকে একাকার করলো, অন্টোনিন আর্তো, হেন শার যেমন সজীব মুহূর্তগুলিকে মানুষের কাছে বিজ্ঞানের অমোঘ নিয়মে টুকরো টুকরো করে তার পূর্ব অখণ্ড ইতিহাসকে মুছে দিল, ত্রিস্তানজারা যেমন হৈ হৈ করে নিয়মের রাজ্যে অসংখ্য ছিদ্র আবিষ্কার করে তার Dadaism ধারার তার জোয়ালো ও বলিষ্ঠ যুক্তি নির্মাণ করলো, ইত্যাদি ইত্যাদি—তেমনি

অনুবাদ কর্মেও রবার্ট লরেল কবিতার মৌল রহস্যকে আঘাত হেনে তাকে ব্যক্তিগত বা স্বেচ্ছা কর্মের চূড়ান্ত করে তুলতে ইতস্তত করলো না। শব্দের রাজ্যেও পল এলুয়ার থেকে ভালেরী সবাই নির্মম কষাই হলো, কাব্যে নারী চিন্তাকে পর্যন্ত অবাঞ্ছিত কর্ম হিসাবে মালার্মে একসময় ভাবলেন অর্থাৎ রমনী সম্পর্কিত রক্তিম চেতনাটির অবলুপ্তি ঘটাতে পারলে এঁরা অন্যতর মহৎ সম্ভাবনার রূপকার হতে পারেন বলে ভাবতে শুরু করলেন ।(অবশ্য তারই প্রতি-ক্রিয়ায় রমনী দেহের বর্ণনার আতিশয্য ও চরম নির্লজ্জতা দেখা দিয়েছিল পরবর্তী কালে)।

কাব্যে এই সব আন্দোলনগুলো বাংলা সাহিত্যে এসেছে অনেক পরে, এবং তার প্রথম দরজা ছিল স্যুররিয়ালিজমের অভিঘাত বা প্রেক্ষিৎ। কাব্যে যাবতীয় বৈদেশিক পরীক্ষা নিরীক্ষা ফরাসী দেশেই প্রথম হয়েছে, তারপর সেখান থেকে জলবায়ু ও মানসিকতার গঠন অনুযায়ী বিভিন্ন দেশে কবিরা সেগুলিকে স্ব স্ব ভূমিতে চর্চা করে কবিতাকে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর করে এনেছেন। যেমন নার্ভালের কাব্যগণিত প্যারিসেই উদ্ভাবিত, ইতালীর, "ডাডাইষ্ট"দের কাব্য কর্মের উৎসও প্যারিস, জার্মানের "ইম্প্রেশনিজম" ও তাই; কেবল ইংলণ্ড স্বভূমিতে তার 'ইমেজিজম' বা কবিতার প্রতীক আলোর লণ্ঠন দোলানোর নিষ্ঠাবান কর্মটি একক প্রচেষ্টায় উদ্ভাবন করেছে। নইলে যাবতীয় সাহিত্যিক আন্দোলন—ভাবগত এবং রূপগত—ফরাসী আড্ডাখানারই জন্ম নিয়েছে। 'সুররিয়ালিজম' ও তেমনি ভাবে জন্ম নিয়েছে এই যুদ্ধত্তোর মধ্যবিত্তদের দেশ ফরাসীতে। গীয়ম এ্যাপোলীনেয়ারের মৃত্যুর পর এবং যুদ্ধ থেমে গেলেই এই চিন্তা আঁদ্রে ব্রেতোঁকে পেয়ে বসে।

এদেশে তখন 'কল্লোলের' জোর প্রতিক্রিয়া চলছে এবং কালিকলম (১৯২৬) ও প্রগতির (১৯২৭) সাহিত্যিক আন্দোলনগুলি এগিয়ে যাচ্ছে শনিবারের চিঠির (১৯৩০) প্রতিক্রিয়ামূলক নিরুদ্ধ আন্দোলনে। (দ্রঃ পরিচয় প্রকাশিত হয় ১৯৩১ সালে, সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত)। সজনী কান্ত দাস এই আন্দোলনের অন্তিম পর্যায়ে বঙ্গশ্রীতে তৎকালীন বঙ্গসাহিত্য সম্পর্কে বিদগ্ধজনের ধারণাকে এইভাবে তুলে ধরলেন (১৯৩৩):

"সন্ধ্যা সঙ্গীতের নূতন রবীন্দ্রনাথ মহুয়া লেখা সমাপ্ত করিয়া হঠাৎ যেদিন 'শেষের কবিতার' দুর্ভাগ্য নিবারণ চক্রবর্তীর কথা স্মরণ করিয়া নিজেকে পুরাতন মনে করিয়া বিচলিত হইয়া উঠিলেন, সেদিনই বাঙ্গালা সাহিত্যের দুর্দিন আসিয়াছে। রবীন্দ্রনাথকে তখন অতি নূতনে পাইয়া বসিল।...পৌষের প্রবাসীর প্রথম কবিতা 'শুচি' রবীন্দ্রনাথের সেই নূতন সুরকাটা তালকাটা কবিতা। ভীত সন্ত্রস্ত বাঙ্গালী পাঠক এইগুলিকে গদ্য কবিতা আখ্যা দিয়া রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাহাদের পূজাভাব জাগ্রত রাখিতে চেষ্টা করে।" (সুকুমার সেন, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৬০)

বাংলা কাব্যের পরিবর্তন বা ঋতুর এই ভিন্ন উপস্থিতিকে সহনীয় করেছেন সুধীন দত্ত—এবং একমাত্র সুধীনদত্ত। পলভালেরীর এবং মালার্মের সহমর্মী কাব্য-সাধক হিসাবে কাব্যাঙ্গকে তিনি রবীন্দ্রচ্ছায়ায় থেকেও পেশল জাগ্রত 'উভবল মনন' সমৃদ্ধ করেছেন। ভাবের প্লাবনে বাংলা কবিতা সঙ্গীতাত্মক সরলতায় এমন সহজবনেদী হয়ে উঠেছিল যে তার ভিত্তিমূলে মাটিও প্রায় ছিল না।

কাব্যকে কাব্যের চর্মাবরণে তথা অভ্যন্তরে কুশল সংগীতকারের প্রিয় তানটির মত বারবার উচ্চারণের উচ্ছিষ্টকর্ম করে তুলতে 'হারমেটিসিষ্ট' গোষ্ঠীর কবিগণের জুড়ি অবশ্য (আজো) নেই। কিন্তু ইতালীর কাব্যে ব্যবহৃত বাকধ্বনির স্বাভাবিক স্ফূর্তি এবং নিবীর্য জীবনের দুর্বল অঙ্গীকার সমূহের প্রতিতুলনায়ও বাংলা কাব্য দুর্বল—রবীন্দ্র প্রতিভার সামনেই নজরুলীয় হৈ হৈ বাক্যরীতি এবং সুধীন দত্ত, বিষ্ণু দে প্রভৃতির অধীত কারুকর্মের প্রবল বন্যা অপ্রতিরোধ্য হলো তো সেই জন্যই। কেবল আমাদের কবিরা বুঝেও বুঝলেন না যে সম্মোহন মানুষের মজ্জাগত হতে পারে না, যেমন খ্রীষ্টিয় লেখকেরা কবিতাকে প্রায় বর্জন করেও মহৎ হয়েছিলেন এবং অডেন প্রায় প্রবাদ উল্লেখ করেই তো বলেছেন,

> A Christian ought to write in prose
> For poetry is Magic.

বহু আগেই তাই Magic, এই অলৌকিকতা এই যাদুময় স্পর্শতাকে এড়িয়ে জীবনের বিকল্প চিন্তা মানুষকে জাগ্রত শক্তির সন্ধান দিয়েছিল; স্বদেশে এবং সুদূরতম বিদেশে একজন খ্রীষ্টসেবী বুক উঁচু করে অরণ্যে অথবা উর্বরতম উপত্যকায় বলতেন, 'আইস, আলোকের পথে আইস।' তারজন্য সঙ্গীতময়

ভাস্যের প্রয়োজন হয় নি। সঙ্গীত প্রবেশ করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ—যার প্রয়োজন ছিল না চৈতন্য শক্তির ক্ষয় একটা সমাজ সত্য হয়ে ওঠার পর।

অতএব, আলোচনার গোড়ায় ফিরে যেতে চাই। বাংলা কাব্যদেহ যাকে আমি চিনি, আমার পিতা কিংবা পিতামহ যাকে বাংলা কাব্য বলে পাঠ করে গেছেন তিনি জানেন এবং আমাকেও জানতে বাধ্য করেছেন, বাংলা কবিতা কখনও অবাংলা কবিতা হতে পারে না, হতে পারেনা সে ত্রিস্তানজারা, র‍্যাম্বো, ত্রিসীমায়ও আসতে পারে না ফিউচারিষ্ট বা ১৯২৪-এর ফরাসী আন্দোলনকারীরা, আর মিরহো বা শালভাদর দালির চিত্ররীতি কিংবা পিকাসো বা মাতিসের রং-এর অন্তর্জগত খুলে দেওয়ার অনৈতিকতা সেতো মারাত্মক অপরাধ। এমন কি এই ধারাতেই যারা গদ্য পদ্য ভেদের চূড়ান্ত সীমারেখা অনির্ণেয় ভেবে গদ্যের পূর্ণ অস্বীকৃতির আন্দোলন গড়ে—Magic বিরোধিতায় New Magic ভাবনাকে দ্যূতিভাস্বর করে, New Novel আন্দোলনকে জনপ্রিয় করে তাদের জন্য তো 'রৌরবাগ্নি' বহু পূর্ব নির্দিষ্ট।

সেই পরিবেশে—পৃথিবীর এক ভূখণ্ডে পৃথিবীকে স্বীকার করতে চেয়েই আমাদের এক কবি যদি সমান্তরাল কাব্যসৃষ্টি সম্ভব উপাদানগুলিকে পৃথিবীর অন্যান্য ভূখণ্ডের প্রতিক্রিয়ার আলোকে বিচার করে গ্রহণ করতে চান, নিজেরই যে জ্ঞান তাকে পুনঃ নির্মাণ বা পুর্ণবিন্যাসও করেন—তবুও কি তাকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে না ?

উচ্চারণের শেষ এবং একমাত্র কৈফিয়ং তাই, আমার মনে হয়েছে :

১. বাংলা কাব্য এখনও রবীন্দ্রচ্ছায়াকে বলিষ্ঠতর জীবনদর্শন এবং কাব্যাঙ্গিকের দিক থেকে মাইকেল প্রভৃতির মত বিগত কাব্যশিল্পের ইতিহাস বলে ভাবতে পারছে না; ফলে একটি শিল্প কাব্যরীতি ও শিল্প ভাবনার উদ্ভাবন যে কোন সচেতন শিল্পীরই একটি দায়স্বরূপ ; এবং

বাংলা কাব্যে নজরুল ইসলাম যে হৈ হৈ বাদ বা বাঙ্কারার অন্যতর শক্তিকে বন্যার জলের মত ঢুকিয়েছিলেন তাকে পুণ নিরম্ভণ তথা পুনর্ব্যবহার প্রশ্নটি কোন কবি কর্মেই গ্রাহ্য হচ্ছে না অথচ সমাজ মনে রবীন্দ্রসংস্কারের মতই নজরুল সংস্কারটিও রাজনীতি ও ভাবোচ্ছ্বাসজনিত ও কিঞ্চিৎ বেদনাযুক্ত

কারণে আত্মলগ্ন হয়ে উঠছে—যার অপসারণ বাংলা সাহিত্যের স্বাস্থের জন্য প্রয়োজন ;

২. মাইকেল এবং সুধীন দত্ত বাংলা সাহিত্যের জন্য যে দুটি বৃহৎ সরণী আবিষ্কার করে গেছেন, এখন সেই পথে বিচরণ একটি বর্তমান দায়িত্ব, এবং

৩. তৃতীয়তঃ, পদ্যের অলৌকিকতা সম্বন্ধে মোহকে অখ্রীষ্টান সুলভ চেতনায় ভেঙ্গে নিয়েই কবিতাকে প্রথমতঃ এই সংজ্ঞায় সনাক্ত করবো : Poetry is not Mag c এবং পরে এই সুররিয়ালিজমের নেতিবাদ থেকে সরাসরি ইতালীয় অনর্থবাদ এবং পরে ভবিষ্যৎবাদী কর্মকে কবিতায় গ্রহণ করে নিয়েই রূপগত দিক থেকে ত্রিস্তানজারা থেকে কামিংস বা সাকী কিংবা ভাবগত দিক থেকে চল্লিশোত্তর সাত্র সগোত্রতা অথবা জীবনের মৌল বিষয়ের বিতর্কে মালার্মে থেকে আরাগঁ–যে কোন সংস্কারকে, আন্দোলন কর্মকে নিজস্ব বলে মেনে নেওয়ার আবশ্যকতাকে উপলব্ধি করতে হবে।

'উচ্চারণ' সেইদিক থেকে দায়িত্ব পালন করেছে তিনটি ভিন্নরূপ এবং অবস্থায় : প্রথমতঃ, অডেনের মত তিনি কবিতার জন্য সংরক্ষণবাদের নির্ভুলতত্বগুলিকে সঞ্চয় করে রাখেন নি, স্পষ্টই তিনি বলেন, তোমাকে আমার দিবার কিছুই নেই—(অবশ্য অধিকাংশ কবিতায় এই তুমি অনির্দিষ্ট অচিত্রিত অনামাঙ্কিত সর্বনাম নিঃশেষিত কবির এক ভিন্ন সত্তা যাকে আশ্রয় করে উচ্চরেণের চতুর্বিধ তরঙ্গ প্রতিনিধিত্ব করে) এবং তখন সেই তুমি আশ্রিত আনন্দ যাকে নন্দনতত্ত্বের ছকে ফেলে 'কবিতাই' বলা স্বাভাবিক, তার একতমধর্ম প্রবহমানতা (কবি-যাকে 'অনবরত' শব্দে চিহ্ন আঁকেন) যার অবদান শুধু কথা ; গদ্য নয়, পদ্য নয়—কথা উচ্চারণের উপাধি যাকে বলা যায়।

এখানে যদি তিনি সংরক্ষণবাদী হতেন তবে কাব্যে সহজ ও শান্ত শব্দের ছাড়পত্রদানকারী বুদ্ধদেব বসুর মত বা ইতালীয় ক্রেপুসকোলারীদের মত হয়ত বলতেন, তোমার কাছে কাব্য পাঠ করে আমার আনন্দ, কিংবা তোমায় কেবল কাব্য করে মিথ্যা কথাগুলি শুনিয়ে এবং তোমার মিথ্যা কথাগুলি অনবরত শুনে আমার যত তৃপ্তি। তাতে বর্ণের সবটুকু উচ্ছ্বাস তরল এবং পর্যাপ্ত-

ভাবে রঞ্জিত হত, কিন্তু সেই শিথিল ভার শব্দকে পদ্যের কাঁকন বাঁজিয়ে অডেন বর্ণিত Magic দ্বারা আছন্ন রাখতো।

কিন্তু উচ্চারণের কবির মহৎ আবিষ্কার এটাই যে কবিতা শুধু Magic নয় এবং তার থেকে আত্মরক্ষা করতে হলে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণও হতে হয়না—অর্থাৎ এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই যে, তাকে বিশেষ এক প্রচলিত রীতিতেই কাব্য রচনা করতে হবে। বরং ব্রেঁতোর মত কাব্য-মুক্তি ভাবনা আনয়নই তাঁর চরম অঙ্গীকার থাকবে, সেটাই স্বাভাবিক। এই মুক্তি ভাবনাটি আবার তিনি ব্রেঁতোর সাক্ষাৎ প্রেরণা স্বরূপ লাভ করলেও নিজস্ব প্রক্রিয়ায় তার উদ্ভাসন ঘটিয়েছেন—ফলতঃ ব্রেঁতোর ১৯২৪-এর ধারা থেকে সাত্রের ১৯৪০-এর ধারা পর্যন্ত তার অবাধ ওঠানামা বা ভাবও রূপগত বিন্যাসের P.V (Peak and Valley) অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত, নিয়মিত এবং পরিমাপবদ্ধ।

দ্বিতীয়তঃ, আবার অডেনের মতে হোমেজ টু ক্লিয়ো থেকে উদ্ধৃতিটি দিয়েই বুঝাতে চাই A Christian ought to write in prose for poetry is magic. সৈয়দ আলী আহসান poetry কে যাদুহীন শক্তি বলে উল্লেখ করেন নি (মৌখিকতঃ তিনি অবশ্য কবিতাকে কেবলমাত্র বুদ্ধিধর্মজাত প্রবর্তনা বলে থাকেন) বরং তাকে Magic বলেই প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন বা নব প্রতিষ্ঠা দান করেছেন, কেননা গদ্য ব্যবহারে তিনি খ্রীষ্টীয় বিধানকেও আরো নিবিড়ত্ব দান করতে সক্ষম হয়েছেন।

বাস্তবতঃ এর ফল হয়েছে এই ঃ

১. কাব্য বা কবিতা সম্পর্কে ভাবনাগত চেতনাটি বৃদ্ধি পেয়েছে ;

২. কাব্য বন্ধনের ভারসাম্যতত্ত্ব উদ্ভাবন করে ভাষার আলেখ্যটিকে একটা 'অভিক্ষেপের' ওপর নির্মাণ করলেন যার উর্দ্ধগতি, মধ্যগতি ও গতিরাম্ভ বেগ থাকা সম্ভব। কারণ ভাষার একটা সংস্কার ভেঙ্গে বৈজ্ঞানিক কারণেই একটা তৃতীয় শক্তির রূপান্তর ঘটলো ;

৩. সমগ্র গ্রন্থটি ভাষার একটাই স্থায়ী প্রশাসনিক কেন্দ্র থেকে নম্বরযুক্ত খণ্ড খণ্ড কাব্যিক অঞ্চলগুলি কতকগুলি নির্দিষ্ট সুবিধা, ঐশ্বর্য্য ও অন্তর্বিধ বিকাশ-ধর্মী স্বতোঃ লিপ্ত ব্যাপারে নিয়ন্ত্রিত।

তৃতীয়তঃ, পূর্ববাংলার সমকালীন কবিতার ক্ষেত্রে যে বস্তুর একান্ত অভাব বিশেষ কোন বুদ্ধিগত চিন্তার একটি সমগ্র ও অখণ্ড রূপকে নির্মাণ করা (যাকে Philosophy বলা হতো কোনকালে)-তাকে তিনি স্বচ্ছন্দে অবলীলায় প্রকাশ করেছেন। আমি প্রারম্ভে আলোচনাকালে যে কথাগুলি বলেছি, তার পুণরুচ্চারণ না করেও বলবো, উচ্চারণ প্রেমের কাব্য নয় বিদেশী ভাবানুসরনে পরীক্ষা নিমিত্ত সৃষ্ট কাব্যও নয়, কবির এযাবৎ কাব্যোচ্চারণের নিয়মিত অভ্যাসটিই নিজস্ব আকার কিংবা অবয়বিক পূর্ণতায় ধরা পড়েছে এবং কবির নিজেরই অজ্ঞান্তে নিজের এই চিত্র একবিদগ্ধ জাঁকজমকের নির্মাণ স্বরূপ—যার চিন্তা সমকালকে আচ্ছন্ন করে বিক্ষিপ্ত সৃষ্টিকার্যেও, রামায়ণ থেকে কামায়নে যার অগাধ অধিকার বিস্তৃত এবং স্বচ্ছন্দে যিনি নিজকে স্বদেশে তাঁর অন্তরঙ্গতার গভীর শিকড়টি রেখেও অনায়াসে বিদেশের আলোবাতাসের আকাশেও সৌরভ ছড়াতে পারেন।

একবার বলতে চেষ্টা করেছি 'অনেক আকাশে' তিনি দ্বিধাগ্রস্ত, একক সন্ধ্যার বসন্তে তিনি মহাকাংখী এবং বিদেশ-চিন্তাকে মাতৃভূমির রূপাঙ্কনের মাধ্যম হিসাবে গ্রহনেও দ্বিধা করেননি 'উচ্চারণে' তিনি সেই আকাঙ্খার প্রমিথিউসীয় ডানাকে স্বেচ্ছায় কর্তন করেছেন। এখন বয়সী কণ্ঠে বেদনাকে একান্তে সরিয়ে, গঠনকেও আত্মসাৎ করে বলতে পারেন—

I feel like one
who had once wings.

উচ্চারণ গ্রন্থটির এই বৈশিষ্ট্যগুলি আরো বিস্তৃত আলোচনায় টেনে নিতে পারলে বোঝা যেত, সৈয়দ আলী আহসান কতবড় শিল্পী। চাহার দরবেশ থেকে বারবার বিষয় এবং পথ পরিক্রমার কারণে একথা বলা নয়, দেশ থেকে বিদেশ এবং বিদেশ থেকে দেশের সমস্ত ঐতিহ্যকে আত্মসাৎএর প্রবল মাইকেলী ক্ষুধা তার মধ্যে জাগ্রত বলেও একথা নয়, একটা নিয়মতান্ত্রিক দেশে বিপ্লবের Rough ভঙ্গীটা বর্জন করে অত্যন্ত মিতিবোধে তিনি যে অনিয়মিত কাণ্ড অবলীলায় সৃষ্টি করলেন তার জন্যই এই উক্তি করলাম। Keats-এর লা বেল ডম সন্স মাসির যে করুণ পতিত ভূমি যেখানে অসংখ্য নাইটদের খুলি এবং অসংলগ্ন হাড়গুলি একমাত্র দর্শককে কান্নার থরথর দুর্বারতাকেও

রুদ্ধ করেছে—উচ্চারণের সাহিত্যিক পটভূমি তো তাই। উচ্চারণ একটি পৃথক স্বষ্টি এবং জীবন যাত্রার প্রতিটি মুহূর্তের মতো প্রত্যেকটি উচ্চারণই তো স্বতন্ত্র অস্তিত্বে অথবা সামগ্রীক আবেদনে গ্রাহ্য। বিষয়ের মধ্য স্রষ্টার উপস্থিতি, দৃশ্যের মধ্যে যেতে যেতে তাৎক্ষণিক যে মানসিক প্রতিফলন তা কখনও কখনও ঐ নাইটের ব্যক্তিগত স্মৃতি বা আলাপাচরনে সীমিত করেছে হয়তো, কিন্তু এ কণ্ঠতো আবিষ্কার—"পৃথিবীর রূপ দর্শন করে আনন্দকে আবিষ্কার (পৃঃ ২১)।" কিন্তু সেখানেই ভয়, এ আবিষ্কার কি একাকীত্বের, এ আবিকার করে কবি কি বিবর্ণ ?

না, "একাকী বিষন্ন মুহূর্তে দিন গণনাকে অবলম্বন করতে চাইনি। সময়ের পদপাত শুনে মৃত্যুর অধীরতাকে কেন প্রশ্রয় দেব ?" এযুগে এর চেয়ে বলিষ্ঠ উচ্চারণ আর কে করেছে ? উচ্চারণের প্রথম পৃষ্ঠায় এ উক্তিগুলি কীটসের বর্ণিত নাইটের সেই উচ্চারণের পুণরাবৃত্তি নিশ্চয় এটা নয়।

উচ্চারণ—৩

You say this is not Poetry
You are right
Upon this page
Is blood-red rage.

(মার্টিন কর্কসন)

পূর্ববর্তী কাব্যগ্রন্থগুলিতে কবি যেমন কাব্য স্বষ্টির আপ্রাণ ও সজাগ প্রয়াসকে কবিতার প্রাণের ব্যঞ্জনায়, এক অন্তর্বিধ জটীলতার ভেতরে সার্থক ভাবে জাগ্রত করে তুলতে সক্ষম হয়ে কবিনাম ক্রমে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছেন, উচ্চারণে তার ব্যতিক্রমও আছে একাত্মতাও আছে। হাল্কা করে বলি 'অনেক আকাশে' কবি 'রূপে' ও 'বক্তব্যে', 'উপমায়', ও 'ছন্দ-ব্যবহারে', কৃতিমান কাব্যাশ্বরোহী, 'একক সন্ধ্যার বসন্ত' কাব্যগ্রন্থেও কাব্যের উপাদানসমূহ কাব্য আত্মায় জড়িয়ে গেছে আত্মজার অপতাস্মরণে কিংবা প্রেয়সীর অগ্নিবাহ প্রেমে।

উচ্চারণ প্রক্রিয়াগত চিন্তাধারার কাব্য হিসাবে সেইসব কাব্য প্রবাহ থেকে স্বতন্ত্র। কারণ এখানে,

১। কাব্যের সম্পূর্ণ দেহ অনুপস্থিত ;

২। উপাদানসমূহ পরস্পর বিচ্ছিন্ন এবং অনুযোগে। দ্বন্দ্বেও কোলাহলে দীর্ণ অর্থাৎ কাব্যকে দেহগত বা ব্যবহারিক কারণে কাব্য হতে হবে। এই তত্ত্বের অবরোধ সৃষ্টি করা হয়েছে উচ্চারণে এবং সেই সংগে ব্যবহৃত উপাদানসমূহকে বিচ্ছিন্ন বিশ্লিষ্ট কিংবা কখনও অনুক্ত রাখা হয়েছে কাব্যের নির্মিতি প্রথাকে চূর্ণ করার সজাগ অভিপ্রায়ে।

অতএব কাব্য নির্মাণ তত্ত্বকেই কবি পূর্ণতর ব্যবহার করেছেন, কেবল মাত্র ইলিয়টের তত্ত্বে আবদ্ধ বা সীমিত থাকেন নি। ফলে কবিতাকে বুদ্ধি-বৃত্তির "সর্বোত্তম পরিশোধন কৃত মনন রূপ" হিসাবে যতদূর এগিয়ে আনা যায় সামগ্রিক কাব্য সত্তাকে যত খানি অখণ্ড ভাবে গ্রাহ্য করে তোলা যায় উচ্চারণ তারই প্রয়াস কর্ম হিসাবে উল্লেখযোগ্য হয়ে থাকবে।

কবিতাকে এহেন পরিশুদ্ধ মনন কর্ম হিসাবে গ্রহণের তিনটি প্রচলিত ধারা (approach) আছে, Wallace Fowlie সেগুলিকে নির্দেশ করেছেন, (1) Intensity (2) total seriousness (3) এবং adherence to the fundamental assumptions of the new (American) Criticism of the thirties—এইরূপে।

ভিন্নভাবেও এর ব্যাখ্যা আছে, যেমন প্রতীকবাদী ফরাসী কবিদের আলোচনার ক্ষেত্রে অধ্যাপক ওয়েনবার্গ একটি সচেতন কাব্য শিল্প ধারার স্বরূপ ধরিয়ে দিতে চেয়েছেন এবং ফলে তাঁর বিখ্যাত Exegesis-তত্ত্বের উদ্ভাবন ঘটেছে। কাব্যের আঙ্গিক-বিচারে বা গঠন রূপের বিচারে Exegesis তত্ত্ব বহু সত্যেরই ইঙ্গিত দেয়। তবুও এই তত্ত্বে কাব্যশরীরে ভাব কর্মের দিকটি গুরুত্ব সহকারে দেখা হয় বলে সম্পূর্ণ আধুনিক বিচার পদ্ধতি হিসাবে গ্রাহ্য নয়। কাব্য বিচারে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটি সম্ভবতঃ Georges Poulet তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ E'tudes sur le temps persent-এ ধরতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর পরবর্তী কাব্য সমালোচনার 'সাহিত্য-দর্পণ' The Metamorphoses of the circle. এই গ্রন্থদ্বয়ে এবং ১৯৬৩ সনে

লিখিত Marcel Raymond সম্পর্কিত প্রবন্ধটিতে পরীক্ষা করে তিনি দেখলেন যে কবিতা আসলে শৈল্পিক সত্য অপেক্ষা বৈজ্ঞানিক সত্যের দিকেই অধিক নিবিষ্ট। কারণ কোন ভাব বা উত্তেজনা কিংবা প্রথানুসরণের আভ্যাসিক ক্রিয়া (যে কোন কবিরই) কবিকর্মের সার্বিক রূপের বিজ্ঞান থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। অতএব কবিতার বিচারে প্রথাগত রূপে চিত্র নির্মাণ করে পাঠককে খুশী করানোতেই প্রকৃত বিচার হয় না, আবার কাব্যের প্রকৃত বিচারের নামে অবৈজ্ঞানিক কোন পাপের প্রশ্রয়ও (মহৎ আলোচনার ক্ষেত্রেও) পরিত্যাজ্য হতে হয়। তাঁর মতে লেখকের পূর্ণ চেতনায় শিল্প নির্মাণ সম্পূর্ণ এবং সেই চেতনার একটি স্পষ্ট ইতিহাসই কাব্য শিল্পের ইতিহাস। সেই ভঙ্গী থেকে তাঁর সর্বশেষ উপলব্ধি এই যে, সমালোচকের পক্ষে পূর্ণ তথ্যারোহণ একটি বোধ বা একটি সচেতনতাকে গ্রহণের জন্য জরুরী হয় এবং সেই awareness-ই কবির কবি কর্মের নিমিত্ত ব্যবহৃত চেতন ক্রিয়ার নিশ্চিন্ত কিংবা অভ্রান্ত প্রতিচ্ছায়া। তা হলে কবি এমন কোন গোপনতর পথেরই অভিসারী নন যা সমালোচককে বিভ্রান্ত করতে পারে অথবা তাঁর সৃষ্টি কর্ম সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশে উত্তেজিত করতে পারে। অতএব কবি ও সমালোচক পরস্পর সমান্তরাল পথগামী এবং সে ক্ষেত্রে সমালোচক সেই ছায়ানু-সরণে অভ্রান্ত এবং কবির একতম দোসর (নিকটতমও)।

পূর্ব পাকিস্তানী কবিতার ক্ষেত্রে কাব্যালোচনার ভঙ্গীটি প্রথাগত, পূর্বসূরীদের নির্মিত সরণীতে নিয়মিত ভ্রমণ মাত্র। অতএব যেমন পূর্বসূরীগণ কবিতার দেহ এবং সুকুমার রূপের কারণটিকে সম্ভ্রান্ত পোষাকে আমাদের মনে অত্যন্ত গভীর ভাবে মুদ্রিত করে রেখে গেছেন যার ফলে তাকে স্পর্শ পর্যন্ত করতে মনে হীনমন্য প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, সমালোচনার ক্ষেত্রে ও বিশেষত, কাব্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে এমন দুর্গ নির্মাণ করে রেখেছেন যে কবিতাকে বৈষ্ণবীয় রস তাত্বিক আখ্যান ও চরনান্তিক রূপের আড়ালে রেখেই তাকে অক্ষত দেহী ভাবতে সহজে অভ্যস্থ হয়ে উঠি—বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণী ধারার সংগে কাব্যালোচনাকে আজ পর্যন্ত একত্র করা হয়নি এবং এর কারন বাংলা কবিতার অন্তরের দুর্বলতার মধ্যেই নিহিত।

প্রচলিত এই ধারাতেই সৈয়দ আলী আহসান বর্তমানে তীব্র আক্রমণের বিষয় হতে পারেন। সে ক্ষেত্রে আমাদের বর্তমান দায়িত্ব কেবল এটুকুই উল্লেখ করা ঃ

কবিতা অনেক রকমের হতে পারে (কারণ কবিতার সংগা নেই) এবং তার নির্মাণ কৌশলটিও। যেমন হতে পারে Fowlie বর্ণিত "তীব্রতর অনুভূতি" 'শিল্প রূপের সামগ্রিক প্রতিনির্মাণ কল্পনা", বা নব্য সমালোচনা রীতির মৌলিক ধারণাগুলির প্রতি আনুগত্যে একটি তৃতীয় কর্ম ; যেমন হতে পারে। Exegesis তত্ব প্রদর্শিত রূপের একটি কাব্য ভাষণ, অথবা যেমন হতে পারে প্রাকৃতিক বিধান বা Law রূপে প্রকাশিত একটি জটিলতম Phenomenon সৈয়দ আলী আহসান এইসব তত্বের কোন একটি তত্বের উদ্গাতা যদি হন তবে বাংলা কাব্যের সম্ভাবনা নিশ্চয় খুলে গেল বলা যাবে এবং আমাদের বিশ্বাস তাঁর জাগ্রত বোধ অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক নিয়ম বদ্ধ, ডে লুইসের মত মারাত্মক ভ্রমে তিনি কখনো পতিত হন না।

কবিতা অনেক রকম হতে পারে, কিন্তু তাকে নির্মাণের কৌশলটি কি ?—do you see how a poem is made of fails ? জীবনের উপান্তে এসে লুইস লিখেছেন, "By perpitual trying by closer pointing, by seeking and not finding and still seeking by a robustness in the core cf sadness." বেদনার গভীরে অন্তর সত্তার উপস্থিতি নির্ভুল ভাবে বিদ্যমান থাকে সকল মানবের চিত্তে, কিন্তু অতন্দ্র দৃষ্টির অন্বেষণে ক্রমে ক্রমে নির্দিষ্ট বিন্দুটিকে নির্ণয় করা, এবং পরে তাকে ধাবমান অশ্বপৃষ্ঠে থেকে বাণীর সূচাগ্র বর্শাফলকে বিদ্ধকরার অনায়াস সাফল্য লাভ করা কোন আধুনিক কবির পক্ষেই দৈবব্যাপার হতে পারে না ; ফলে লুইসের প্রাণান্ত প্রচেষ্টাকে ইতিহাসের ব্যর্থতার সেই তুষারাচ্ছাদিত কারাকোরামের শুভ্র ধূমল শয্যাকে গ্রহণ করতে হতো না। আকাংখার নিবৃত্তি কবির প্রত্যাশিত নয়, আকাংখার পুণর্নির্মাণ এবং ক্রমসৃষ্টি অভিসার তার অনিবার্য সংস্কার।

সৈয়দ আলী আহ্সানের আলোচনায় উচ্চারণের কাব্য প্রয়াসকে লক্ষ্য করে কবি আত্মার সেই প্রত্যয়ের বার বার অভিঘাতের চিত্রটিই মনে পড়বে। কারণ সৃষ্টির চেয়ে সৃষ্টির রহস্যটির প্রতি তার আকর্ষণ অত্যন্ত তীব্র, প্রায় স্নায়বিক, শরীরী এবং স্পষ্ট। অন্যথায় Fowlie বর্ণিত ত্রিবিধ ধর্মে তিনি একজন বাস্তব

ভাবে কবি, পুলের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের কাছে নাগিয়েও আমরা এভাবে উচ্চারণের প্রভাবকে চাক্ষুষ করতে পারি।

কিন্তু আলী আহসানের কাব্যে সংস্কার আছে, যাকে জ্যামিতির কাটা এবং ডিগ্রীর বিন্দুতে নির্ণয় করা যায়। দি পোয়েট এণ্ড লাইফ গ্রন্থে ষ্টিফেন স্পেণ্ডার বলেছেন, জীবন বিচিত্রতর প্রকাশ চায়, কবিতায়ই তাকে সম্ভব করার অবাধ সুযোগ গ্রহণ করা উচিত কবিদের। যুগ-লালন কবিতার অবশ্যম্ভাবিতার একটি দিক হতে পারে। কিন্তু কালোত্তীর্ণতার প্রশ্নে সকল কণ্ঠ অবদমিতও হতে হবে একথা যেন কবি ন ভোলেন। আলী আহ্সান কি সেই সুযোগ নির্মাণ করেছেন? না কাকতালীয়সুরের বাগানে চসারের সেই হত চরিত্র বেহালাবাদকের মত বা ভিন্ন শহর থেকে আগত সেই রমনীর মত আত্মদোহনই করছেন মাত্র?

আলী আহ্সানের কাব্যের মাতৃভূমি শব্দ নামক বৃহৎদেশে যার রূপক নামক নদীর তীরে উজ্জয়িনীর রমনীদের পুষ্পচয়ন ঘটে, এবং উপমা নামক পর্বত সংকুল তরঙ্গ মেঘলা বেলাভূমিতে বহু বিচিত্র নর-নারীর সহজ চিত্রগুলি নিত্যদৃশ্য হয়। সেই ভূমিতে তমালের ছায়াও একটি সমগ্রতা আবার পৃথিবীর সমগ্রতা কেবল একটি নদীর রেখার মত ক্ষীণ কিন্তু স্পষ্ট এবং বহুদূরবাহী, অথবা হয়ত একটি স্মৃতির বাগানমাত্র তার একাকীত্বের সম্বল। পূর্ব গ্রন্থগুলিতে ভালবাসায় মমতায় মনের কুমকুমে ভ্রমরের কৌটায় যে প্রাণকে তিনি রক্ষা করেছিলেন, উচ্চারণে তা কোথায়? এখানে উচ্চারণের নিবিড়তর আনন্দই প্রকাশের আনন্দ; অনবরত কথাবলার আনন্দেই তা সম্পূর্ণ, অন্যতর উপকরণ তার কাছে যেন বাহুল্য। তাই হঠাৎ হঠাৎ মনে পড়বে,—

(১) এ কাব্যের Mathew Arnold কথিত touch-stone তত্ত্বপ্রয়োগের সুবিধাকে কবি কৌশলে এড়িয়ে গেছেন; ফলতঃ সমস্ত ত্রুটিগুলি পাঠকের অজানা থেকে গেল;

(২) উপমা রূপকের সেই তরঙ্গ সেই সুরধুনী প্রবাহ উচ্চারণের কোন 'একক'কেই নির্মাণ করতে পারেনি—সমগ্র তরঙ্গ একটি রূপক এককে হয়ত আশ্রয় করেছে কিংবা উপমার আশ্রয় নামক স্মৃতি পুরান অধীতজ্ঞানের সূত্র পারম্পর্যগুলি হয়ত কোন আকাশেরই দিগন্তকে স্পষ্ট করলো না;

(৩) আংগিকের কারণেই যদি উল্লিখিত বিপর্যয়গুলি ঘটে থাকে তবে এই দুর্লভ আংগিকের ঐশ্বর্যই এ কাব্যের মহৎত্রুটি। [অবশ্য 'ফ্রম পোপ টু ভ্যালেরী' প্রবন্ধে কবিতায় বিপর্যয় ঘটিত দুর্সমস্যা নির্ণয়ে ও তার মূল্যায়ণ প্রসঙ্গে ইলিয়ট-এর যুক্তিগুলি স্মরণ রাখা প্রয়োজন।]

তাহলে 'কি তবে পেলেন' কবি তার উচ্চারণের বায়ুময়ূরে? সে আলোচনা অত্যন্ত জরুরী। কারণ বিদেশে এবং এ দেশে যখন কাব্যরীতিতে যে নব নব পরীক্ষায় সহজেই অনেকে উত্তীর্ণ হয়ে উঠছেন বলে দাবী করছেন তখন উচ্চারণের নিজস্ব পদ্ধতিটির পুণর্পরীক্ষণ প্রয়োজন। ধূর্জটি প্রসাদ একবার বলেছিলেন,—"কি দেশী কি বিদেশী বর্তমান সাহিত্যে সাধারণ প্রতিজ্ঞার আস্থার পরিবর্তে অবচেতনাকে গ্রহণ করা হচ্ছে। সেজন্য অবশ্য অবচেতনাস্থিত দমিত প্রবৃত্তির স্ফুরণে—সমাজ জীবনের পরিবর্তন সম্ভব এই ধারণাই দায়ী। অবচেতনা থেকে সাহিত্যিক দুটি জিনিষ প্রত্যাশা করেন, আঙ্গিকের দিক থেকে ইমেজ ও সীম্বল এবং রচনা রীতির বেলা ভাবধারার একটি নূতন সম্পর্ক"—কথাটা এক অর্থে সত্য—উচ্চারণের এই ইমেজ এবং প্রতীক ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করেই ধূর্জটি প্রসাদের এই উক্তিটি উল্লেখ করতে চাইছি এবং এখানে আমার বক্তব্য, ধূর্জটি প্রসাদেরও তাই, "যে সীম্বল ইমেজ ব্যবহারের দ্বারা সাহিত্যিক বিপ্লব নাও হতে পারে। প্রকৃত পক্ষে অবচেতনা বিপ্লবী সেবার শিবির নয়, তাকে চেতনা দিয়ে খোঁচালে তবে সে বিদ্রোহীর রসদ যোগায়।" আলী আহ্সান উপমারূপকাদি প্রয়োগের সীমাবদ্ধতা মেনে সমাজ পরিবর্তনে যে মন্থরতা এসেছে তার রূপ-নির্মাণে মনোযোগী হন নি নিশ্চয়ই, যদিও ইলিয়টের মত তাঁরও বলার আছে;

I am moved by fancies that are cured
Around these images and cling.

তবু এ ক্ষেত্রে এটাই লক্ষ্যযোগ্য ব্যাপার যে রূপ-প্রতীকের প্রবাহকে বিশেষ উপলব্ধির তীর্যকতায় গ্রহণ না করে একটা বৃহৎ যোগফল নির্মাণ করেছেন কবিতার সমগ্র উচ্চারণে অর্থাৎ উচ্চারণটিকে সমগ্রতা দানই এখানে লক্ষ্য এবং দ্বিতীয়তঃ, তা করতে গিয়ে পূর্ববর্তী উপমা-সমস্যা বা প্রতীক ব্যবহারের আভ্যাসিক কর্মগুলি থেকে তিনি সজ্ঞানে সদলে বেরিয়ে এসেছেন। অর্থাৎ নিজের সৃষ্টির বেদনায়

নিজের স্বষ্টির কাছে তিনি বিদ্রোহীবলে ধরা পড়েছেন। সেই বিদ্রোহ, যার মধ্যে লুইস বর্ণিত অফুরন্ত কামনাগুলি আপনাকেই বার বার আঘাত করছে এবং সেই বিদ্রোহ যা তাকে একটা confession বা জবানবন্দী লিখবার সৎ সাহস এবং যৌবনিক ক্ষমতা দিয়েছে—এ জন্যই হয়ত সংকবির কর্মকে সকল সময়ই বলা হয় **A new confession.**

উপসংহার ঃ

উচ্চারণ বিভিন্ন সময়ের কবিউচ্চারণ বা কবিবোধের অনুচ্চারিত শব্দচিত্রও নয়, উচ্চারণ একটি সত্যের নির্মাণ যার তিনটি স্তর আছে এবং আছে বিভিন্ন মাত্রা ; এবং সেই সত্য যুগের সকল পূর্ব প্রতিজ্ঞাগুলিকে অনায়াস নিয়মে এবং শৃংখলার অতিক্রম করে এসে একটা বর্তমানের ভেতর বিজ্ঞান যাকে সবসময় আমাদের সংলগ্ন করে এবং যার উপহীয্য সকল উপাদানসমূহ আমাদের বাঁচিয়ে রাখে। অথচ তার দ্বন্দ্ব ও অন্তর্বিরোধের জাগ্রত চৈতন্যের মুহূর্তগুলোও হারিয়ে যায় বা তাকে সত্য বলে কেউই ভাবতে চান না—উচ্চারণ সেই সব ইতিহাসকে একটা পূর্ণ আকাংখার নির্মাণ করতে চেয়েছে. নির্মাণও করেছে একটা দুঃসাহসিক অভিমানকে। উচ্চারণ তারই মহৎ প্রকাশ—সৎ উচ্চারণ—**A new confession.**

চর্যাপদের মানুষ

সভার প্রধান আসন থেকে নিয়ে তৃণাসন অবধি যারা আজ কর্মী, আমি তাদের কাছে বিধর্মী ; কিন্তু তাদের সামনে আমার স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে, আমি যে ভাষায় কথা বলি এবং যে সাহিত্যকে প্রাণের নিরঙ্কুশ সাধনায় বাঁচিয়ে রাখতে চাই—সেই ভাষা এবং সাহিত্য আমার নয়। একদিন 'বাংলা দেশের' বৃহৎ জনসাধারণ ছিল বৌদ্ধ এবং বৌদ্ধগণ ও দোহাকারগণ আদি বাঙালী কবি না হলেও, বাংলা ভাষার প্রথম কবি ছিলেন তাঁরাই। তাঁদের সাহিত্যেই সর্বপ্রথম বাংলা ভাষা ও 'বাংলা দেশের' চেহারা প্রকাশ পায়। আজকের বুদ্ধ-পূর্ণিমায় আমার আদি কবিদের আমি আমার অন্তরের শ্রদ্ধা জানাই।—

হাজার বছর পুরনো বাংলা সাহিত্য আসলে পুরনো নয়। ইংরেজ আমলে তার দ্বিতীয় বা তৃতীয় জন্ম হয়েছে। মুসলমানদের হাতে তার দ্বিতীয় জন্ম হয়েছিল। মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ যেমন ইঙ্গবাংলা সাহিত্যের দান ; চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, কাশীনাথ দাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র তেমনি বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের বিদ্যোৎসাহিতার অবশ্যম্ভাবী ফসল। তেমনি মীননাথ, লুইপা, কাহ্নপা,—এঁরা ছিলেন সেই বৌদ্ধ আমলের বাংলা সাহিত্যের সূতিকাগৃহের কবি। তখন ধর্মটাই মুখ্য ছিল, এখনও যে তা গৌণ এই সেদিন আমেরিকার Rev. Leland Gartrell-এর বক্তৃতার পর সে কথা কি করে বলি ? Mr. Gartrell অতিমাত্রায় উদার হয়েও বর্তমান (existing) চার্চগুলির Relocation এবং Consolidation problem-টা সাহিত্য ও সমাজের একটা সমস্যা হিসাবে যে ভাবে দেখিয়েছেন, সে তুলনায় চর্যাপদের বৌদ্ধদোহা-কারগণ অতিমাত্রায় যে বাস্তব ছিলেন, আমার এ প্রত্যয়ে আমি খাঁটি।

কিন্তু Suffolk County Council, মি. গার্টরেলকে গ্রাহ্য না করার কোন প্রস্তাবই যখন আনতে সাহস করে নি, তখন এ কথা ভেবে দিশাহারা হই যে,

(১) বৌদ্ধদোহাকবিগণকে কেন এ দেশ থেকে অমন করে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছিল ?

(২) তাঁরা দেশজনের সংগে কি এমন ষড়যন্ত্র করেছিলেন ;

(৩) তাঁরা যে সমাজ চেয়েছিলেন বা ;

(৪) যে সমাজে বাস করতেন সে সমাজ কোন প্রকারেই কেন অভিপ্রেত হয় নি ? আর,

(৫) সে সমাজের উৎস সেই বিশেষ বুদ্ধিজীবিদের কেন আর কখনই অন্বেষণ করার প্রশ্ন ওঠে নি স্বদেশে ?

এসব প্রশ্ন সাধারণ এবং অতিপুরাতন। কেবল যে প্রশ্নটা কিছুতেই শেষ হয় না সেইটে এই যে, চর্যার কবিগণ পদরচনা করতে গিয়ে কেন মানুষকেই আঁকতেন এবং এ মানুষ কোন্ মানুষ ?

ব্রাহ্মণ্যবাদী সাহিত্যের করতল থেকে বৌদ্ধবাদী সাহিত্যের মুক্তি এবং ক্রমে পরিসরগত বিস্তৃতি যে আশ্চর্য প্রশ্নটা এনে সামনে তুলে ধরেছিল তার মধ্যে হয়ত নতুনত্ব কিছু ছিল না, কিন্তু সেই প্রশ্নটা যে একটা আবরণের তলায় সর্বক্ষণ একটা নেপথ্য আদপ রক্ষা করেছে, আজকের এই Symbolicism ও Abstractism-এর যুগেও তা কারুর চোখ এড়াতে পারে নি। যুগের দিক থেকে বহু এগিয়ে এসে আজ আবার আমরা তাদের সংগে মিলিত হয়েছি। এতে মনে হয়, বাংলা সাহিত্যের একটা বৃত্তের সম্পূর্ণতার প্রায় কাছাকাছি এসেছি। চর্যাপদের মানুষ আজকের সাহিত্যে ভীড়করা মানুষকে চেনে, সুতরাং আজকের মানুষের নিগূঢ় ব্যথাবেদনার গভীর পরিচয়টি সেই আদি মানুষের বুকে জমা আছে। এবং আজকের মানুষের খাতিরে চর্যাকারদের চর্যাপদের চরিত্রগুলোর সন্ধান নেওয়া একটা অবশ্য কর্তব্যের সামিল। বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের উৎস জানা তাই আমাদের আবশ্যক।

Mythology-র দেশ বাংলাদেশ—এই দেশ এবং ভূখণ্ডেরই নাম ছিল পাতাল। এদেশের সাধু সামন্তদের অন্বেষাবৃত্তি পাতাল ভৈরবীকে কেন্দ্র করেই। এবং ডাকিনী যোগিনীর প্রপাত আর্য শুভংকরীতে যে বিপ্লব এনেছিল তা আজ আর অনর্থ সংস্কার নয়। সাগর রাজা এই দেশ থেকে একদিন আপন করে নিয়েছিলেন, ভগীরথ তাই অনাবৃষ্টির হাত থেকে এই শস্য ভাণ্ডারের দেশকে রক্ষা করার জন্য ভগীরথ নদী কেটে গংগার প্রবাহকে দ্বিমুখী করে দেন—ক্রমে মধ্যভারতীয় আর্য সভ্যতা বাংলাকে এসে আশ্রয় করে। এই দেশ, কাহিনীর দেশ হয়ে ওঠে; পরমত সহিষ্ণু দ্রাবিড় ও মঙ্গোলীয় শ্রেনীর স্বদেশবাসীগণ আর্যদের নিসর্গপ্রীতিতে মুগ্ধ হয় এবং ক্রমে গোষ্ঠীজীবন থেকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক পৈঠায় উত্তীর্ণ হয় ও আদি অবিকশিত মনোবৃত্তির স্ফুরণ ঘটে—আর্য-অনার্য কিংবদন্তী ক্রমে অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে—মধ্য ভারতীয় ও পশ্চিম ভারতীয় সভ্যতায় একটা আঞ্চলিক রূপ গড়ে ওঠে। এই ভাবে স্বানু জীবনে নানা কিংবদন্তী এবং অতীত রহস্য তথা Mythology হয়ে ওঠে প্রয়োজনীয় বিকাশের পক্ষে অপরিহার্য। ভারতীয় Mythology সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে 'বাংলার' জলবায়ু পেয়ে—এবং তার জনপ্রিয় রূপ বাংলা থেকেই আবার বাইরে ছড়িয়ে পড়ে, এমন কি সুদূর জাভা দ্বীপপুঞ্জেও তা ছড়ায়। বাংলা দেশের অনার্য কাহিনী চীন দেশ হয়ে সুদূর উত্তর দেশেও ছড়িয়েছে বলে আজকাল সংবাদ পাওয়া যায়।

কিন্তু দ্রাবিড় ও মঙ্গোলীয়গণ স্বভাবে উদার এবং পরমত সহিষ্ণু হলেও তাদের জাতিগত নির্মিতি এবং বুনিয়াদ ছিল শক্ত। পরাজিত জীবনের এবং সাংস্কৃতিক অবদমনের গ্লানি দুর্ভরক্লান্তি থেকে মুক্তি পেতে স্থানে স্থানে এদের মধ্যে একটা প্রয়াস দেখা যায়। যারা হিমালয়ের পাদভূমিতে এবং উত্তরাঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছিলেন তাদের মধ্যে এই প্রয়াস হয়ে ওঠে সক্রিয়। এই সময় ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে অনার্য সংস্কার ঢুকে তার আর্য চেহারার চীর ধরায়। ফলতঃ এই পরিস্থিতির মোকাবেলা করার মত শক্তিশালী আর্যপুরুষ না থাকায় ব্রাহ্মণদের অস্ত্রধারণ করতে দেখা যায়—এবং সকল ক্ষত্রিয় কার্যে এদের এই অযাচিত উপস্থিতি বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যকার সম্পর্ক নির্ণয়ে তথা রাজনীতি ও কুটনীতিতে অভিঘাত সৃষ্টি করায় ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে জনগণের পাশে এসে দাঁড়ান। বলা

বাহুলা, জনশক্তির চাপেও ব্রাহ্মণদের পরাজয় সম্ভব হয় নি। কিন্তু বিদ্রোহীরা ব্রাত্য উপাধি লাভ করেও নানা দিক থেকে সে সংগ্রাম চলিয়ে যায়। বুদ্ধদেব, মহাবীর প্রভৃতির ধর্ম প্রচারের কারণ এখানেই। প্রসঙ্গতঃ বলা দরকার যে, ব্রাহ্মণ বনাম ক্ষত্রিয় ও অনার্যদের এই সংগ্রাম ধর্ম, সংস্কৃতি, রাজনীতি এবং অর্থনীতি—সকল দিক থেকেই হতে থাকায় 'বাংলা দেশের' পক্ষে এতে অংশগ্রহণে সুবিধা হয়। তবে নানাকারণে 'বাংলাদেশ' বুদ্ধবাণীকেই গ্রহণ করে নেয়, জৈন ধর্মকে নয়।

এই ভাবেই বাংলাদেশে আর্যপ্রভাবকে অস্বীকার করার ঢেউ ওঠে এবং কেন্দ্রীয় ব্রাহ্মণ্য-শক্তির প্রভাবের বিরুদ্ধে বাংলা দেশই প্রথম বিদ্রোহ করে' 'নারকীয় ভূমি' এই আখ্যা লাভ করেঃ কিন্তু তথাপি এই কারণেই "বাংলাদেশ" আজো "স্বর্গাদপি গরিয়সী"। এই সময়কার-ঘটনা, খ্রীষ্টীয়-৬ষ্ঠ শতকে ত্রিপুরা অঞ্চলেও বৌদ্ধধর্ম তথাকার রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে সপ্তম শতকে সমতটের খড়গ বংশীয় রাজারা সকলেই বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করেন এবং অষ্টমশতক থেকে বাংলার কোলরাজারা বৌদ্ধধর্মের নবঅভ্যুত্থানে সাহায্য করেন। খ্রীষ্টীয় ১০ম শতাব্দীতে যখন মাগধী প্রাকৃত ভাষা এবং গৌড় প্রাকৃত ভাষার অপভ্রংশ থেকে অভিনব বঙ্গভাষা ও অন্যান্য-দেশীয় ভাষার উদ্ভব হয়, তখন বাংলা দেশের প্রায় সর্বত্র বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু বাংলা ভাষা সৃষ্টি হতে না হতেই এই নতুনভাষার স্রষ্টা শিল্পী এবং পৃষ্ঠপোষকগণ এদেশ থেকে বিতাড়িত হন। অথচ আশ্চর্য এই যে, আমরা আজ সেই বিতাড়িত শিল্পীদের ভাষায়ই কথা বলছি এবং এ ভাষাকে প্রতিষ্ঠা দেবার জন্য কতই না সংগ্রাম করছি।

কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে, তারা যে কারণেই বাংলাদেশ ছেড়ে নেপালে গিয়ে বাংলা ভাষা চর্চা করুন না কেন, এরকমটা যে ইতিহাসে আর হয়নি তা নয়। বাংলা দেশ যে রোমান্টিক সাহিত্যের জন্ম দেয়নি, আরাকান মুল্লুক তা দিয়েছে। যার জন্য আলাওল, দৌলত কাজীর কথা উল্লেখ না করলে বাংলা সাহিত্যের কথা সম্পূর্ণ হয় না। ঠিক সেই রকমই অনেকটা আমি কল্পনা করি যে, বাংলা দেশে চর্যাপদের চর্চা না হলেও নেপালে তা হওয়া অসম্ভব

কিছু ছিল না এবং সেকালে মগধ ও বঙ্গের সীমানা থেকে নেপাল এমন কিছু দূরে ছিল না। অঙ্গ-বঙ্গের নানা গোলযোগের অন্তহীন অব্যবস্থিত অবস্থার কারণে বাংলা দেশে ব্যক্তি অভ্যুত্থান কার্যকরী হইতে পারেনি; উপরন্তু নেপালের সুস্থ শাসন ব্যবস্থা সেই সব সমাজ সচেতন ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতা করতে পেরেছিল বলে বহুভাষা ও দর্শনে জ্ঞানী বাঙ্গালী পণ্ডিতবর্গ নেপালে গিয়ে বাংলা ভাষার প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলেন।

আর্য-অনার্যদের প্রথম জাতীয় সংঘর্ষ সংস্কৃত সাহিত্যের জন্ম দেয়, লেখা হয় মহাভারত এবং রামায়ণ। উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারতের সংঘর্ষের কাহিনীগুলো রামায়ণ এবং মধ্য ভারত ও সমগ্র ভারতের সংঘর্ষের কাহিনী হলো মহাভারত। এই উভয় কাহিনী তথাপি রূপকাশ্রিত অর্থাৎ কোন গ্রন্থের কোন চরিত্রই মহাকাব্যের বিস্তৃত সুবিধা সত্ত্বেও সরাসরি বা Direct নয়। রূপকের মাধ্যমে তাদের বক্তব্য বলা হয়েছে। Mythology-র জন্ম সেখানেই। রূপকের এবং উপমার ব্যবহার যদি চিন্তা মনন ও বিদগ্ধ অভিজ্ঞতার স্তর থেকে আসে এবং বিস্তৃত জীবনের ওপর এর কোন অনিবার্য প্রভাব বিস্তারের অবকাশ থাকে, তবেই তা উপকাহিনীর বা তুল্যকাহিনীর বা দ্ব্যর্থকাহিনীর সত্ত্বা নিয়ে হয়ে উঠে mythology। রামায়ণ-মহাভারত সেই অর্থে mythology তে পূর্ণ। সে তুলনায় Iliad বা ওডেসী অনেক বাস্তব এবং সরাসরি। গ্রীক-মাইকোনিয়াণ সংস্কৃতির সংঘর্ষের সরাসরি চিত্র এই দুই মহাকাব্য।

কিন্তু তথাপি এই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুই মহাভূখণ্ডের দুই মহাকাবের বিষয়বস্তু ছিল এক, উভয়েরই মূখ্য উদ্দেশ্য অনীহাজগতের মোড়ে মোড়ে অনির্বাণ প্রদীপের মত আদর্শ কোন মানবের প্রতিষ্ঠা করা। আর সেই আদর্শ সমাজের নিম্নস্তরের সংস্কারকে যেমন ভেংগে ফেলে, উচ্চস্তরের সংস্কারকেও তেমনি কটাক্ষ করে আর এই সর্বস্তরে কটাক্ষপাত ও চাবুক হানবার জন্য কেবল ভাঁড় চরিত্রই পর্যাপ্ত বিবেচিত হয় না, সমাজ সচেতন ব্যক্তির উদ্বোধনেরও প্রয়োজন ঘটে।

মহাকাব্যে সমাজসচেতন ও ব্যক্তিত্বশীল ব্যক্তি প্রয়াস সংগ্রামমুখী এবং নিয়তি বিরোধী। গীতিকাব্যে তার প্রকাশ কি রকম ঘটে তার পরিচয় একটু ভিন্ন। এই ভিন্নতাটুকুই হচ্ছে সমাজ বিকাশের ক্ষেত্রে একটি চমকপ্রদ-ঘটনা।

আমরা আগেই একথা প্রমাণ করতে চেয়েছি যে, বাংলাদেশে প্রথম ব্যক্তিচেতনা দেখা দেয়। কিন্তু এদেশে তখন মহাকাব্য লেখা হয়নি কেন-এর উত্তরেই পাওয়া যাবে চর্যাপদ দিয়ে কেন বাংলা সাহিত্য আরম্ভ হলো।

আমার মনে হয় মহাকাব্য লেখার আগে জাতিগত যে সংঘর্ষ আসে তা পরিপূর্ণ হতে হয় এবং সময় সাপেক্ষে সমাজের পরবর্তি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন-গুলির কালে সেই পূর্ব সংঘর্ষের স্মৃতির নানা অর্থে প্রয়োগ এবং বিশ্লেষণের প্রয়োজন পড়ে যা কেবল সেই সমাজেই সম্ভব যার সামাজিক মূল্য গুণগত না হলেও পরিমাণগত দিক থেকে ক্ষীয়মান হয় নি। কিন্তু নব উদ্বুদ্ধ বা নব-গঠিত সমাজের পক্ষে তা সম্ভব নয় কারণ সে সমাজে গুণগত প্রবৃদ্ধিই প্রধান এবং ব্যক্তিত্বের তথা বুদ্ধির বিকাশই তার মূল কথা। এই ব্যক্তিত্ব বা ব্যক্তিভাবনা মহাকাব্যের রূপ নিতে পারে না; তা গীতি কাব্যেই ভেংগে পড়ে, কিংবা বড় জোর আখ্যানকাব্য পর্যন্ত, গড়াতে পারে। 'অদুনারে বিভা কইরা পদুনা পাইলা দানে' এই যে মহীপালের গীত, এটাও চর্যাপদের সমসাময়িক রচনা, কিন্তু তাতেও ব্যক্তি ভাবনা বড় যার জন্য ছেলে মায়ের সতীত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে সাহস পায়। মহাভারতে কর্ণের সে ক্ষমতা নেই কুন্তীর বিরুদ্ধে সে অভিযোগ আনে। কর্ণের সকল দম্ভ মহাকাব্যে যথোচিত গাম্ভীর্য আনে, কিন্তু তার ব্যক্তিত্বকে বিকাশ করায় না। মাইকেলের মেঘনাদবধ কাব্যে এক রাবণের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল, তাও বীররসের আওতার বাইরে গিয়ে। বস্তুতঃ সেখানেই মূল রামায়ণ। কিন্তু সেই প্রকৃত রাবণ নিয়ে মহাকাব্য রচিত হতে গেলে সমাজকে প্রকৃতির ঔদাসীন্য বহু আগেই ছেড়ে দিতে হতো, তা'হলে সামাজিক কোন কারণেই সমাজকাহিনীকে বৃহত্তর অর্থে দেখার প্রয়াস জাগতো না মানুষের, অর্থাৎ মহাকাব্য লেখা হতো না।

মহাকাব্য মৃত্যুর মত অমোঘ, গীতিকাব্য তার সম্ভাবনা মাত্র। মহাকাব্য সমাজকে আশ্রয় করে মানুষকে দাঁড় করায় অথবা মানুষকে দাঁড় করিয়ে আবার ভেংগে ফেলে কিন্তু গীতি কাব্য মানুষকে আশ্রয় করে বরং বলা যাক মানুষের অন্তরকে আশ্রয় করে সমাজের অভ্যন্তরটুকু নকশা আঁকে বা তার সংকেত করে। গীতি কবিতা যতই পূর্ণতা পেতে থাকে ততই সে সমাজমুখী হয় এবং মহাকাব্য

হতই পূর্ণতা পেতে থাকে ততই সে বিজ্ঞনমানসকে প্রতিফলিত করতে থাকে। হোমর থেকে ভার্জিল, ভার্জিল থেকে মিলটন এবং মিলটন থেকে আধুনিক কালে যিনি নেপোলিয়নকে নিয়ে মহাকাব্য লেখেন তাদের ধারাটা বিশ্লেষণ করলেই তা ধরা পড়ে কিংবা গ্রীক প্রমিথিউসবাউণ্ড শেলীর আনবাউণ্ড, আঁদ্রে জিদের মিসবাউণ্ড এবং আমাদের মেঘনাদবধ কাব্য তো তার হিসাব মেলাবার ডেস্ক হিসাবে রয়েছেই।

সুতরাং আমার বক্তব্যে আমি বোধ হয় সত্য যে,

(১) আর্য সংঘর্ষের ফলে মঙ্গোলীয় জাতি এ দেশবাসীরা গোষ্ঠী জীবন থেকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবনে উত্তীর্ণ হয়;

(২) ফলে, আর্য সভ্যতার মধ্য ভারতীয় রূপের অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তন ঘটে এবং সেই পরিবর্তিত সভ্যতার পীঠস্থান এই 'বাংলা দেশ' পরবর্তীকালে বহির্জগতকে মুগ্ধ করে ও এই ভাবে আর্য-বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়;

(৩) এ দেশে সেই অবস্থায় Mythologyগুলি প্রয়োজনের খাতিরে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যার শেষ পরিণতি বর্তমানের মূর্তিপূজা; এবং তার আগে বৌদ্ধধর্মে আস্থা রেখে সংস্কৃতিচর্চার অবাধ সুযোগ গ্রহণ; ফলে –

(৪) ব্যক্তিভাবনার প্রকাশের জন্য গীতিকাব্যধারার উৎসই আদি বাংলা কাব্যের উৎস হিসাবে উন্মুক্ত বাতায়নপথ রচনা করে;

(৫) কিন্তু মহাকাব্যের রূপকাশ্রিত হবার স্বভাব এবং প্রয়োজনীয়তা এই গীতিকাব্যধারায়ও না থেকে পারে নি, কারণ সরাসরি বলার ফলাফল এই প্রগতিবাদী বুদ্ধিজীবিদের পক্ষে এ যুগের মতই অনেকটা কষ্টবহ ছিল সে যুগেও। রাজন্যবর্গকে চিরদিনই প্রতিভাবানরা এড়িয়ে চলেছে – এমন কি বার্ণার্ড 'শ পর্যন্ত; শেলী বায়রণ নজরুল নাজিম-এরা ব্যতিক্রম হতে পারেন মাত্র।

এবারে আমার বক্তব্যের দ্বিতীয় ভাগে আসি। প্রথম ভাগে চর্যাপদের ইতিহাসকে আশ্রয় করে যে সাহিত্যিক ইতিহাস খুঁজতে চেয়েছি তাতে উপরোক্ত পাঁচটি সত্য পাওয়া সম্ভব বলে মনে হয়েছে। কিন্তু এগুলি উদ্দিষ্ট মানবিক

ইতিহাসের পাঁচটি সূত্র মাত্র। এখানেই আমি থেমে যেতে পারতাম কিন্তু সূত্রের চেয়ে, ইতিহাসের চেয়ে মানুষটাই বড় বলে এবং তাকেই সামনে রেখে এ খসড়া প্রস্তুত করতে হয়েছে বলে, সেই মানুষের আবিষ্কারটাই আমাদের কাছে বড় কথা।

স্বীকার করতে দোষ নেই যে চর্যাপদ "কেবল ধর্মতত্ত্ব নয়, আনন্দের ধ্বনিও"। আনন্দ জীবনের স্বতোৎসারিত আকুতি। জীবনের সুখ-দুঃখের অতীত এই আনন্দ—অদ্বৈতম্ সুখ দুঃখয়োঃ। এই কারণেই চর্যাপদ ও বৈষ্ণবগানে পার্থক্য। কেবল তত্ত্ব ও প্রকাশভঙ্গীর দিক থেকেই নয়। বৈষ্ণবগানে গোষ্ঠীচিত্র ছাড়া রাধাকৃষ্ণ অস্থায়ী। চর্যাপদে ডোম্বীর কুঁড়ে ঘরের খোলা দরজা ইবসেনের নোরার খুলে দেওয়া দরজার চেয়ে কম বাস্তব নয়। চর্যাপদের ভব ও নির্বাণতত্ত্ব মানুষকে আবদ্ধ রাখে না—অবিদ্যায় বাধা পড়লেই—

হরিনী বোলই—এ হরিণাঃ শুন তো।
এ বন ছাড়ি, হোহু ভান্তো॥

চর্যাপদের এ অধিকার কোত্থেকে এলো এ প্রশ্নের সঠিক জবাব আমি ভেবে পাই না। ঐ কবিতারই প্রথম চরণে দেখুন ঃ

কাহে রে ঘেণি মেলি অঁাছো হো কীস
বেঢ়িল হাক পড়ই চৌদিস॥

এই যে চারিদিক বেড়িয়ে হাঁক পড়েছে, তার মধ্যে কি মায়াজালে মুগ্ধ হয়ে পড়ে থাকতে কেউ পারে? আশ্চর্য নকীবি হাঁক। তবু এই নকীব সমাজবন্দী,—সমাজে স্বেচ্ছায় ইতস্তত সে চরণ ফেলতে পারে না। মাইকেলের নারী চরিত্রগুলির মত এরাও যেন কিসের সংস্কারে বন্দী। তাই এদের জীবনে জটিলতার অন্ত নেই, আর সেই সব জটিলতার বিরুদ্ধে এদের ক্ষোভও যেন অনন্ত, তাই এত উপমা এত রূপক দিয়ে এদের মনের জ্বালা এরা ঢেকে রেখেছে—যথার্থ সমব্যথী হলে হয়ত তা জানতে ইচ্ছে করবে, তার জন্য নির্দেশ আছে 'গুরু পুচ্ছিঅ জান'। অন্য উপায় নেই। বঙ্গীয় সিদ্ধাচার্যদের প্রণীত এই সব গীত ধর্মের সারতত্ত্ব আশ্রিত হয়েও বিচিত্র রূপের আভায় তা মণ্ডিত। একই উপমায় বা একই চিত্রকে নিয়ে গতানুগতিক রচনা এগুলি নয়। সমাজের অস্থিরতার প্রতিটি

তরঙ্গ এখানে ঘুমিয়ে আছে। তাদের জাগালেই বোঝা যাবে ব্যথার অনন্ত সমুদ্রের বীচিভঙ্গের আস্বাদ। গ্রীক ট্রাজেডীই কেবল তার একমাত্র উপমা।

বাংলা দেশে জয়দেবই প্রথম গীতি কবিতার আধিপত্য বিস্তারে সাহায্য করেছে কিন্তু, লক্ষ্য করার মত যে, চর্যাপদগুলি জয়দেবের কোন কাব্যেরই সমধর্মী নয়। জয়দেবে প্রেমলীলাই প্রধান এবং মূলতঃ তা রোমান্স ধর্মী। চর্যাপদ সে তুলনায় বাস্তবতাবাদী এবং বোধিজ্ঞানে সমৃদ্ধ। মুনিদত্ত চর্যাপদের যে ব্যাখ্যা করেন অর্থাৎ যে 'বৃত্তি' লেখেন, তাতে চর্যাপদের বাস্তবতার মূল্য প্রায় উহ্য থেকে গেলেও তাতে আর একটা নতুন তথ্য পাওয়া যায় যে, চর্যাপদ মানুষের রক্ত দিয়ে তৈরী যার জন্য এগুলি মানুষের শ্রেষ্ঠ মোহন বাণী বলে কীর্তিত অথচ উপনিষদের মতই এগুলি প্রায় দৈববাণী বা দৈব রচনা বলে মনে হতে পারে সহজেই।

মানুষ কি করে মানুষের এই মোহনবাণী সৃষ্টি করলো এবার তার পরিচয়টুকু নেওয়া যাক।

১। অতি-আধুনিককালের সাহিত্যের যা প্রধান লক্ষণ—'জীবনে জীবন যোগ করা' তখনকার সাহিত্যে তা চেষ্টা করে আনতে হয় নি, স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই তা প্রকাশ পেত।

২। প্রাচীন সাহিত্যে এই বস্তুনিষ্ঠা আকস্মিক প্রেরণা হয়ে আসেনি ; এটি তার মৌলিক বিকাশ। কারণ তখনকার একমাত্র সাহিত্যের ভাষা সংস্কৃতে প্রত্যক্ষ জন-জীবনের সংগে যোগের অভাবে জীবনের এই উদ্বোধন সম্ভব ছিল না। লৌকিক ভাষার সাহিত্য তাই এই মৌলিক আবেদনে সাধারণ মানুষের হাসিকান্না, মান অভিমান, প্রেম বিরহের ছবি স্বচ্ছন্দে অমায়িক করে তুলতে পারতো। বাংলা সাহিত্যে এইটি আরো সম্ভব হয়েছিল এই জন্যে যে চর্যাগীতি-কারগণ প্রায় সবাই ডোম হাড়ি শবর প্রভৃতি নিম্নশ্রেণী থেকেই এসেছিলেন এবং "এসব সাধক ছিলেন সাধারণ মানুষের নিকটতর।"

সম্পূর্ণ ধর্মীয় ও রাষ্ট্রনৈতিক কারণ হলেও, তখনকার সামাজিক পটভূমি জানতে

পারলে ক রিস্ফুট হবে। সামাজিক এই পরিপ্রেক্ষিতেই আমরা চর্যাগীতি-গুলির মানবিক ধারাটাকে রেখান্বিত করতে পারবো।

আগেই বলেছি চর্যাপদগুলি একটা transitional period-এর রচনা। এবং যুগসন্ধিকালের বিদগ্ধ মানুষেরা সাধারণ মানুষের চেয়ে অধিকতর সচেতন হয় এবং তাদের প্রকাশবেদনা তাদেরকে রূপকধর্মী করে তোলে যার জন্য 'গুরু পুচ্ছি অ জান' এ হেন দাম্ভিক উক্তি উচ্চারণ না করে তাদের উপায় থাকে না। কারণ একটা গূঢ় উদ্দেশ্যই সেখানে সক্রিয় থাকে, চর্যাগীতিগুলির মূল্য সেখানেই। কিন্তু চর্যাগীতিতে কবিরা এতদসত্ত্বেও বাস্তববাদী এবং সমাজমন সেখানে পলায়নী মনোবৃত্তি গ্রহণ করে নি। বাঙালীর বাগবাহুল্য ভরা কাব্যে পরবর্তী কালে এগুণ দুষ্প্রাপ্য।

এর কারণ, সে সমাজ-মন লক্ষ্য করেছে, রাজদরবারের বিলাস স্রোত সমস্ত দেশকে ছাপিয়ে তুলছে; লক্ষ্য করেছে, ধর্মের নামে অনাচার, কুৎসা, দেখেছে নিজের জীবনের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ।

কেননা একদিকে বর্ণভেদ ও সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা সমাজ ও কৃষিজীবনের শান্ত নিবিড় নিরালা ধারাকে দুর্বল করে তুলেছিল, অন্যদিকে বৌদ্ধধর্ম যে বণিক সভ্যতাকে আশ্রয় করে জেগে উঠেছিল, তাদেরকেই বল্লালসেন সমাজে পতিত করেছিলেন ও অসৎ শূদ্র পর্যায়ে ফেলে ছিলেন।

স্বভাবতই তাই সমাজে বণিত শ্রেণীর প্রাধান্য লোপ পেয়েছিল। এই ভাবে সমাজের প্রত্যেক স্তরে অত্যাচার জীবনকে বিষের মত করে তুলেছিল। কবি বারের কবিতায় সে কথা মূর্ত হয়ে উঠেছে, যেখানে দরিদ্র গৃহিণী চোখের জলে গাল ভাসিয়ে প্রার্থনা করছে যেন এক মান তণ্ডুলে এক শ' দিন চলে যায়ঃ

দীনা দুঃস্থকুটুম্বিনী পরিগলদ বাষ্পাম্বুধৌতাননা
পোকং তণ্ডুল মানকং দিনশতং নেতুং সমাকাঙ্খিতি।।

এই ছিল তখনকার মানুষের অবস্থা তথা সমাজ চিত্র। এই সমাজেরই অন্যদিকে বাঙালী ব্রাহ্মণ গর্ব করেই বলে,

নাস্মাকং জননী তথোজ্জলকুলা সচ্ছোক্রিয়ানাংপুনং
ইত্যাদি। অর্থাৎ,

আমার জননী তেমন সৎকুল থেকে আসে নি...ইত্যাদি। এই অনাচার সমাজের সর্বাঙ্গেই ছিল। ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার গবেষণা করে দেখান যে, ধর্মকর্ম ও দেবালয়কেও এই অশোভন যৌন বিহার স্পর্শ করে এবং একে আশ্রয় করে সামাজিক ক্রিয়াকর্মে প্রসারলাভ করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেবদাসীরা দেবসেবার অন্তরালে সামাজিক উচ্চবর্ণ সমূহের ভোগলিপ্সার ইন্ধন যোগাত। এই বিচিত্র সমাজ; যেখানে একদিকে নিয়ম-নিষ্ঠা, আচার এবং অন্যদিকে সমাজ, অনুমোদিত অনাচার ব্যাভিচারঃ একদিকে শিল্পসাহিত্যানুশীলন অপর দিকে সাংস্কৃতিক অধঃপতন; একদিকে সামাজিক উচ্চবর্ণের বিলাস কলুষিত আড়ম্বর, অন্যদিকে দারিদ্রের মলিনতা; একদিকে ধর্মাচার ও অন্যদিকে ধর্মগত উৎপীড়ন ও ভেদবিচার এমনি যে সমাজ, তার থেকে সাধারণ মানুষ সেদিন বিদ্যাবুদ্ধির জোরে মুক্তি চেয়েছিল। অবিদ্যাকে ধ্বংস করার আন্দোলনে তাই নীচের এই লাইনটি প্রায় স্লোগানের (slogan) কাছাকাছি—

এবং কার দিঢ় বাখোড় মোড়িঅ
বিবিধ বিয়াপক বন্ধন তোড়িঅ।

সমাজের এই পটভূমিতে সহজেই বোঝা যায় যে, নিম্নবর্ণের বা নিম্নশ্রেণীর লোকদের জীবন আস্বাদনের কোন উপায় তখন ছিল না—জীবনের মুক্তিও ছিল না কোথাও। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সামাজিক স্তর যারা সমাজের অর্থ নৈতিক জীবনের সংগে বিশেষ ভাবেই জড়িত ঃ যেমন, স্বর্ণকার, সুবর্ণবণিক, চিত্রকর, চর্মকার ধীবর, রজক, প্রভৃতিরও সামাজিক মর্যাদা ছিল না। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, এরা কখনো প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথে এগিয়ে আসেনি। এর কারণ হয়তো বা গ্রাম নির্ভর গণ্ডীবদ্ধ জীবনে ধর্মপ্রদত্ত প্রত্যক্ষ ফলভোগের কামনার চিন্তাটাই প্রথমে মনে আসে বলেই। "তাদের কামনা লোকায়ত ধর্মমত ও পথকে আশ্রয় করে অভিব্যক্ত হয়েছে।" তাই সমাজকে শাসন না করে তারা শাসন করতে চাইল তাদের চিত্তকে।

জরাগ্রস্ত সমাজ মানবিকতার কোন মূল্য দেয় না, সুখের আশাকে অংকুরিত হতে দেয় না—জীবনকে সৃষ্টি করার প্রেরণাও এখানে অবরুদ্ধ। তাই বনের স্বাধীন হরিণীর মুখ দিয়ে কবি বলেন,

হরিণী বোলই এ হরিণা, শুন তো।
এ বন ছাড়ি হোহু ভান তো ।।

এ বন ছেড়ে দূরে যাবে, কিন্তু সেই দূরের আশ্রয় কি? সেইটেই হচ্ছে বুদ্ধ প্রদর্শিত নতুন জীবনাদর্শ, সেই ভব ও নির্বাণতত্ত্ব, সেই অবিদ্যার ধ্বংস, সেই মিথ্যা সংস্কারের চক্রজাল থেকে মুক্তি।

এই মিথ্যা থেকে বাইরে আসার আকুতিতে মানুষের চোখে গার্হস্থ্য জীবন থেকে নিয়ে নাট্যমঞ্চ পর্যন্ত সন্দিগ্ধস্থল হয়ে উঠেছে, তাই তারা কল্পনা-প্রবণ হতে পারেনি। আর এমনিতেও দ্রাবিড় মঙ্গোলীয় জাতি অত্যন্ত কঠোর ও বাস্তব-বাদী। এরই ফলে, বধূর চিত্র আঁকতেও কবি কুক্কুরী পাদের লজ্জা নেই' যেমন—

সুসুরা নিদ গেল বহুড়ী জাগঅ
দিবসই বহুড়ী কাড়ই ডরে ভাঅ
রাতই ভইলে কামরু জাঅ ।।

শবর জীবন চিত্রেও বাস্তব দৃষ্টি ঘোলাটে হয়নি, যেখানে চীনাধান পাকার সময় উৎসব করার কথা কবি বলেছেন। প্রেমের চিত্রেও শবরাচার্য এক অদ্ভুত চিত্র এঁকেছেন, আজকের সাহিত্যেও তেমন নায়িকার অভাব একান্ত অনুভূত হয়।

উঁচা উঁচা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী
মোরঙ্গী পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী ।।

বীণপাদের পদে সেকালের নাট্য ও গীতের যে উল্লেখ আছে বা ভুসুকের পদে যে জলদস্যুর অত্যাচারের কাহিনী প্রভৃতি পাই, তার প্রত্যেকটি কথা থেকে প্রাণের এক অসহ্য রোণাজারী চীৎকার যেন শোনা যায়, কাহ্নপাদ সেখানে বাঙালীরা মাছ খায় এই হাস্যরঙ্গ করেও তল পান না।

কিন্তু তথাপি চর্যাপদকে যে 'আনন্দের ধ্বনি' বলেছি তার কারণ চর্যাপদেই প্রথম আমরা মানুষকে পেয়েছি মানুষ হিসাবে—যে মানুষের মধ্যে জাতবর্ণ নেই, এমন কি বিবাহ ও যৌনবন্ধনও যাদের মধ্যে শিথিল। বাংলার এমন যে প্রাকৃত মানুষ সে মানুষ যদি অমর না হয় তবে মানুষ হিসাবে আর কাকেই বা শ্রদ্ধা করবো? আর যে কবিরা তাঁরা সিদ্ধাই হোন আর হাড়ি চণ্ডাল ডোমই হোন দেবতাকে রেখে যে সেই মানুষকে এঁকেছেন সেই মানুষের ভাষা দিয়েই—সেই কথাটি কি এতই তুচ্ছ করার মত?

রবীন্দ্রমানসে সৌন্দর্যবোধ

(১)

সৌন্দর্য বোধ :

কোন অজ্ঞাত কারণে মানুষ সৌন্দর্যবোধের একতম অধিকারী। সভ্যস্তরে এসে পৌঁছুতে মানুষকে আরো দুটি স্তর পার হয়ে আসতে হয়েছে; কিন্তু সমাজ বিজ্ঞানীরা মানব সমাজের অগ্রগতি এবং সংগ্রামী মনকে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করতে গিয়ে একটা সত্যের ওপরই বেশী জোর দিয়েছেন, সেটি একটি অনুভূতি মাত্র। সৌন্দর্যানুভূতি ব্যতীত মানুষের সম্প্রসারণ কিংবা ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ অসম্ভব। আধুনিক দেহ-বিজ্ঞানীদের শুভগবেষণা মানুষের এই দিকটির সুবিশাল প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে নিয়েছে এবং এর ব্যবহারিক মূল্য আজ আর রূপকের গণ্ডীকে ছাড়িয়ে যেতে দ্বিধা জানায় না। দেখা গেছে "খঞ্জন" যতই কেননা বিসদৃশ হোক, 'খঞ্জন নয়নার' প্রভাব সর্ব মানবে প্রবল। কিন্তু তথাপি আবার কোন অজ্ঞাত কারণেই The causes and conditions of beauty and sublimity seems to be still unsettled. (Forbes).

আজ বস্তুবিশ্বে অস্তিত্ববাদী এবং বস্তুবাদীদের দৃষ্টিভূমিতে প্রাচীর উঠেছে। বস্তুবিশ্বের অংগে অংগে অসীম একের অভিব্যক্তির বেদনায় যারা আস্থাশীল তাঁরা এই কথা বলে সাবধান করেছেন যে চা খাওয়ার আনন্দ এবং কবিতাপাঠের আনন্দ এক হওয়া সম্ভব নয়। অন্যদিকে শ্রীমতি বেভোয়ার বা সার্ত্রের সাম্প্রতিক রচনাদিতে পাওয়া যাবে অস্তিত্ববাদীর প্রচণ্ড পরাভব, কেননা তার লক্ষ্যই মরীচিকা প্রতিম। অস্তিত্ববাদের অন্তিম কুয়াশা-উৎকীর্ণ জিজ্ঞাসাঘাত, ব্যবহারিক অর্থে ব্যর্থ।

সৌন্দর্য সম্পর্কে এ দুয়ের বিভেদের সূচনা এখানেই; এখানেই প্রশ্ন উঠেছে সৌন্দর্য-বোধ অভিজ্ঞতা নির্ভর কিনা অর্থাৎ সৌন্দর্যানুভূতি মানসিক কিনা। হেগেলের যুক্তি-

Beauty is made vital in appearance. কারো বা যুক্তি-It is objective (কডওয়েল)। আবার কেউ বলবেন বস্তুবিশ্বের মানুষের অস্তিত্বটাই বড়ো কথা এবং বিশ্বের বস্তুপুঞ্জের সাথে মানুষের চিৎশক্তির এক গভীর ঐক্যবোধেই সৌন্দর্যানুভূতির কারণ সঞ্জাত। (ক্রোচে)।

সৌন্দর্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণা ভারতীয়১ এবং তিনি পাশ্চাত্য দার্শনিকের বহু উক্তি খণ্ডন করেছেন (ক্রোচের প্রকাশতত্ত্বকে কবি মেনে নিতে পারেন নি)। হেগেলের বস্তুর আধার (determinate content of real particularity) রবীন্দ্র সৌন্দর্যবোধের উৎস হতে পারে নি ; বরং তা উপলক্ষ্য মাত্র। বস্তুর আকার অতিক্রম করে বিশ্বের অন্তরে যে অখণ্ড আনন্দময় সত্তার লীলা তার বিচিত্রতাই মানুষের রূপসৃষ্টির অন্তবর্তী সত্যকে প্রকাশ করে। তখনই ভেতরের মানুষ বেড়ে ওঠে, রাঙিয়ে ওঠে, রসিয়ে ওঠে। তাই রবীন্দ্রনাথে পাই—'স্থূল আবরণের মৃত্যু আছে, অন্তরতম আনন্দময় যে সত্তা তার মৃত্যু নেই।' (মানুষের ধর্ম)।

(২)

সৌন্দর্য বোধের বেদনা ও সৌন্দর্য ভোগ :

রবীন্দ্রনাথ সুন্দরকে নাম দিয়েছেন 'অরূপ' বলে। তিনি বলেন, 'অরূপকে দেখে গেলেম দুটি নয়ন মেলে।' রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যবোধের মূলে এই নয়ন মেলে দেখার তাগিদ স্পষ্ট। কবির জীবনাবেগ এখানে কতখানি সক্রিয় তা' বোঝা যায়।

কিন্তু দেখে যাওয়াতেই সার্থকতা নেই। রবীন্দ্রনাথের জীবনদৃষ্টি তাই রসদৃষ্টির এবং রসসৃষ্টিরও ; একদিকে আনন্দের আর একদিকে বেদনার অপরিসমাপ্তির ইংগিত।—'সুন্দরকে ভোগ করিয়া শেষ করা যায় না, তাই তাহার মধ্যে একটি অপরিসমাপ্তির বেদনা আপনা হইতেই থাকিয়া যায়।' দুঃখকে শুধু স্বীকার করে নয় বরণ করে নিয়েই কবি তার ভেতর থেকে আনন্দের সন্ধান করেছেন।

---

(১) প্রবাস জীবন চৌধুরী : রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও সৌন্দর্য সম্বন্ধে মতামত ভারতীয় দর্শন দ্বারা প্রভাবান্বিত। তিনি বহুস্থলেই উপনিষদের বাক্য উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার কোনো মতের গভীরতা সম্বন্ধে আমাদের নিশ্চিন্ত করিয়াছেন। (পৃঃ ৮)

রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টির অনুতে অনুতে অনন্ত সৌন্দর্যের আভাস লক্ষ্য করেছেন ; তাই তাঁর বেদনার অন্ত নেই। এ দুঃখে কবি পীড়িত নন, অভিভূত। "এ দুঃখের মধ্যে বিক্ষোভ নাই, শান্তি আছে।"১

অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই সাহেব 'সুন্দর' তত্ত্বে কিংবা আনন্দে কোথায় সুলভ এ প্রশ্নের যে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন এখানে তা প্রণিধানযোগ্য। তাঁর উক্তি : 'এ সুন্দরকে পাওয়া যায় না, তবে অনুসন্ধান করতে গিয়ে ধীরে ধীরে মনের স্তর তৈরী হতে থাকে—আমাদের অজ্ঞাতে।'২ স্তর কথাটি এখানে লক্ষ্যণীয়। এই স্তর ভাগ রবীন্দ্রনাথেও পাওয়া অসম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য সন্ধানের একস্তরে যে রসদৃষ্টি তা এক অর্থে পূর্ণ', অর্থাৎ—'রসের দিক হইতে ইহাই যথেষ্ট। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রস জীবনের সঙ্গে সঙ্গে আর একটি জীবনও ধীরে ধীরে অলক্ষিতে গড়িয়া উঠিতেছিল, এটি তাঁর অধ্যাত্মজীবন। কবির এই অধ্যাত্ম-জীবন তাঁহাকে শুধু কেবল সৃষ্টির সৌন্দর্যের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিল না ; তাঁহার মধ্যে একটা নূতন জিজ্ঞাসা আনিয়া দিল।'৩ এই জিজ্ঞাসায় কবি উপলব্ধি করলেন, এ আনন্দ কিসের জন্য এবং এ আনন্দের মূলে কোন্ পরম সত্য বিরাজমান। (এ তত্ত্ব জানা না থাকলে সৌন্দর্য উপভোগে হয়তো কোন বিঘ্ন আসে না কিন্তু এ জানবার পর সৃষ্টিকে নতুন করে, নতুন ভাবে উপভোগ করা সম্ভব)।—

"তোমা পানে ধায় তার শেষ অর্থখানি"

কবির এই উপলব্ধিতেই কবি জানলেন 'এই যে সৃষ্টির সৌন্দর্য যে রূপ-রস-শব্দ-গন্ধময় পৃথিবীর আনন্দ—ইহা মিথ্যা নয়, ইহা অলক্ষিতে সেই পরম সত্যের দিকেই কবিকে আগাইয়া লইয়া গিয়াছে।'২ কবি বুঝলেন, আমাদের এই সব সৌন্দর্যানুভূতি ব্যর্থ নয়।৪

---

(১) বিশ্বপতি চৌধুরী।। কাব্যে রবীন্দ্রনাথ, (পৃঃ ৪৭)
(২) সুন্দরের নিমন্ত্রণ : তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা। (পৃঃ ৪৪)
(৩) বিশ্বপতি চৌধুরী, পৃঃ ৬৪।
(৪) বিশ্বপতি চৌধুরী, পৃঃ ৬৫।

(৩)

সুখ-সৌন্দর্য ঃ

রবীন্দ্রনাথ কবি-দার্শনিক। তাই সৌন্দর্য তাঁর কাছে জীবন-রস এবং ভাব দুই-ই। কবি একদিকে উপভোগ করেন, দার্শনিক তাতে নতুন কোন সমস্যার সৃষ্টি করে তার একঘেয়েমিকে নষ্ট করে উপভোগের ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন, উপভোগের পথটিকে বহুমুখী করে তোলেন। কড়ি ও কোমল থেকে কণিকা পর্যন্ত কবির যে অগ্রগতি তার মূল রহস্য এই। তবু মূলতঃ সৌন্দর্যকে কবি কখনো জাগতিক ব্যাপার মনে করতেন না। তাই তাঁর সৌন্দর্যবোধের কোন মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ হয় না।১ রবীন্দ্রনাথ একে 'শান্ত সমাহিত আনন্দ' বলেছেন। মনোবিজ্ঞানের ছাত্রদের কছে Hedonism-র একটা মূল্য আছে এই সৌন্দর্যানুভূতিকে বিবৃত করার ক্ষেত্রে। কিন্তু রবীন্দ্র সৌন্দর্যদর্শন আরো ব্যাপক। সৌন্দর্য বোধকে তিনি আত্মার একটি বিশিষ্ট ধর্ম রূপে দেখেছেন। 'আত্মার কাজ আত্মীয়তা করা' অর্থাৎ আত্মা নিয়তই চায় প্রকৃতি ও অন্যান্য জীবাত্মার সাথে মিলন বা একাত্মবোধ। সৌন্দর্য সেই মিলনের সেতু। এতে আছে ভূমার আনন্দ। বর্তমান কালে এ তত্ত্বের আবেদন যাই থাক না কেন, এই সত্য কবির উপলব্ধিজাত।২ তাঁর সৌন্দর্যতত্ত্বে পরম লক্ষ্যের কথাই প্রকৃত ; এই সুরটিকেই আমাদের প্রথমে ধরতে হবে।

---

(১) অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই সাহেব অন্যভাবে তত্ত্বটিকে উপস্থিত করতে চেয়েছেন। তিনি সরাসরি বলতে গিয়ে স্পষ্ট করেছেন কথাটাকে। তাঁর ব্যাখ্যা এই যে, (ক) শিপ্রা নদীর তীরে কোন অনুপম জগতে রবীন্দ্র রস-দৃষ্টির একটি বৃহৎ পর্যায় বর্তমান, বরাবরই কবির মনে একটা সুন্দরের আদর্শ ছিল এবং (খ) 'তাঁর মনে সুন্দরের এক আদর্শ থাকাতে সেই আদর্শ সুন্দরকে তিনি সহজে ধরতে পারেন নি।'

(সুন্দর লোকে, তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা পৃঃ ৪৬)

(২) প্রবাস জীবন ঃ 'রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য দর্শন আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, তিনি কোনো কিছুকেই নিছক বুদ্ধি বিচারের মাপকাঠিতে পরিমাপ করেন নাই। যাহা তাঁহার কাছে অনুভূত হয় নাই—তাহা ছায়ামাত্র হইয়া কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে। সত্যকে তিনি অন্তরে উপলব্ধি করিয়া তবেই তাহাকে সত্য বলিয়া জানিয়াছেন এবং আমাদের সম্মুখে তাহাকে রাখিয়াছেন।' (পৃঃ ৯)

(৪)

রবীন্দ্র জীবন ও জগৎ এবং রবীন্দ্র সৌন্দর্য দর্শনে রোমান্টিকতা ঃ

রবীন্দ্র জীবন প্রেমের জীবন এ জগৎ সুরের জগৎ। সর্বাত্মক-মিলন এবং পরিপূর্ণতাই এই জীবন ও জগৎ এর মহৎবানী —এই বাণী Sentinel of the East-এর বাণী। এই জীবন ও জগৎএর মূল প্রবাহ ঔপনিষদীয়। এই জীবনের উপলব্ধি এবং কর্মের মধ্যে সত্য কেবল এক 'অদ্বৈত ঈশ্বরবুদ্ধি'। এখানেই ক্ষুদ্র সত্তার সাথে বৃহৎ সত্তার যোগ, সীমার মাঝে অসীমের লীলার উপলব্ধি। রবীন্দ্রনাথ ক্ষণস্থায়িত্বের বেদনা 'নাল্পে সুখমস্তি' বোধজাত ঃ অল্পে যে সুখ নেই, বিচ্ছিন্ন এবং সীমাবদ্ধ কোন পদার্থে যে সৌন্দর্য নেই—এ কথা কবি মর্মে মর্মে অনুভব করেছেন। 'তাই যেখানে তিনি ক্ষুদ্রকে বৃহত্তর সত্ত্বার সহিত যুক্ত করিতে পারেন নাই, সেখানে অন্ততঃ তাহাকে তাহা অপেক্ষা বৃহত্তর সত্ত্বার সহিত যুক্ত করিয়া তাহার সৌন্দর্য উপভোগ করিয়াছেন'।১ তাই সামান্য পাখীর পালক দেখেও কবি তার সৌন্দর্যের কারণ স্বরূপ বলেনঃ তার মধ্যে নীল আকাশের কথা আছে, আছে কত ছোট খাটো নীড়ের কাকলিস্বর আর নিভৃত স্বপ্ন। অতিবুদ্ধিমান শ'-এর মতো কবিকে instinct কিংবা life force-এর গোঁজামিল দিয়ে আত্মরক্ষা করতে হয় না। '—কেবল life force নামক উপদেবতা প্রকৃতির মধ্যে কামনার বহ্নি জ্বালাইয়া রাখে নাই, আরও একজন দেবতা আছেন যিনি বলিতেছেন সুন্দর হও, সুন্দরকে সৃষ্টি কর, অনুভব কর, উপলব্ধি কর।'২ এই জন্যই কবি বলেছেন, 'অদ্বৈতের আনন্দ অনুভূতিই একমাত্র সত্য এবং সত্যই সুন্দর, সুন্দরই শিব।'৩

---

(১) বিশ্বপতি চৌধুরী, পৃঃ ৯৯

(২) রবীন্দ্র মানস ঃ শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র নাথ চৌধুরী, পৃঃ ১১০

(৩) এই হিসাবে রবীন্দ্রনাথ সনাতনপন্থী। তাঁর সৌন্দর্য একটা সামঞ্জস্য বা সমন্বয় বা প্রশান্তি। বিরোধে বা রুক্ষতায় এই সৌন্দর্যের অভাব ঘটে। রবীন্দ্রনাথের 'ভগবান' তাই 'সুন্দর বল্লভ কান্ত' এবং 'তারি মুখের প্রসন্নতায় সমস্ত ঘর ভরে'। এই বল্লভের কাছে কবির নিত্যকার আকিঞ্চনও তাই ঃ

"নির্মল কর উজ্জ্বল কর সুন্দর কর হে"

"সুন্দর বলিয়াই সত্য ও মঙ্গল তাহাকে আকৃষ্ট করিয়াছে"।—নলিনী কান্ত ; রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ১২

এই অতিমানসিকতার মূল প্রেরণা উপনিষদ থেকে পেলেও Beauty is truth, truth Beauty ; (Keats) এমনি রচনা বা ওয়ার্ডসয়ার্থ ও অন্যান্য কবিদের ভাব তাঁকে প্রভাবান্বিত করে নি, তা' নয়। এ ছাড়াও তিনি রহস্য-প্রধান রোমান্টিক কাব্যের সত্যকে যেভাবে বিশ্বপ্রকৃতির পরম সত্যের সাথে একীকরণ করেছেন, তাতে Schelling, Novalis (‘the more poetic, the more true,’) এদের কথা স্বতঃই মনে আসে। কিন্তু লক্ষণীয়, রবীন্দ্র সৌন্দর্য দর্শনে যে রোমান্টিক সুর ধ্বনিত হয়েছে, তাতে পৃথিবীকে অস্বীকার নেই, যদিও কেননা আধ্যাত্মিকতার কথাটাই মোটা। রবীন্দ্রনাথ মানবধর্মী ছিলেন এবং তাঁর সৌন্দর্যদর্শনে আমরা সারবান মানবতার বাণী পাই। রবীন্দ্রনাথের বলিষ্ঠ মানবতা তাঁর কাব্য ও সৌন্দর্যদর্শনকে তত্ত্বকথায় পর্যবসিত হতে দেয় নি। “রবীন্দ্রনাথের মানবতা নর কেই নারায়ণ বলিয়াছে, ঈশ্বরকে বুঝিয়াছে মানুষের প্রেম জ্ঞান কর্মদ্বারাই। সুতরাং দেখিতে পাই যে রবীন্দ্র সৌন্দর্যদর্শন সাধারণতঃ যতটা অপার্থিব তত্ত্বজাল বলিয়া মনে হয় ততটা উহা স্বরূপতঃ নয়। তাহা হইলেও একথাও সত্য যে রবীন্দ্রনাথের ব্যাপক আধ্যাত্মিকতা, অভিনব ও অদ্ভুতের প্রতি রোমান্টিক প্রীতি ও সুক্ষ্ম মরমীভাব এই সবের ফলে তাঁহার সকল রচনাতেই একটা অবাস্তবের ছায়া চোখে পড়ে।…তবে…তাঁহার সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীটির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে তাঁহার অনেক কিছুই—যেমন, তাঁহার সৌন্দর্যদর্শন আজকের দিনের জীবন ধর্মীতার পরিপন্থী বলিয়া মনে হইবে না এবং কবির বাণী আধুনিক সমাজকেও যথেষ্ট দিতে পারে।” (প্রবাস জীবন, পৃঃ ১৫৪)

(৫)

রবীন্দ্র রসজীবনের শ্রেষ্ঠযুগ : উপসংহার :

আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে রবীন্দ্রনাথের এই আলোচনায় রবীন্দ্রনাথকে পর বা অপরা সৌন্দর্যের উপাসক বলে একপেশে করার অবকাশ নেই। সমগ্র রচনাবলীতে রবীন্দ্রনাথের যে সৌন্দর্যধ্যান বা চিন্তা ও মানসিকতা ছড়িয়ে আছে তার প্রবাহ অবিচ্ছিন্ন কিন্তু গতি এক নয় অর্থাৎ সরলগতি এবং একমুখীন সত্যে তা প্রতিষ্ঠিত হয় নি, হবার কথাও নয়। ধর্মচিন্তার মতো এক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ পূর্বনির্দিষ্ট চিন্তায় আবদ্ধ থাকেন নি, তিনি দেখতে দেখতে ভেবেছেন এবং ভাবতে

ভাবতে দেখেছেন। কোথাও থেমে পড়েন নি। কোন নতুন সমস্যার যেমনি তিনি উদ্বিগ্ন হন, তার নতুনতর সমাধানেও তেমনি তিনি নিরস্ত হন না—সমাধানের পরও দেখা যায় তিনি এই বৃত্তপথ থেকে কোন সমতলে এসে মুক্ত হতে পারেন না, পূর্ববর্তী চিন্তাধারা আবার কোন নতুন অনুভূতিতে রূপান্তরিত হয়, আবার আসে তেমন কোন জটিল আবর্ত। এই হলো বিশ্বপ্রকৃতি ও মানব জীবনের সাথে কবির আত্মার সম্মিলনের বৃত্তান্ত। এই আবর্তমুখী সন্ধান প্রক্রিয়ায়ই রবীন্দ্রনাথের রসাস্বাদের সাধনার ভিত্তিভূমি গড়ে উঠেছে।

এই আবর্তের একটা অস্পষ্টতার দিকও আছে, যার জন্য রবীন্দ্র চিন্তাপ্রবাহের মধ্যে কোথাও ছেদ পাওয়া যায় না—যার জন্য সাধারণ দৃষ্টিতে এর মধ্যে আপাতঃ বিরোধিতা' দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু এই বিরোধের মধ্যেও সামঞ্জস্য বর্তমান এবং তা সুক্ষ্ম হলেও অস্বাভাবিক নয়।

আমরা লক্ষ্য করি 'কড়ি ও কোমল' 'মানসী' 'চিত্রাঙ্গদা' এগুলি প্রত্যেকটি এক একটি প্রশ্ন। প্রায় কাছাকাছি সময়কার এই বিখ্যাত গ্রন্থত্রয়ে কবির চিন্তাধারার বিরোধ, সৌন্দর্য অনুভূতির ক্ষেত্রে কোন সমস্যাই নয়। বরং যাকে 'বিরোধ' মনে হয়, তা কবির 'দুঃখবোধ' মাত্র, (যা আবার hedonism থেকে স্বতন্ত্র)। সন্ধ্যাসংগীতের প্রেমের দু একটি কবিতাতেও সেই ক্ষণভংগুর জীবনের নৈরাশ্য লক্ষ্য করিতে পারি।

না হয় শুনোনা মোর গান,
ভালবাসা ঢাকারবে মনে ;
অনুগ্রহ করে এই করো
অনুগ্রহ করোনা এজনে।

পরবর্তী গ্রন্থে এই দুঃখকে অস্বীকার আছে কিন্তু কড়ি কোমলে দুঃখই কবির পথে আলো ছড়িয়েছে। এই দুঃখবোধের ধারার সংগে দ্বিতীয় যে ধারা যুক্ত হলো তা পূর্ণজীবনের প্রতি ব্যাকুলতার ধারা। তারই ফল 'চিত্রা' এবং 'জীবনদেবতা'। ইতিমধ্যে কবির সৌন্দর্যচিন্তায় এসেছে নারী এবং প্রকৃতি। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয়, কবির যৌবনচিন্তা দেহী বা বিদেহী

সেকথা বড়ো নয়, তা' সৌন্দর্য চিন্তায় নিমগ্ন কিনা সেইটেই আসল। এখান থেকেই কবির অসত্য বোধের জন্ম। দুঃখের কারণ এবং সুখের অন্তরায় এই চিন্তা থেকেই কবি সৌন্দর্য সৃষ্টির মূলে আত্মার নিভৃত কর্মকে লক্ষ্য করলেন।

কবি উপলব্ধি করলেন 'আত্মার কাজ আত্মীয়তা', এবং বৃহৎ চৈতন্যের উৎপাদন। মানুষ জৈবিক মাত্র নয়, সে আত্মাও ভূমার তৃষ্ণাও তার আছে। এর অন্তরায় অসত্য, সে ব্যক্তিত্বের ক্ষুদ্র অংশের সন্তুষ্টিতে মগ্ন, সে কামনা। 'হায় আমারে করিল অতিক্রম আমার এ তুচ্ছ দেহখানা।' চিত্রাঙ্গদার এই হাহাকার সেই সত্যকেই উপলব্ধি করায়। তখনই কবি প্রেমের আদর্শকে কর্মের প্রেরণার সংগে যুক্ত করেন। বহির্জগতের এই মিলনেই সত্য ও সৌন্দর্যের সৃষ্টি। প্রেম সেই মিলনেরই একটি রূপ। প্রেমের এই আদর্শ কবির সৌন্দর্য-দর্শনে যুক্ত। এই সৌন্দর্য-দর্শনের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ 'চিত্রা' কাব্যে।

বিশ্বপতি চৌধুরী তাঁর "অরূপের পথে" প্রবন্ধে 'চিত্রা' কাব্যকে রবীন্দ্রনাথের রস জীবনের শ্রেষ্ঠতম যুগের অন্তর্গত করেছেন। তাঁর যুক্তিটা এই যে, সোনারতরী থেকে কণিকা পর্যন্ত কবি একেবারে নিছক শিল্পী। সোনার তরীর পূর্বে নানান সমস্যা এসে কবিকে পূর্ণভাবে উপভোগ করিতে দেয়নি এই সৃষ্টি-সৌন্দর্য।

সোনার তরীতে কবির যে উপলব্ধি এবং সৃষ্টির পানে পরিপূর্ণ বিশ্বাসে চাওয়া তার সংগে চিন্তাশীলতা এসে যুক্ত হয়েছে চিত্রায়। অবশ্য চৈতালী প্রভৃতিতে কবি একেবারে নিশ্চিন্ত তবু তার শেষ দিকে কবির 'ভবঘুরে মন' পালাবদলের আয়োজনে ব্যস্ত। সৌন্দর্য সম্বন্ধে কবির ঘাত সংঘাতের ধারা চিত্রাতেই প্রায় পরিপূর্ণ। উর্বশীতে এই ধারার সম্পূর্ণ পরিচয় যদি না পাওয়া যায় তবে এর অসম্পূর্ণতা 'স্বর্গ হইতে বিদায়' কবিতায় সম্পূর্ণ। এ দুটি কবিতা পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। সৌন্দর্যের প্রকাশ হিসাবে উর্বশীর অপূর্ণতা পরবর্তী কবিতাটি পূরণ করেছে।

উর্বশীর অনুপ্রেরণা বিশ্বসৌন্দর্য ও প্রেমের মূল। কিন্তু অযোনিসম্ভবা যে নারী সকল বন্ধনের উর্দ্ধে তা কেবল একটা সত্তাবিশেষ না হয়ে পারে না। উর্বশী

আপনার প্রতীক। 'আপনাতে আপনি বিকশি।' সে অনন্তের অন্তর শায়িনী। লক্ষণীয় যে, এই সৌন্দর্যলক্ষ্মীই 'মানসী'র কবি ও কর্মের কেন্দ্রীয় শক্তি। ব্যক্তিভাব ক্রমে রসভাবে ধরা দিয়েছে,—চৈতন্য পুরুষ, যিনি রসময় তাঁরই উদ্বোধ ঘটিয়েছে। ইনিই চির সুন্দর; প্রকৃতির মধ্যে যে সৌন্দর্য প্রকাশিত তা চিরসুন্দরেরই অঙ্গদ্যুতি। ইনিই রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর।

প্রবাসজীবন চৌধুরী এই কথাটাকেই বলতে গিয়ে বলেছেন যে, সৌন্দর্য অনুভূতির মাধ্যমে কবির এই ঈশ্বর সন্নিধ্যলাভ ঘটেছে।

অতএব রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সৌন্দর্য একটা সত্তামাত্র এবং সৌন্দর্যচেতনা একটি বস্তু-নিরপেক্ষ বোধ বা অন্তরের একটা আনন্দানুভূতি—কবি তাতে একটা বিশেষ সত্তা আরোপ করে তাঁকেই অনন্তরহস্যময়ী প্রণয়বিধুরা নারীতে পর্যবসিত করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত স্বস্তি লাভ করেছেন জীবন দেবতায় উন্নীত করে। ইনিই সৃষ্টি প্রেরণা, আবার বিশ্বসৌন্দর্যানুভূতি ইনিই—যাঁর কাছে মদন নিরস্ত্র।

কবি জীবনের একমাত্র রসলক্ষ্মী যিনি তিনিই কবিকে তাঁর সকল অভিজ্ঞতায় রসসিক্ত করেছেন এবং নিজেও হয়েছেন রসসিক্ত।

কায়কোবাদ

কায়কোবাদের সাহিত্য সাধনার সামাজিক পটভূমি

মুসলিম বাংলা সাহিত্যে কায়কোবাদের সাহিত্যকর্ম এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। তবে বাংলা সাহিত্য চিন্তার কোন স্বীকৃতি বা বোধ তাতে নেই, সে যেন একান্তই অনুপস্থিত। এর মূল কারণ অনুসরণ করলে দেখব কায়কোবাদের মধ্যে যুগ বোধ ও শিক্ষাগুণের অভাব বড় বেশী। তার কবিকৃতি কোন শিক্ষিত প্রতিভার এষণা নয়, স্বভাবজ মাত্র অর্থাৎ, যা আত্মগত ভাব পরিমণ্ডল দ্বারা একান্তই নিজস্ব বৃত্তি ধর্মী। বহির্জগতের আহরিত অবিসম্বাদ এ নয়, কেবল কিছুটা অনুকৃতি আর কিছুটা কণ্ডূকৃতি। তাই উনবিংশ শতাব্দীর ধর্ম কিংবা বিংশ শতাব্দীর পৌরুষঃ কোন সত্তাই যা তাঁর কাব্যে অবশ্যম্ভাবী হতে পারতো—তাঁর মধ্যে ধরা পড়েনি।

বিস্ময়! আরো আশ্চর্য এই, যাকে তিনি যথার্থ (Reality) ভেবেছেন, আর যাতে তিনি ঐক্যতান (Harmony) খুঁজে পান, তারই রূপকে তিনি পান না। তার Charm যেন বৈষম্য রূপে (contrast) একটা complex মানস-বোধের দ্বন্দ্ব ও রূপান্তর ঘটায়। মীর মোশাররফ হোসেনের মধ্যে আমরা মুখ্যতঃ এই দ্বন্দ্ব নিরাকরণের চেষ্টা দেখতে পাই, সে তাঁর প্রতিভার আপন বৈশিষ্ট্যঃ অর্থাৎ সূক্ষ্ম সমাজ বোধ ও ঐতিহাসিক চেতনা। Sense of Privacy বা ব্যক্তির স্বকীয়তাবোধও তাঁর ব্যক্তি স্বরূপে জীবন-বোধ থেকে এসেছিল। কায়কোবাদ ছিল তার থেকে অনেক দূরে। তাই তার মধ্যে বহু ফাঁকের সুযোগে এই বর্ধিষ্ণু Complexity-র আবির্ভাব। এর সহজ সমাধান তাঁর মধ্যে ছিল না। আর এরই ফলে পঁচানব্বুই বছরের একাগ্র সাধনাও কোন বিকাশের স্তরে কিংবা বিষয়ের প্রসারে সমগ্রতা পেল না তার কাব্যে। শেষটায় নিজেই নিজের কাছে বদ্ধ হয়ে ধরা পড়লেন। নিজের কাছে হয়ে রইলেন Colossal statue, প্রাত্যহিক

বাস্তবতায় বিরাজমান থেকেও রইলেন অনাত্মীয়, এর রহস্য ভেদ করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব হলো না সেই একই কারণেই।

মীরসাহেবের যে নাগরিক বৈদগ্ধমন, সে মন দুঃস্কয় হলেও কায়কোবাদের সাহিত্যিক বোধের মত একীকৃত ও অতীত মুখী অথবা এ দুয়ের অন্যোন্যসম্পূরক নয় - যার ফলে কায়কোবাদের নিরিবিলি-সাধনা Isolated superiority-র সাধনার অনন্যা নয় ; বরং আবদ্ধ মানস জলবায়ুতে, যাকে বলে 'প্রিডিস্‌পোস্‌ড্‌ টু দি ডিস্‌ইজ্‌' —সেই পরিণতির ক্রিয়াভাষ্যরূপ মাত্র।

তাই কায়কোবাদের সংবেদ্যসত্ত নিঃসঙ্গের অসংলগ্ন চর্চাগত আত্মপ্রসাদধর্মী।

ব্যাক্তি সমাজের প্রাণময় আহুতি যেমন তাতে অস্বীকৃত, সত্য-সুন্দর-মঙ্গল-আনন্দ-প্রকাশ-সহিত্য এই ষড়তত্ত্ব-বোধও তেমনি তাতে সম্পর্কচ্যুত। আর এই একই বোধে mediaeval craftsmanship হলো তার শিল্পরীতি ; আধুনিক শিল্পকর্ম—"is a matter of indifference to him." একেই বোধ হয় এঙ্গেল্‌স্‌ বলেন, 'মেন্টাল ইনকম্‌পিটেন্‌স্‌ ডিউ টু মেগালো ম্যানিয়া। তিনি যে সমাজকে প্রতিনিধিত্ব করেন, মীর সাহেবের মত সে সমাজকে তার সাহিত্যে উপজীব্য করেন না, অখণ্ড সত্যবোধও তার কবিকর্মে স্ববিরোধী— 'হৃদামনীষা মনসা' নয়, অখণ্ড মানবাত্মা ও বিশ্বাত্মার (ব্রহ্মাত্মা) প্রকাশও তার মধ্যে দুর্বল। তাঁর সত্য প্রকৃতি অত্যন্ত নীতিবাগীশমনা, তাঁর কবি স্বরূপ ঐশ্বর্যহীন। এই তার complexity—স্বেচ্ছা ক্লেশ—অর্থাৎ এতে তাঁর নিজের কোন ক্লান্তি নেই, নেই মুক্তির আরাধনা অথবা ক্ষেত্র বোধও। বলা হয় "কবি সুন্দরের পূজারী কিন্তু তাই বলে সত্যের অপলাপী নন। (মোতাহার হোসেন—কবি সম্বর্ধনা)" অর্থাৎ, "সত্যাশ্রয়ী হয়েও কল্পনা বিচিত্র হতে পারে।" এবং "অবান্তর, অলীক বা দুর্নীতি-মূলক কাব্য উচ্চাংগের সৃষ্টি নয়—এই তাঁর অভিমত।" 'মহররম শরীফের' ভূমিকারও তিনি এই মাংগলিকী (!) উচ্চারণ করেছেন। এই কঠোর নীতিবোধের দিক দিয়ে তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজ কবি Crabbe-র সংগে প্রায় একাত্ম। Crabbe ও বলেন, তিনি কাহিনী রচনা করবেন এমন ভাবে যে তাতে স্পষ্ট সত্যের ইংগিত থাকবে কিন্তু "অহেতুক" সৌন্দর্যের তন্ময়তা থাকবে না—as truth will paint

and bards will not. কিন্তু, একই যুগে রবীন্দ্রনাথ তখন কানের কাছে, দুয়ারের কাছে ভেতরে ও বাইরে বলছেনঃ 'মানবের সমস্ত সাহিত্য সংগীত, ললিতকলা জানিয়া এবং না জানিয়া এই দিকেই চলিয়াছে।' তাই তাঁর সবচেয়ে মানবিক ঘোষণাঃ

"সাহিত্যে আমরা সত্য চাইনে, মানুষকে চাই'। (cf: Truth is beauty, beauty truth: Keats) কায়কোবাদের এই দৃষ্টি-ভঙ্গী থেকে আমরা দুটো আশ্চর্য ফল প্রত্যক্ষ করিঃ তাঁর কবিকর্মে সাহিত্য-সত্য উপেক্ষিত অথচ বস্তু বা বিষয় সত্য প্রধান; আর এরই প্রতিক্রিয়া হলো তার অশ্রুমালা থেকে মহাশ্মশান কাব্যের রূপান্তরে অথবা শিবমন্দিরের কাব্যরূপে।

এইখানে কায়কোবাদের ভূমিকা। তাই তার প্রশ্নটা প্রতিভার নয়, যতখানি সামাজিক ইতিহাসের। ঊনবিংশ শতকের সমাজ আত্মার সঙ্গে তার দর্শন (মৌলিক অর্থে নয়) কতখানি যোগাযোগ রাখে কিংবা কিসে তাতে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে বা কোন মানসিকতা (এবং সামাজিক পারিপার্শ্বিক বোধ) তাঁর কাব্য শরীরকে সর্বগুণান্বিত না করে "বিশেষ ধর্মী" করে তোলে, তার বিশ্লেষণের মধ্যেই কায়কোবাদের আসল সত্তার পরিচয়।

ঊনবিংশ-শতাব্দীর সমাজ-আত্মা

'জাতির সেবক' আর 'জাতির কবি'-র মধ্যে মৌলিক প্রভেদ তাঁর চরিত্রে। মুন্সি মেহেরুল্লা কবি হয়েও জাতির সেবক মাত্র, কায়কোবাদ তার অনুশীলনের ও সনাতন (classical) আবেদনের সহজ মানসিকতায় জাতির কবি।

কিন্তু প্রশ্ন বাংলা সাহিত্যের কাব্য ধারায় যখন মাইকেল-অনুসারীগণ ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছে, তখন তার সেই করুণ ছায়ায়ই কেন কায়কোবাদ তার নিজের আসন প্রতিষ্ঠিত করতে চান?

আমরা এর সামাজিক দিক থেকে বিচার করে বলতে পারি, কায়কোবাদের 'মহাকবি-সত্তার' পেছনে কাজ করেছে এক মহান সামাজিক এবং সেই দিক দিয়ে

জাতিগত প্রেরণা। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে তাই দেখতে পাই, কায়কোবাদের দুই ভিন্নকালে একই প্রতিক্রিয়া সাধন এই classical আবির্ভাব প্রায় মাইকেলের (যুগসাপেক্ষে) সমগোত্রীয়। কথাটা আমরা আর একটু বিশ্লেষণ করে বলতে পারি, মাইকেল যে অর্থে ও যে পরিবেশে হিন্দু রেনেসাঁর আদি কবি, কায়কোবাদও সেই অর্থে, সেই ব্যপ্তিতে ও পরিসীমায়ই মুসলিম রেনেসাঁর মহাকবি। এবং এই একই বা সমধর্মী যুগসন্ধিক্ষণ, উভয়ের মধ্যে উভয় কালে একই কাজ করেছে, যেমন ঃ

১। পাশ্চাত্য প্রভাবের সমগ্র প্রতিফলনের জন্য মাইকেলকে এমন একটা কাব্যরূপ গ্রহণ করতে হয়েছিল যা বাংলা সাহিত্যে ছিল না এবং তাই মেঘনাদবধ কাব্য' নতুন রামায়ণ মাত্র। কায়কোবাদেও আমরা দেখতে পাই মুসলিম সাহিত্যিক চিন্তাধারার ব্যতিক্রম—তাঁর ঐতিহাসিক সংক্ষুব্ধ মন; তাই তাঁর মহররম শরিফ পারশ্য সাহিত্য অনুকারী পুঁথি নয়, নতুন কাব্যরীতির মাধ্যমে নতুন ফসল। অর্থাৎ নিজের অন্তর বেদনাকে প্রকাশ করতে তাঁরা উভয়েই মহাকাব্যের পথ ধরতে বাধ্য হয়েছেন আর হিন্দু ও মুসলিম নব-চেতনার জন্য উভয়েরই বিষয়বস্তু এক হিসেবে স্বতন্ত্র নয়—পুরনো মহাকাব্য বা পুঁথি ভেংগে- উভয়েই তাকে সত্যধর্মী করে পুণর্নবা দান করেছেন।

২। হিন্দু পুণর্জাগরণের ক্ষেত্রে একজনকে য়ুরোপীয় Renaissance-র কবি হোমার দান্তে ভলটেয়ার দিচ্ছে অনুপ্রেরণা ঃ তাঁদের জীবন ক্ষেত্রে যে বলিষ্ঠ মানবিক জীবনবাদ তাঁদের হয়ে কাজ করেছে মাইকেলেও প্রায় অনুরূপ ধর্মীতাই কাজ করেছে; আর মাইকেলের এই ধর্মীতাই হেম-নবীনের জাতিয়তাবাদী রূপ ধরে কায়কোবাদের মুসলিম চেতনার যুগে একই কাজের জন্যে এগিয়ে আসছে। (শিক্ষা ও চেতনা ভেদে ক্রিয়া ভেদ মাত্র ঃ কায়কোবাদে উদার আবেদন কাব্যধর্মী ও স্পষ্টব্যক্ত নয়।) সুতরাং বলব, মাইকেলের যে পটভূমিকা কায়কোবাদেরও সেই একই ক্ষেত্র।

তাই দেখি, ষোড়শ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী অবধি হিন্দু মানসিকতা যে কাজ করে এসেছিল (সুযোগ পেয়ে মাইকেল যা হঠাৎ-চেতনায় দিশাহারা)—

পলাশীর যুদ্ধ-কাল থেকে সিপাহী যুদ্ধের অবসান পর্যন্ত মুসলমান মানসিকতারও ছিল তেমনি একই করুন পরিণতি।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তাই কায়কোবাদের জন্ম – অষ্টাদশ শতাব্দী পেরিয়ে যেমনি জন্ম, মাইকেলের।

কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, হিন্দু মধ্যবিত্ত আর মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশের ধারা এক নয়। পলাশীর যুদ্ধোত্তর কাল থেকে তার রূপান্তরের ধারাবাহিক ইতিহাস এই দুই শ্রেণী মানসেই ক্রিয়া করেছে দুই ভিন্ন রূপেঃ যখন মুসলমানেরা তলিয়ে যাচ্ছে হিন্দুরা তখন ভারসাম্যে উঠে এসেছে রাষ্ট্র শক্তির সক্রিয় সাহায্যে হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবেই তার নব অভ্যুদয় ঘটাতে হয়েছে। অভ্যুদয়ের এই পরিস্থিতির জন্যেই ১৯ শতকের অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী সংগঠনের ইতিহাসে বাঙালী মুসলমানদের ভূমিকা এত করুন ও উপেক্ষণীয় বা শ্রেণী মানসে নেতিধর্মী এবং তার কাব্যধারায়ও তাই গভীর রেখাপাত অনুপস্থিত।

প্রথম স্তরঃ পলাশীর যুদ্ধে ভাগ্য বিপর্যয়ের পর থেকেই এই সর্বদিক (aspects) ব্যাপী সর্বনাশের ভাংগন শুরু হয়। মুসলমানদের পক্ষে এ এক অরুন্তুদ জীবন-লীলা। প্রথম ধাক্কায় মুসলমানদের যে তিনটি 'distinct streams of wealth' ছিল (Military command বা সামরিক কর্ম; 'Collection of revenue' বা রাজস্ব আদায় আর 'judicial or political Employ' বা বিচার ও রাজনৈতিক বিভাগে চাকুরী) সবগুলিই বেহাত হয়ে পড়লো; এর অবশ্যম্ভাবী ফল থেকেও রক্ষা পেলো না অর্থাৎ,—"it was almost impossible to become poor"-এর স্থলে হলো 'to continue rich'; কেননা জীবিকার পথ যেমন বন্ধ হলো জীবন যাত্রাও তেমনি আর সহজ রইল না। ঐতিহ্যকে কলংক করে এই তারা প্রথম পরাধীন হলো; তার বেদনা, তার কষ্ট, পদে পদে তার কঠিন বাধা অথচ মুক্তির পথে তার রুদ্ধ দ্বার তাদেরকে করে তুল্লো ভাগ্যবাদী, নৈরাশ্যবাদী।

দ্বিতীয় স্তরঃ ঠিক এই সময় 'ইষ্ট-ইণ্ডিয়া'র বৈপ্লবিক সংস্কারগুলি প্রতিকূল আবহাওয়াটাকে সম্পূর্ণ করে তুললো। (ক) ১৭৯৩-এর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও

(খ) ১৭৯৭-এর লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত উচ্চবিত্ত মুসলমানদেরকে বিধ্বস্ত করে দিয়ে গেল। (গ) আর যেটুকু বাকী ছিল, ১৮৩৫-এ পারশী ভাষাকে তুলে নতুন বিদেশী রাজভাষা প্রতিষ্ঠা করে সেটুকু পূরণ করে দিল। সংগে সংগে মুর্শীদাবাদের পাট চিরতরে গেল বন্ধ হয়ে—এল কলকাতার যুগ। সে যুগ হিন্দুদের ইংরেজ সাধনা ও ইংরেজদের হিন্দু সাধনা দু'য়েরই যুগ। কেননা, মুসলমানদের সংগে তাদের প্রকৃত দ্বন্দ্বের সূচনা এখান থেকেই। এই দ্বন্দ্বে টি'কতে হলে হিন্দুদের হাত করা একান্ত প্রয়োজন ছিল। আর ইতিমধ্যেই হিন্দুরা 'বৃটিশ শিল্পপতিদের পার্শ্বসহচর ও অনুচর' অর্থাৎ প্রথমে দালাল, পরে অংশীদার হয়ে আত্মপ্রকাশ করে ফেলেছে। সুতরাং, এই বিবর্তিত রূপ গ্রহণ করার চেষ্টা ও মানসিকতা তাদের ছিল।

তৃতীয় স্তর: এই বিবর্তন তাদের মানসে প্রতিষ্ঠা করার জন্য কোম্পানী হয়ে উঠলো দরাজ। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ শুধু সিভিলিয়ানদেরকে দেশী, রাজনীতি ও ভাষাভ্যাসের কেন্দ্র হয়ে রইল না, হিন্দু মানসিকতার উৎকর্ষ ও Europeanised করার সংকল্পে ফেটে পড়লো ১৮১৬-র হিন্দু কলেজে এবং আরো পড়ে বা সমসময়ে রবার্ট মে, জেমস ষ্টুয়ার্টের পাঠশালায়, ডফ্ প্রভৃতি পাদরীর স্কুলে, স্কুল সোসাইটির স্কুলে, ইউনিয়ন স্কুল ও জুভেনাইল স্কুলে, সংস্কৃত কলেজ ও অন্যান্য কলেজে।

হিন্দু মানসিকতায় এলো তাই সহজ ধর্মান্তর, বৈপ্লবিক রূপান্তর। সামান্য নায়েব-গোমস্তা হয়ে উঠলো ভূস্বামী। গ্রামবাসী হয়ে উঠলো স্থায়ী কলকাতা-জীবি। 'বাংলা-মা' হাই তুলে তুড়ি দিলেন; 'ভারত-মাতা' আপন গৃহ-কোনের স্তিমিত মৃৎপ্রদীপটি 'উস্কাইয়া দিবার' চেষ্টা করলেন।

উর্বশী-নৃত্যের ছায়া পড়লো আবাঙ্মানসে।

কিন্তু মনের ক্ষোভে ও বিজাতীয় ঘৃণায় তদুপরি ইংরেজগণের বিমাতৃসুলভ ব্যবহারে মুসলমানগণ আপন স্বাধীন মানসিকতা নিয়ে চারিদিক থেকে তাকে বেড়াজাল দিয়ে ঘিরে কোনের নিরালায় অদৃষ্ট নির্ভর হয়ে পড়ে রইলেন। অতীত-রোমন্থন বস্তু তার সহায় হয়ে দাঁড়াল, বলা চলে, একমাত্র সহায়

হলো। সুফিবাদের অলৌকিকতা হলো তার দোসর। সহজেই তাই ধর্ম বিকৃত হয়ে মানসিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকেও তাকে সংকীর্ণ ও ক্ষয়িষ্ণু করে তুললো।

সুতরাং এই আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে তাঁরা যোগ দিলেন না।— অবহেলা ও অব্যবস্থার ফলে এবং সংকীর্ণ বোদ্ধার জঞ্জাল নিয়ে 'মহম্মদী মাদ্রসা' (আলীয়া মাদ্রাসা) নিজের ও মুসলমান সমাজের মৃত্যুকে ঘনিয়ে আনলো। হানটার তাই বলেন, The Scholastic classes of Muhammadans emerged from the eighteen years of harrying, absolutely ruined.

মনের এই পরিণতির জন্য তাঁরা হিন্দুদের অগ্রগতি, তার স্তর বৈভাগিক উন্নতিগুলি এবং তার সর্বশেষ পর্যায়ের সর্বসত্যরূপ বুঝতেই চেষ্টা করল না — এমন কি মনের দিক থেকে কোন সংস্কার প্রচেষ্টাও করা হলো না, নতুন যুগের ধর্মে তাকে দীক্ষিত করা হলো না। মুসলমান সমাজের অবস্থা তাই সেদিন হয়ে রইলো Stagnant, বুদ্ধি মনন ও জীবন-দর্শনের হিন্দু পুণর্জাগরণের সেই ছিল সুযোগ।

চতুর্থ স্তর: হিন্দু ওপরে উঠে যাওয়ার ফলে শাসক বণিকদের সংগে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ হলো ওদের সংগেই। মুসলমানদের তখন চরম লজ্জা ও অবনতির দিন। ধর্মনাশের ভয় তখন তাদের মনে চেপে বসলো। সৃষ্টি হলো রক্ষণশীল দলের।— Puritaism-এর সূত্রপাত এখান থেকেই।

তাই হানটার এককালে যে বাংলার মুসলমানকে দেবার্চনা করতেও দেখেছিলেন, 'দারুল হারবে' তা আর কদাচ ঘটতে দেখা গেল না। এমন কি বাঙালী মুসলমানদের মাথায় টুপি নেই — এ দৃশ্য অভাবিত 'ছিল সিয়ারুল মোতা আখেরিনের' অনুবাদকের চোখে; কিন্তু এই সময় তারা খুব আচার প্রিয় হয়ে উঠতে বাধ্য হয়। জীবন-ক্ষেত্রে এটাই হয়ে উঠলো তাদের একমাত্র Positive side (!) — ওহাবী আন্দোলন ও আরো পরে সিপাহী বিদ্রোহ তাই ছিল অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া। বাঙালী মুসলিম মানসে এর ফল ছিল প্রত্যক্ষ—

১· এবার থেকে ইংরেজ মুসলমানদেরকে সরাসরি শত্রুপক্ষ ভাবলো। তাতে মুসলমানদের বিরূপ ভাবও আরো 'চারা' দিয়ে উঠলো। ফলে, ক্ষতিগ্রস্তই হলো তারা।

২· মুসলমানদের দুর্গতির সংগে হিন্দুদের উন্নতি চেষ্টা সফল ও সবল হলো রাজনৈতিক দিকেও এবং ইংরেজ শাসকদের আনুকুল্য লাভ তাদের পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠলো।

৩· মুসলমানরা অতীতের ব্যবস্থার দিকে ফিরে গিয়ে ধর্ম বিরোধী সকল ব্যবস্থা, শিক্ষা ও প্রণালীকে সন্দেহের চোখে দেখতে লাগলো। এর ফলে তাদের লোক-সংস্কৃতি ও ধর্ম বিকৃত হয়ে আড়ষ্ট মানসিকতার জন্ম দিল।

৪· জীবিকার প্রত্যেকটি দিক বন্ধ হয়ে গেলে তারা অদৃষ্টবাদী হয়ে উঠেছিল, —ওহাবী আন্দোলনের কালে এই ধর্মবাদে ঘোর কলংকের ছাপ পড়লো।

৫· উত্তর ভারতের মুসলিম সংস্কৃতি ছিল নগর কেন্দ্রিক। বাঙলার ক্ষেত্রে ছিল তার উল্টো। নিছক মুর্শিদাবাদী সংস্কৃতিও ছিল বিশেষ গোষ্টিবদ্ধ সাধারণের সংগে তার যোগাযোগ ভিন্ন ছিল। বৃহৎ জন সমাজে তাই তার পরিনতি খুব ভাংগণ ধরাতে পারেনি। পল্লীর নিরালায় তাদের জীবন যাত্রা ছিল পূর্ব পুরুষদের ধারায়। তাই তার একটা নিজস্ব লোক সংস্কৃতি ছিল। এবারে ওহাবী প্রভাবে তার মূল কোথায় উবে গেল।

মানুষ সেদিন ধর্ম বদলিয়েছে, কিন্তু ধর্ম বদলের অনুপাতে জীবন-দৃষ্টি বদলায়নি

৬· কৃষক জীবনেও এলো চরম দুর্দশার দিন। নতুন ভূমি সংস্কারে তারা নবাবী আমলের অভ্যাস থেকে হঠাৎ ছিটকে পড়ল — যার আবশ্যম্ভাবী ফলের প্রতিক্রিয়া হলো একদিন নীল বিদ্রোহে।

৭· উচ্চবিত্তরা কখনও তাদেরকে রূপান্তর হতে দিল না মধ্যবিত্তে,—দাস-দাসী-ভৃত্য-জাঁকজমক শেষপর্যন্ত যেন স্বাভাবিক পর্যায় থেকেও অতিমাত্রা হয়ে উঠলো। এর পরিণতি হয়ে উঠলো অত্যন্ত শোচনীয়।

৮· মুসলিম 'বহি মুখংবিবক্ষু যুবকের'ও বিকৃত মানসিকতার দরুণ, যুবধর্মজাত অহেতুক আন্দোলনে অর্থাৎ নির্দিষ্ট গতি ও দর্শন অভাবহেতু নির্দিষ্ট পন্থা অবলম্বন না করার ফলে তৎকালীন সমাজে যে চিন্তাধারার জন্ম নিতে পারতো —তা আরো একটা জেনারেশান পিছিয়ে গেল।

৯ ইঙ্গ-সংস্কৃতি ও পরে হিন্দুর নব কালচারের প্রতি ঘোরতর বিরূপভাব জাগলো। তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ তারা গ্রহণ করলো উত্তর ভারতীয় উর্দু ভাষা ও সংস্কৃতি; ভাষা 'বিভ্রাট' তারই ফল।

ঃ তুর্কী বিজয়ের মতো ইংরেজ বিজয়ের এই কালটা তাই সাহিত্য চর্চার উপযোগী পরিবেশ ছিল না।

হতে পারে নি আরো দুটি প্রত্যক্ষ কারণে। এক, নতুন রাজভাষা মুসলমানদের চর্চার বিষয় ছিল না, যার ফলে পার্শী ভাষাও তার চর্চার গৌণ কারন হয়ে রইল মাত্র। দুই, নতুন ভাষ-চর্চার সংগে সংগে বাংলা ভাষার এক আশ্চর্য রূপান্তর ঘটলো হিন্দুদের হাতে—যার সংগে মুসলমানদের কোন সংশ্রব থাকার কারণই ঘটলো না।

তাই দেখি, মুসলমান সমাজে তবু যাঁরা সাহিত্য চর্চা করতেন, তাঁরা বাংলাভাষার এই মৌলিক রূপান্তর ও সমৃদ্ধি তাঁদের চেতনায় ধরা পড়ে নি—তাঁদের সাহিত্যে মোঘল ঐতিহ্য অর্থাৎ, প্রাচীন ধারাই একমাত্র উপজীব্য হয়ে রইল। আজকের দিনে এর সাহিত্যিক নাম 'দো ভাষী পুঁথি' বা বটতলার সাহিত্য।

তবে উনবিংশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের প্রায় এই এক রূপই ছিল, তবু বর্তমানে এ ছিল এক ভিন্নাত্মার সৃষ্টি—বৃহৎ বাঙ্গালী জনসংস্কৃতি থেকে ওহাবী প্রচারের ফলে এবং প্রায় Contrast হিসাবে 'নব্য বাবু কলচর' ও সংস্কৃত বাংলা ভাষার সম্পূর্ণ হিন্দুত্ব অধিকারের ফলে যখন মুসলিম সংস্কৃতি আলাদা হয়ে গেল, তখনই—'It developed a religious literature and a popular dialect of its our'। বলাই বাহুল্য এ সৃষ্টি অত্যন্ত দুর্বল।

রেনেসাঁ ঃ পুনরভ্যুদয়

এই সময়েই স্যার সৈয়দের ঐতিহাসিক আবির্ভাব। বলাই বাহুল্য ওহাবী

আন্দোলন কি সিপাহী বিদ্রোহ কি ফরাজী আক্রমণ এদের কোনটাই মুসলিম সমাজের জাগ্রত আত্মার পরিচয় বহন করেনি কিংবা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে শাহ গরীবুল্লা এঁদের তথাকথিত নতুন অনুশীলনের মাধ্যমে কিছু মাত্র উন্নতি লাভ ঘটেনি। বাংলা দেশে প্রথম মুসলমানদের সত্যিকার চেতনা ঘটে সৈয়দ আহমদের তীব্র প্রতিবাদে এবং মেহেরুল্লার আন্দোলনে।

লালন ফকির সম্প্রদায়ও অবশ্য ওহাবী প্রভাবকে বাধা দিতে চেষ্টা করেছিল—তাদের গানে সেই প্রতিবাদের ঝংকার রয়েছে। তবে এই সমাজ মানস শক্তির দিক দিয়ে তেমন সবল ছিল না বলে ও ওহাবী মতবাদের ব্যাপক প্রসারের ফলে বা তাদের রাজনৈতিক বা অন্যদিকে অলৌকিক আবেদনের ফলে এই বিশেষ সম্প্রদায় তেমন কৃতিত্ব পায় নি।

যাই হোক এখানেও হিন্দু অভ্যুত্থানের স্বরূপ ও প্রকৃতির সংগে প্রায় ১০০ বছর পরে মুসলিম আত্মসংস্কার যুগের প্রকৃতির একটা অন্তর মিল দেখতে পাই।

হিন্দু-পুনর্জাগরণের ইতিহাসে রামমোহনী পর্বের (১৮০০—১৮৪০) যেমন গুরুত্ব, মুসলিম জাতির নির্মিতির যুগেও মুন্সি মেহেরুল্লা (—১৯০৭) পর্ব তেমনি অনস্বীকার্য। 'ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ কয় দশকে ও বিংশ শতাব্দীর শুরুতে তিনি ছিলেন মুসলিম বাংলার রামমোহন।'

বস্তুতঃ এই সময়ে পণ্ডিত রিয়াজউদ্দীন মাশহাদ, মুন্সি মেহেরুল্লা, সালাহুদ্দিন খোদা বকস এবং নবাব অব্দুল লতিফের অভ্যুদয় না ঘটলে সেদিন মুসলিম সমাজই আর বেঁচে থাকতো কিনা সন্দেহ। কেননা, ইতিমধ্যেই হিন্দু সাফল্যের প্রতিক্রিয়ায় ও পাদরীদের বহুল প্রচারের ফল মুসলিম সমাজেও ফলতে শুরু করে ছিল—তাই "ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বিশেষ করে পশ্চিম বাংলার মুসলমানদের মধ্যে খৃষ্টান হওয়ার প্রবল আকর্ষণ দেখা যায়।" রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক ও মানসিক দুর্গতির কথা তো আগেই বলেছি।

কিন্তু তবু এদের সংস্কৃত আন্দোলন সমগ্র জনসমাজের (মুসলিম) ওপর ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারলো না। তার কারণ পুরাতন রীতিতে তারা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল এবং দ্বিতীয় ও প্রধান কারণ মৌলিক বিচার ক্ষেত্রে তাঁরা কেউ

রামমোহন বা স্যার সৈয়দের মতো দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ছিলেন না। এঁদের উদ্যমও যথেষ্ট উদার ও মানবিক ছিল না। Renaissance-এর যে প্রধান বৈশিষ্ট্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র (Individualism) ও যুক্তিবাদ (Rationalism) এবং হিউম্যানিজম মৌলিকতার অভাবে তা এঁরা আনতে পারেন নি।

তবে এঁদের এই 'সন্ত্রস্ত উদ্যমের' একটা মৌলিক আবেদন ছিল, সে যুগে যা ছিল অভাবনীয়। এঁদের আবির্ভাব তাই সেই দিক থেকে নতুন, বলব আশ্চর্য। এর সব চেয়ে বড় ফল ফল্গ : প্রথম যুগে হিন্দুদের মতই রাজানুগ্রহ লাভ। এর মূলেও ছিল সেই একই রাজনৈতিক প্রক্রিয়া। অর্থাৎ রাজনৈতিক বিশৃংখলার জন্য ইংরেজগণের এবার প্রয়োজন ছিল মুসলিম চেতনার বিকাশে সক্রিয় সাহায্য করা।

নতুন করে এবার হিন্দুদের সংগে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র নির্মিত হলো। কিন্তু মনে রাখা দরকার, রাষ্ট্রীয় শক্তির সক্রিয় সাহায্যের ফলে হিন্দুদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে এই নতুন মুসলিম সমাজের অভ্যুদয় স্বাভাবিক হলেও, অভ্যুদয়ের পরিস্থিতির জন্য সে নেতি-ধর্মী। পরাজয়ের গ্লানি ও ক্ষতির জন্য (ভারতের অন্য কোন প্রদেশে তেমন হয় নি—এও এক কারণ) ওহাবী মানসিকতার প্রভাবের ফলে হিন্দু সমাজ যত সত্বর পশ্চাত্য প্রভাব পরিপাকে সমর্থ হয়েছিল, মুসলমান এখনও (রাজানুগ্রহ লাভের কালে) তা পারলো না। তা ছাড়া আরো একটা কারণ ছিল "মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যখন অভ্যুদয়" তখন হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী সমাজের সমস্ত সুখ-সুবিধা আত্মসাৎ করে সমাজ সত্তাকে পর্যন্ত নিজ শ্রেণী মানসের রূপ দিয়েছে।"

মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজের এই 'অসম্পূর্ণ বিকাশের' জন্য তাই এই পরিস্থিতিই একমাত্র দায়ী বলা যেতে পারে। এবং এই ত্রুটিতেই তাদের প্রতি ইংরেজের হঠাৎ প্রীতি গজাবার কারণও কেউ দেখলো না। তাই তারা সম্পূর্ণ-সুযোগটাও সহসা আত্মস্থ করতে পারল না।

তবু রাজানুগ্রহে উদ্ভূত এই নতুন মধ্যবিত্ত (মুসলিম) শ্রেণী মনের দিক থেকে যে চেতনা পেল' তারই ফল উনবিংশ শতাব্দীর মুসলিম সাহিত্য। মধ্যবিত্তের মতই

তার চেহার', একই বিত্ত বা বৃত্তিধর্মী। উন্নত সমাজ বোধ বা জীবন দর্শনের ছায়া তাতে নেই—তবে তা প্রাচীন সাহিত্য ধারা থেকে স্বতন্ত্র। অনেকটা হিন্দু ভাবাপন্ন—পাশ্চাত্য প্রভাব তখনও তাতে প্রবেশ করতে পারে নি। সেই দিক দিয়ে একটা নতুন সাধনা। জাগরণের স্পষ্ট-চিহ্ন না থাকলেও, তাঁদের কাছে কতগুলি বিশেষত্ব বাস্তব আকারে ধরা পড়েছে :

(১) মাইকেলী বিদ্যাসাগরী (রাম মোহনী) পর্বে হিন্দুগণের যেমন পাশ্চাত্য প্রভাবের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের আপন ঐশ্বর্যশালী ঐতিহ্যকে খুঁজে আনার একটা প্রচেষ্টা ছিল, এ যুগেও তেমনি নতুন ধর্মসংস্কারের মধ্যে তাঁদের ঐতিহ্যের নতুন বিচার ও প্রকাশের ব্যকুলতা ধরা পড়েছে।

(২) তারা নতুন করে বুঝতে চেষ্টা করছে তাঁরা এক স্বতন্ত্র ঐতিহ্য ও ঐশ্বর্যশালী প্রাচীন জাতি।

(৩) এই বাংলা দেশের সংস্কৃতিতেও তাঁদের দান অসামান্য নয়।

বলাই বাহুল্য ওহাবী দৃষ্টিভংগী থেকে তাঁদের এই অতীত পর্যালোচনার দৃষ্টি ভিন্নতর ছিল। তাই সাহিত্যে ও সমাজে একটা রীতিমত সংস্কারের নতুন বোধ তখন দেখা যাচ্ছে। রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তন, ওহাবী আন্দোলন ও মনীষার অভাবেই একান্ত তার প্রকাশ যথাযত হতে পারছিল না। তবু এটা Revivalism -এর যুগ।

কায়কোবাদের সাহিত্য সাধনার শুরু ঠিক এই পরিবেশে। তাঁর মহাকাব্য রচনার পেছনে ছিল এই Revivalism বোধ। তাই একজন মুসলিম সমালোচক বলেন, "মীর মোশাররফ হোসেন ও কায়কোবাদের সাহিত্য আলোক সামান্য নয় বটে কিন্তু নৈরাশ্য ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ওহাবী পরিবেষ্টনে তারা যে সহজ ভাবে জীবনকে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন, এর হর্ষ, বেদনা ও প্রেমের মাধুর্য উপভোগ করতে পেরেছিলেন, জগতের অনাত্মীয় কখন তারা হয় নি—এর মাহাত্ম্যও কম নয়।'

'উপেক্ষিত মহাকাব্যের কবি'

মহাশ্মশান মহাকাব্য এবং উনিশ শতকের কাব্য (যদিও তার সমাপ্তিপর্বটা এসে থেমেছে বিংশ শতকের মুখে)। এখানে লক্ষণীয় 'মহাকাব্য' এবং 'উনিশ শতকের কাব্য' এ দুটি শব্দই স্বয়ং সম্পূর্ণ। অতএব তার ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

মহাকাব্য বলি তাকে, যে কাব্য বিশেষগুণে ও বিশেষ রীতিতে বিশাল অন্ততঃ মহান। 'যাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে' মহাভারতের বিশালত্বের প্রমাণে এই প্রবাদটুকু যথেষ্ট বিবেচিত হয়। এ কাব্য মহানও বটে, এবং সেটাই তার প্রাণধর্ম রক্ষা করে। জীবনের—বরং বলা যাক জাতীয় জীবনের একটা বিশেষ দিককে উদ্ঘাটন করে বলেই মহাকাব্য সম্পর্কে জাতির একটা দুর্বলতা থাকে। Aber Crombic এই দিকটিকেই তার মহাকাব্যের সংজ্ঞায় আনতে চান এবং জোর করেই প্রচার করেন, 'It must give some significance of life... ।'

বাংলা সাহিত্যে উনিশ শতকের মহাকাব্য ছিল একটা Remoute মানসের কাব্য। বাঙালীর জাতীয় ঐতিহ্যে সাহিত্যদৃষ্টির এমনি প্রয়াস ছিল আপন ভিত্তির সংগে দুরান্বয়ী। মহাকাব্যের বিশেষ গঠনের কালটুকুও ছিল তার অপর্যাপ্ত। অপরিণত মানসের উৎকেন্দ্রিক সংস্কৃতবিলাস থেকে তার হঠাৎ উৎক্রমণ, সে যেমন বেগে এসেছে, তেমনি বেগেই অন্তর্হিত হয়েছে। জাতীয় জীবনে তার প্রভাব সম্পর্কে, জাতীয় সাহিত্যের পরবর্তী ধাপে তার প্রভাব সম্পর্কে খুব বড় করে প্রচার করা অন্যায় হবে। সুবোধ সেনগুপ্ত মাইকেলের উপর তাঁর বিখ্যাত বক্তৃতায় সে আক্ষেপ করেছে। এই আক্ষেপের কারণে উপরোক্ত যুক্তি ছাড়াও দ্বিতীয় যুক্তি দেওয়া চলে। হিন্দু সংস্কৃতিতে যে মহাকাব্য পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল মাত্র, পাশ্চাত্য প্রভাবের মোহ ঘোচার সংগে

সংগে তার প্রতিক্রিয়াও তাই অবশ্যম্ভাবী ছিল। মুসলমান সমাজে তখনও পাশ্চাত্য মোহমদের ফেনা উপচে পড়ে নি, তার নিজস্ব সংস্কৃতিতে সে তখন ক্রমবিত্তশালী। মুসলিম সংস্কৃতিতে গীতিকাব্যের চেয়ে মহাকাব্যের গুণগত বৈশিষ্ট্য সেদিন অসার্থক হয়ে পরে নি।

হিন্দু কণ্ঠ থেমে গেলে কায়কোবাদের আসর গ্রহণে তাই আমরা আশ্চর্য হই না।

॥ দুই ॥

কায়কোবাদের আবির্ভাব ঐতিহাসিক, আর তাঁর ঐতিহাসিক দৃষ্টি মহাশ্মশান কাব্য। কায়কোবাদ সম্পর্কে আমাদের পূর্বোক্ত অভিমতেরই সমর্থন এই মহাশ্মশান কাব্য।

কায়কোবাদের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ সম্ভবত এটাই যে তিনি ভুল মহাকবি। দ্বিতীয় অভিযোগ মহাশ্মশানকে স্ফীতকায় করে কাণ্ডজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়াছেন।

প্রশ্ন দুটিতে স্ববিরোধিতা লক্ষ্যণীয়। মহাকবি হয়ে ভুল করেছেন কি ঐতিহাসিক দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন সে বিচার আমরা আগে করেছি। এবং সেখান থেকেই আমরা এ যুক্তি অনুসরণ করতে পারি যে মহাশ্মশান চম্পূ কাব্য হলে এ প্রশ্ন আমাদের তোলা সম্ভব হোত না। মহাশ্মশানের মহাভার তাকে মহাভারতের অনুগামী করেছে। বলা বাহুল্য দৃষ্টিটা মুসলিম কবির আপন সংস্কৃতি পরিমণ্ডলের জীবনাবেগ ও উদ্দীপনা আশ্রিত। মহাশ্মশান এ যুগের মহাভারত।

প্রথমত কাহিনীর দিক থেকে। মহাভারত যদি জাতীয় উপাখ্যান এবং জাতীয় বীরদের-ন্যায়ধর্ম, সত্যপ্রীতি ও প্রেমের কাহিনী হয়ে থাকে, মহাশ্মশান সেই আদর্শের কোটিতে স্থান পাবে। মহাভারতের কাহিনীর জটিলতার চেয়ে আদর্শের দ্বন্দ্ব ঘটিত সূক্ষ্মতা তাকে জনপ্রিয় অথবা বহুজননিন্দিত করেছে। এ কাহিনীর প্রধান ভিত্তি জাতীয় চরিত্রের অবশ্যম্ভাবী বিকাশ এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে জাতির এবং জাতীয় ধর্মের মর্মানুসন্ধান। মহাকবি কায়কোবাদ মহাভারতের এই দৃষ্টিভংগীতে সম্মুখ আদর্শ করেছেন। আমাদের জাতীয় জীবনে এ এক মস্ত লাভ।

রামায়ণের একক কাহিনীর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও জটিল গ্রন্থি উন্মোচনের নাটকীয় প্রক্রিয়া মহাভারতের অনুসৃতি নয়। মহাভারতের সরলতার ধারই তাকে ভার দিয়াছে। এই সরলতা হোমারের, এই সরলতা জাত মহাকবির। কায়কোবাদ সম্পর্কে বলতে গিয়ে একজন আধুনিক সমালোচক বলেন, 'জীবনে ছিলেন তিনি নিতান্ত অমায়িক ও শিশুর মত সরল। তাঁর কাব্যে ও চরিত্র-চিত্রণে, ভাষা ব্যবহারে, উপমা ও অলংকার প্রয়োগে এবং তাঁর জীবনাদর্শ ব্যাখ্যায় ও রূপায়ণে তিনি সর্বত্র এমনি এক অপূর্ব সারল্যেরই পরিচয় দিয়েছেন। সারল্য স্রষ্টার আনন্দ জনিত মহাকবিরই সারল্য। কায়কোবাদের এই কাহিনী নির্বাচনের দৃষ্টি ঐতিহাসিক। ভারতীয় হিন্দু মুসলমানের জাতীয় জীবনের দুঃখময় একটি স্থূল ঘটনাকে গ্রহণ করে তার মর্মগত সত্যের তাৎপর্যটুকু উপলব্ধি করে তাকে সূচ্যগ্র করে তোলাই তাঁর উদ্দেশ্য। এখানে তাঁর অনুভূতি একটা বিশাল দায়িত্ব নিষ্পন্ন করেছে। জাতীয় জীবনের সুপ্ত কাহিনী উদ্ধার ও তাকে তাৎপর্য মণ্ডিত করে পরিবেশনের মধ্যে তাঁর যে মানসিকতার পরিচয় নাই, সেকালে শুধু মুসলমানদের মধ্যে কেন, হিন্দু লেখকদের মধ্যেও তা খুঁজে পাওয়া যাবে না।

মহাশ্মশানের চরিত্রগত দিকটি এই, আপন সাহিত্যিক পরিবেশে এ এক ব্যতিক্রম সৃষ্টি। আপন সাহিত্যিক পরিবেশের যে বাহির দিক সেটি এই: 'ঈশ্বর গুপ্তের আবির্ভাবের সংগে সংগে হিন্দু সমাজে কবিওয়ালাদের যুগের অবসান ঘটে, কিন্তু দোভাষী পুঁথির অবসান ঘটেনি।' তখন মুসলমান সমাজে দোভাষী পুঁথির প্রচলন খুব বেশী ছিল।...শালীন মর্যাদাসম্পন্ন সাহিত্যের সংগে তাদের বিশেষ যে সম্পর্ক ছিল তা বলা চলবে না।' এই পরিপ্রেক্ষিতে শুধু গীতিকাব্য নয়, মহাকাব্যের আংগিক-চেতনা কায়কোবাদের প্রগতিমুখীন চেতনারই পরিচয়। মহাশ্মশান মুসলমান-সমাজের সেই প্রগতির বাণী।

কায়কোবাদ সরাসরি কাহিনী রচনার একটি নতুন রীতিরও প্রচলন করেন। এটি তাঁর প্রতিভার আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য। আবুল কালাম শামসুদ্দিন ঠিকই বলেছেন, "কায়কোবাদ সাহেব মহাশ্মশান কাব্য রচনায় মৌলিকতার গৌরব

দাবী করতে পারেন। শত সহস্রগুণন-সত্ত্বেও মেঘনাদবধ ও বৃত্রসংহার কাব্যদ্বয়কে মৌলিক সৃষ্টি বলা যাইতে পারে না। কারণ এ কাব্যদ্বয়ের plot রামায়ণ ও মহাভারত এই দুই মহাকাব্যের অংশ বিশেষ হইতে গৃহীত। কিন্তু মহাশ্মশান-রচয়িতার সম্মুখে তেমন কোন সরল মহকাব্য উপস্থাপিত ছিল না। মহাশ্মশানের Plot নীরস ঐতিহাসিক ঘটনা হইতে সংগ্রহ করিয়া কাব্যের সরস তুলিকায় একজন নতুন করিয়া আঁকিতে হইয়াছে। ইহাই মহাশ্মশান কাব্যের মৌলিকতা।'' ও এখানে উল্লেখযোগ্য যে, পৌরাণিক ভিত্তি থেকে দূরে সরে এসে নিজস্ব মন ও মানের পরিচর্যার যে সুযোগ তিনি ব্যাপক ভাবে গ্রহণ করেছেন, তাই তাকে হেমনবীন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত কবিজনের থেকে স্বাতন্ত্র্যে মর্যাদাসম্পন্ন করেছে। এ দাবী কায়কোবাদের একক। এখানে আমরা আরো লক্ষ্য করবো, তিনি গতানুগতিকতার কত উর্ধে ছিলেন। আপন প্রতিভার ওপর কতখানি আত্মবিশ্বাসের জোরে তিনি এ পথ গ্রহণ করেছিলেন, তা ভাবতেও আজ ভাল লাগে। বলতে ইচ্ছা হয়, মহাকবিদের মধ্যে তিনি ছিলেন আধুনিক এবং আধুনিক মননে বিশ্বাসী।

মনন এবং কাহিনী পরিকল্পনার দিক ছাড়া মহাশ্মশানকে দ্বিতীয় মহাভারত বলার দ্বিতীয় যুক্তি তার চরিত্রের মুক্তি; মহাশ্মশানের বহু নায়কত্ব কাব্যে যে ভার এনেছে তার বহু ব্যাপকতার সুযোগ এসেছে তাতেই। নায়ক সন্দিগ্ধ মনে এককভাবে কাউকে হৃদয়ে স্থান দেবার প্রলোভন প্রতিবারই প্রতিটি চরিত্রের মুখেই নাটকীয় রসের সৃষ্টি করে। নজীবদ্দৌলার আপন মাহাত্ম্য যে মুহূর্তে শীর্ষ-স্থান স্পর্শ করে তখনই হয়ত গরীয়ান ভংগীতে চলা শুরু করে বিশ্বনাথ কিংবা সুজাওদ্দৌলা কিংবা কাদি। প্রতিটি চরিত্রই এমন এক এক স্থানে এসে ফিরে যায় যে তখন তাদের অসম্পূর্ণতার সমষ্টির দিকটি অপূর্ব রহস্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। এক নায়কত্বের অভাব বহুনায়কত্বে ফিরে গিয়ে এমন একটা প্রতীতির জন্ম নেয়, যা মহা-কাব্যোপম এবং কাহিনীরসের মিশ্রিত সৃষ্ট।

বহু নায়কের মধ্যে আব্দালী চরিত্রটি পরবর্তী সৃষ্টি হলেও গৌণধর্মিতায়ও অনন্য। রোহিলা নায়ক যদি অর্জ্জুন, অব্দালী তবে যুধিষ্ঠির। নজীব অক্লান্ত কর্মবীর এবং নিপুন যোদ্ধা; আব্দালী পুরুষসিংহ, ন্যায়নিষ্ঠ। নজীব তাঁরই আশ্রয়ে দ্বিগুণতর

বলীয়ান। যুদ্ধক্ষেত্রে নজীব প্রায় সর্বত্র কিন্তু আব্দালীর সংগে যোগাযোগহীন নয়। তার স্বাধীনতার অভাবটাই তাঁকে অর্জ্জুনের সমগোত্রতা দিয়েছে। আব্দালী পরাজিতের প্রতি ন্যায়নীতি গ্রহণ করে ইসলামের মূলনীতিকে প্রকাশিত হবার সুযোগ দিলেও কুরুক্ষেত্রজয়ী যুধিষ্ঠিরের ধর্মকেই অন্তরে প্রতিপালন করেছেন। দ্বি-নায়কত্ব সমস্যার অভিযোগটিকে আমরা এ ভাবেই খণ্ডন করতে পারি।

এ কথা সত্য যে এ যুগে বিরাট কাব্যগ্রন্থ কোন কবির ক্ষেত্রেই প্রত্যাশিত নয়। পাঠক আজ শুধু পাঠক নয়, নাটকের পাত্রও নয়; জীবিকান্বেষীও বটে। সে জ্ঞান ছিল বলেই মাইকেল সংক্ষিপ্ততার প্রশ্রয়ী; রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের শিষ্য। কিন্তু এ প্রশ্নও বিবেচ্য যে, কাব্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে পূর্ব-নির্ধারিত আইন শালায় তার প্রেরণাকে পাত্রস্থ করার যুক্তি কোথায়। সকলেই যেমন কবি নয়, সকলে তেমন পাঠকও নয়। মহাকাব্য এবং যথার্থ লিখে তিনি যদি কবি ধর্মকেই রক্ষা করে থাকেন, তবে তা দূষণীয় হয়নি। কায়কোবাদের পরেও মহাকাব্যের ধারা যে অনুসৃত হয়নি তা নয়, তবে প্রতিভাহীন বলে কেউ আর পাঠককে জাগিয়ে তুলতে পারেন নি; এবং এটা যে একান্তই অনুপ্রেরণার ব্যাপার 'বনি আদমের' লেখককে দিয়েই সে প্রমাণ দাঁড় করানো সম্ভব।

কায়কোবাদের অনুপ্রেরণা মহাকাব্যের অনুপ্রেরণ; হোমরের অনুপ্রেরণা, মিল্টনের নয়। এই অনুপ্রেরণাকে যথার্থ রূপ দিতে গিয়ে তাঁকে কয়েকটি মৌলিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। প্রথমতঃ, যুগ সমস্যা (ভাব সমস্যা), দ্বিতীয়তঃ, রূপ সমস্যা। কায়কোবাদের মধ্যে যুগচিত্তের প্রকাশ ঘটেনি এ অভিযোগ ভিত্তিহীন; আমরা তা ওপরে লক্ষ্য করেছি। কিন্তু তাকে প্রকাশ করতে গিয়ে তাঁর দৃষ্টিকে রাখতে হয়েছে উদার। এবং তাঁর শিল্পজ্ঞনোচিত কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় পাই এখানেই।

কায়কোবাদ জানতেন তাঁর বিরুদ্ধে হিন্দুভাবাপন্নতার অভিযোগ আসবে। কায়কোবাদ জানতেন হিন্দু মুসলিম উভয় চরিত্রের ঔদার্য ও বিশালতা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচারের প্রয়োজনীয়তা। যুগের ধারাটিকে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, তাই ক্ষুদ্রতার সংগে তাকে রীতিমত লড়াই করতে হয়েছিল। যুগ সমস্যাকে কাটিয়ে তিনি চিরকালের দিকেই দৃষ্টি রেখে একটা অটল ভিত্তিতে নিজকে আত্মরক্ষা করেছিলেন। সাম্প্রদায়িকতার বিষকুম্ভ তাকে স্পর্শ করে নি।

এই ভাবগত আদর্শ ছাড়া যুগচিত্তে যে দ্বিতীয় আন্দোলন সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবল হয়ে উঠেছিল, তা ব্যক্তি রস। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও তার আত্মরচিত চিন্তা মানুষের মনে সর্বক্ষণ যে tragedy-র জন্ম দেয়, তা-ই জন্ম দেয় গীতিকাব্যকে। গীতিকাব্যের স্থুর ব্যক্তির নিজস্ব সুর, এই রস ব্যক্তি রস। কিন্তু মহাকাব্য এই রসাশ্রিত কাব্য নয়। কায়কোবাদ মহাশ্মশানে আপন প্রাধান্যকে আপন করেন নি, তার কারণও এই যে মহাশ্মশানের প্রতিটি চরিত্রই বাস্তব মহাভারতের মত কেবল ভার-মণ্ডলের প্রাণীই তারা নয়। বাস্তবতা মানুষকে প্রতিষ্ঠা দান করতে গিয়েই তার মূল লক্ষ্যকে স্থাপন করেছে মহাবেদনার তীর্থে। মহাশ্মশান তাই সাংকেতিক নয়, সাংগীতিকও।

গীতি সুরের স্বপ্ন বিলাস যেখানে রহস্যময় প্রাকৃতিক পরিবেষ্টন সৃষ্টি করেছে, পাঠক চিত্ত সেখানেই সুপ্রসন্ন—কাল্পনিক প্রণয় কাহিনীতে নয়, তার ঐতিহাসিক-তারও নয়, তার প্রেম নিষ্ঠায়ও নয়। দ্বিতীয়তঃ, রূপগতদিক থেকে কায়কোবাদ অপরূপ। শিল্পশৈলীর পরিচয় দিয়েছেন। বহুকক্ষ সমন্বিত প্রকোষ্ঠ তার মহাকাব্যটির আংগিকগত বৈশিষ্ট্যই এই যে তার বিশালতার ভারকে আধুনিক যুগোপযোগী করার চেষ্টায় তিনি ক্রমেই সরলতাশ্রয়ী, ক্রমেই বাস্তবমুখীন ক্রমেই মানবিক। কবি ভাষা ও কাব্যরীতির পরিবর্তন এখানে কাম্য। এবং এরই বিরুদ্ধযুক্তি এই যে তা মহাকাব্যের অন্তরঙ্গ কিংবা বহিরঙ্গের বৈশিষ্ট্য-সূচক নয়।

।। তিন ।।

কায়কোবাদ এবং মহাশ্মশানের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলিকে প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করে বিচার করা গেল :

(১) কাল ও আবির্ভাবের উপযোগিতার বিচারে

(২) মহাকাব্য রচনার যুক্তি ও সম্মুখ আদর্শ বিচারে

(৩) মহাশ্মশানের বিরাটত্বের প্রশ্ন বিচারে

এবারে গ্রন্থের অভ্যন্তরে দৃষ্টি সঞ্চারণের সামান্য সুযোগ সম্ভব।

কাব্য হিসাবে মহাশ্মশান বিরাট চিত্রশালা এবং বহু নায়ক কিংবা ঘটনা এবং শান্ত ও রৌদ্ররসের বিচিত্র সমাবেশে গরীয়ান। এখানে জাতি ধর্মগত

স্বাতন্ত্র্য স্বীকারে যুদ্ধ ঘোষণার পাশাপাশি রয়ে গেছে সেই সব যোদ্ধাদেরই অতল প্রেমনির্ঝরিণী। বস্তুত বহু বিচিত্র ঘটনা ও রসের সংমিশ্রণে ও কাহিনীর উত্তরঙ্গতায় পরিণত হয়েছে 'a story with varying episodes' যা বহু এবং একক। এই পৃথকত্বের মধ্যে ঐক্যসূত্র আবিষ্কার স্বভাবতই এর নাট্য রসের বিকাশ ঘটিয়াছে এবং নাটকের পঞ্চসন্ধির ক্রমবর্ধমান ধাপে এর একটা উত্তুঙ্গ পরিস্থিতিও সম্ভব হয়েছে।

আমরা আগেই বলেছি এ কাব্যের epic structure মহাভারতের (মহাকাব্যের) গুণধর্মী। এ কাব্য রচনায় কবির অক্লান্ত শ্রম, নিষ্ঠা ও সাধনার মর্যাদা কোন দিনই ম্লান হবে না।

কেবল বৃহদায়তন দানই এ কাব্যের পেছনে কবির শ্রম নয়, বর্ণনার নান সূক্ষ্মদিক, প্রকৃতি বন্দনা এবং বর্ণনার ঐশ্বর্যের দিক, পরিবেশানুযায়ী চিত্র ও শব্দ ব্যবহার, বীরের নির্দ্বন্দ্ব মানসিকতা ও নারী চরিত্র অংকণেও তাঁর এই শ্রম প্রশংসারই। এবং সকল কিছুর পেছনেই তাঁর যে একটা পূর্বকল্পিত দৃষ্টি ও দৃষ্টির সংযম ও স্বচ্ছলতা বিরাজ করে এইটেই এ কাব্যের পূর্ণ রসাস্বাদনে বিপুল ভাবে সাহায্য করে।

কায়কোবাদ প্রেমিক কবি, এ পরিচয় কায়কোবাদের অনন্য। এ প্রসংগে তাহেরুন্নেসার উক্তিঃ 'কবির কবিত্বশক্তি প্রেমের ভিতর দিয়াই ফুটিয়াছে।' কায়কোবাদের প্রেমিকারা একাধারে পাশ্চাত্য বীরাঙ্গনা এবং প্রাচ্যবধূ। জোহরা, কৌমুদী, সেলিনা এরা প্রত্যেকেই স্বাতন্ত্র্যে, বীর্যে, কিংবা প্রেমে বা স্নেহে প্রেরণাদাত্রী ও সহকর্মিণী। এখানে মুসলিম ঐতিহ্যের প্রতিফলন আছে বলে বিকৃতি ও রোমান্স-ধর্মিতার অতিরঞ্জন লাভের সুযোগ ঘটেনি এবং সেজন্য মাইকেল কিংবা হেম-নবীনের নারী ও বীরাঙ্গনা চরিত্রগুলির চেয়ে এরা অতি সহজে পাঠকের একাত্মতা লাভ করে। রণ দামামা ছাড়িয়ে এদের প্রেমের হাহাকার ও শূন্যকামের ব্যর্থতা পাঠককে সজল করে তোলে এবং পাঠকে এই sympathy মহাকাব্যের জন্য কাম্য; সমালোচক তাই বলেন, epic must be tragic. এখানে কবি মানুষের life-force-এর বিরুদ্ধশক্তি মানব ভাগ্যের (Fate) অমোঘতার significante symbolism (Abercrombe)-কে আভাসিত করেছেন, এ ক্ষেত্রে এটাও তার অন্যতম কীর্তি। কায়কোবাদের প্রেমের দৃষ্টি আধুনিক। উনিশ শতকের কবি হয়েও উনিশ শতকের আদর্শে তাঁর গোটা

পরিচয় বিধৃত নয়। সমাজ সচেতনতা, সমাজ মানসের দ্বন্দ্বে (conflict) কবি মানসে প্রতিক্রিয়া, জাতীয়তাবাদের Reveivalism, স্বদেশ প্রেম ও জাতি বৈরীতার সূচনা প্রভৃতি সবই উনিশ শতকীয় আদর্শ। এবং এর মধ্যে (contradiction) এটাই যে এই পাশ্চাত্যধার্মিতা কেবল গোষ্ঠী প্রীতির জাত্যাভিমানেই নিষ্পেষিত। তাই ১৯ শতকের কাব্য প্রচেষ্টা নতুনতর দিগন্তের সাক্ষাৎ দিয়েছিল কিন্তু বৃহত্তর জীবনের সন্ধান দিতে পারে নি।

সাহিত্যের নতুন দিগন্ত উদ্ভাসিত হয়েছে মুক্ত বুদ্ধি সম্পন্ন বিংশ শতাব্দীর নতুন কবিদের হাতে। কিন্তু জীবনকে প্রেমিকের দৃষ্টিতে দেখা, তার ব্যথা বেদনা সম্পর্কে অবহিত হওয়া, জীবনের অসম্পূর্ণ দিনগুলির শূন্যতা ও হাহাকারের মধ্যে নতুন মহাত্ম্য, নতুন ব্যঞ্জনা নিয়ে আসা, প্রভৃতি যে সব connotation নতুন যুগের সাহিত্যের সংজ্ঞায় এসে যুক্ত হয়েছিল তার বিস্তৃতির দিকটি না হলেও গভীরতার দিকটির উন্মেষ হয়েছিল কবি কায়কোবাদেই।

কায়কোবাদ হেম-নবীনের অনুসারী হয়েও তাঁর এই মৌলিক দিকটি তাকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। তাঁর সাহিত্যিক মতবাদটি তাই আধুনিকতামুখী, দূরপ্রসারী এই বিশিষ্ট দৃষ্টিভংগী মহাশ্মশানকে তার কাব্যগুলোর উর্ধে স্থান দেবে। পরবর্তী সাহিত্যে এর প্রভাব এবং পরবর্তী কবিদের জীবনে এই অনুপ্রেরণা যে কাজ করেছে বহুভাবে তাঁরা তা স্বীকার করে গেছেন।

ভাষার ওপরে দখলের কথাও এ প্রসংগ স্মরণীয়; সে প্রশংসা কায়কোবাদ প্রতিটি মহল থেকেই পেয়েছেন নিন্দুকেরাও সে কথা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হবে।

পরিশেষে একথা আমাদের বলতেই হয় যে নিন্দাই কায়কোবাদের ভূষণ; তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ এবং নিন্দা বরাবর এসেছে কিন্তু কবিতার দৃষ্টধর্ম থেকে বঞ্চিত হন নি। একটির পর একটি কাব্য গেঁথে বাংলা সাহিত্যের গলায় পরিয়ে মুগ্ধ হয়ে তার রূপ দেখেছেন, কে কি বললে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করেন নি। তাদের সম্পর্কে তার বিখ্যাত উক্তিটি দিয়েই কবির কাব্য সম্পর্কে শেষ কথা উচ্চারণ করা যাক—

সজ্জন গুণ খোঁজে, দোষ খোঁজে পামর,
মক্ষিকা ব্রণ খোঁজে, মধু খোঁজে ভ্রমর।।

মহাকাব্যে কায়কোবাদ

"হায় গিরি হৃদি তব কঠিন পষাণ"—এর কবি যখন মহাবেদনার তীর্থ মহাশ্মশানে গেয়ে ওঠেন—

নিবে যাক রবি শশী, নিবুক তারকা হাসি
আঁধার—আধার শুধু ভবে

তখন তাঁর মূল ভিত্তি থেকে তিনি বড়ো দুরে থাকেন না। তাঁর মানস বিহার ক্ষেত্র মূলতঃ এই গীতিকাব্যে যেখানে হৃদয়ের হাহাকার সকল কিছু থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং বস্তু সত্যকে ছাপিয়ে হয়ে ওঠে মহৎ। কায়কোবাদ গীতিকবি এবং মহাকবি দুই-ই এবং দুই সত্তায় বিরোধ নেই কোথাও।

কাব্য সাহিত্যের প্রধান শাখা গীতিকাব্য না মহাকাব্য এ-তর্ক আজকের দিনে আর সমস্যা নয়। কিন্তু কায়কোবাদকে এ সমস্যা পীড়িত করেছে সুদীর্ঘ দিন। মুসলমান কবিদের মধ্যে প্রধান ছিলেন বলেই এ সমস্যাকে বাস্তব দৃষ্টি থেকে সরিয়ে দেখতে বাধ্য হন তিনি। পূর্বপুরুষদের শৌর্য-বীর্যের কাহিনীকে প্রতিফলিত করার দায়িত্ব তাঁর অবচেতন চিত্তে প্রবল কাজ করেছেঃ আর এর পরিণাম, আমার এই কাব্যখানা (মহাশ্মশান) পাঠ করিয়া কেহ আমাকে ভাল বলুন আর মন্দই বলুন—সে জন্য আমি দুঃখিত নহি ··· আমার হৃদয়ে কোন ভাবান্তর উপস্থিত হইবে না।" (মহাশ্মশান, পৃঃ ১)

একদিকে ভাবালুচিত্ততা ও হৃদয়ের প্রবল হাহাকার অন্য দিকে মহাকাব্য রচনার প্রববল 'গো' এ দুয়ের সমন্বয় কখনো হয় না, হতে পারেনা—যদি না মেনে নেই এই মহাকাব্য আংশিক হিসাবে স্বতন্ত্র হলেও তা' মূলতঃ এ যুগের সৃষ্টিধর্মের বৈশিষ্ট্যে ও গুণে অন্বিত। তাতে 'প্রাচীন মহাকাব্যের' রস অপরিহার্য নয়।

কায়কোবাদের মহাকাব্য রচনামূলে এই বৈজ্ঞানিক বোধটি অনুপ্রেরণার কাজ করেছে। তাই তাঁর মহাকাব্য আর "বহু কবির রচিত বহু কাহিনী মূল বিষয়টির চতুর্দিকে শাখ-প্রশাখায় পল্লবিত হইয়া উঠে, সর্বশেষ কবির অলোক সামান্য প্রতিভার স্পর্শে গল্পগুলি একত্র সন্নিবদ্ধ হইয়া একটা সু-সমঞ্জস শিল্প মূর্তিতে অপূর্ব বিরাটত্ব লাভ করিয়াছে।"—এ নয়।

কায়কোবাদও প্রতিধ্বনি করেন, "পুরাতন দলের··· হেম নবীন মধুসূদন দীনেশ···প্রভৃতি কবিগণ চলিয়া গিয়াছেন।" (ভূমিকা ঃ শিবমন্দির) আধুনিক কবি কায়কোবাদ নন, কিন্তু আধুনিক যুগের ঘণ্টা তিনি শুনেছেন" এবং অন্ততঃ একবার তিনি সে ঘণ্ট স্পর্শও করেছেন—তাঁর মহাশ্মশান কাব্যে, যেখানে তিনি বঙ্গীয় কবিগণের" মৌলিক মহাকাব্য রচনার প্রতি উদাসীনতা লক্ষ্য করে দুঃখ অনুভব করেছেন (মহাশ্মশান, দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা দ্রষ্টব্য)।

মহাকাব্য সম্পর্কে কবির ধারণা বিশ্লেষণ করার আগে (পটভূমি হিসাবে) তাহলে আমরা উল্লেখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি ঃ

* অশ্রুমালায় কবির প্রকাশ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল ; এখানেই কবি নিজেকে আবিষ্কার করেন এবং মুসলিম কবিদের প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষমতা ও অধিকার প্রাপ্ত হন।
* মহাকাব্য রচনা তাঁর পক্ষে ঐতিহ্যগত ও প্রয়োজনের দিক থেকে আকস্মিক ছিল না ;
* মহাকাব্যকে তিনি সমাজমানসের প্রতিনিধি কাব্য হিসাবে পেলেও আপন মৌলিকতার মূল্য তাতে কম দেননি। এবং এখানেই তাঁর ব্যক্তিত্বের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ঘটেছে ;
* মহাকাব্যকে তিনি আধুনিক কাব্যরসে (গীতিকাব্যের রস) জড়িত করার পক্ষপাতী ;
* মহাকাব্যের প্রয়োজনে তিনি কাহিনীরস গ্রহণ করেছেন, আসলে তাঁর মধ্যে কতগুলি ভাবই কাজ করেছে যেগুলির খণ্ড খণ্ড প্রকাশ ও নানাদিক থেকে

ব্যাখ্যা অশ্রুমালায় অনুপস্থিত নয় ; মহাকাব্যের কবি অশ্রুমালার কবি থেকে স্বতন্ত্র নয় ।।

সুতরাং মহাকাব্য সম্পর্কে কায়কোবাদের যে ধারণা তার একটা বিশেষ প্রকৃতি থাকা স্বাভাবিক এবং বাঞ্ছনীয়। কবির কতগুলি উক্তি পাশাপাশি বসিয়ে এ সমস্যার সহজতর উপায় বের করা যেতে পারে। কবি তাঁর মহাকাব্যের ভূমিকায় বলেন,

(ক) খণ্ডকাব্য ও মহাকাব্য : 'বহুদিন হইল আমি অশ্রুমালা লিখিয়া সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলমে ... মহাশ্মশান স্বর্গ, অশ্রুমালা মর্ত্য।...অশ্রুমালাতে কেবল কবির অশ্রুজল, আর মহাশ্মশানে হিন্দু ও মুসলমান সাম্রাজ্যের অতীত স্মৃতির চিতা ভস্ম।'

এখানে কবি খণ্ডকাব্য ও মহাকাব্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ লক্ষ্য করে অশ্রুমালায় অর্জ্জিত সুখ্যাতি হৃদয়ের একটা বিশেষ স্তরের সামান্য সঞ্চয় ছাড়া আর কিছু ভাবেন না। অর্থাৎ "কেবল প্রেমপূর্ণ খণ্ড কবিতা লিখিয়া গৌরবান্বিত" নন কবি। কেন না, তিনি জানেন, "মহাকাব্য তাহা নহে ; তাহাতে বিশেষ একটি লক্ষ্য আছে?"

কবির কাছে এই লক্ষ্যই মহৎ ; তার উপাদান স্বতন্ত্র। তার কোথায় একটা উদ্দীপনাশক্তি আছে, গীতিকাব্যের ক্ষীণসুরে যা একান্তই অভাব।

(খ) কাব্য ও মহাকাব্য : "কতকগুলির মধুর ও কোমল শব্দ যোজনা করিয়া একটি পদ পূরণ করিয়া দিলে, কি কতকগুলি চরণ মিলাইয়া একটি শ্লোক দাঁড় করাইলে কবিতা হয়না, কবিতা প্রাণের জিনিষ প্রাণের উপরেই উহা ক্রিয়া ক'রে।... প্রকৃত কবিতা মানব হৃদয়ের নীরব তন্ত্রীতে আঘাত করিয়া উহা হইতে এক মধুময় সুর বাহির করেও ভাবুক হৃদয়ের সুপ্ত ভাবগুলি জাগাইয়া তাহাদিগের হৃদয়ের সেই হারানো কথাগুলি গুছাইয়া আনে। কবিত্ব কি নাচনী ছন্দে? —কবিত্ব ভাবে। ভাবই কবিত্বের প্রাণ—তাই গদ্য পদ্য উভয়ই কবিতা। আজকাল শব্দ সম্পদে অনেকেই কবি, ভাবে নহে।"

কাব্য ও মহাকাব্য সম্পর্কে কবির ধারণা স্বভাব কবির ধারণা। উভয় রচনায় তিনি কি ভাব কল্পনায় কি শব্দ প্রয়োগের ও শ্লোক রচনায় সাধারণ কবিত্ব শক্তির উপর নির্ভরশীল।

(গ) মহাকাব্যঃ "তাহাতে (মহাকাব্যে) বিশেষ একটি লক্ষ্য আছে,—কেন্দ্র আছে। কবি কোন একটি বিশেষ লক্ষ্য ঠিক রাখিয়া ও ভিন্ন ভিন্ন গঠন প্রনালীর অনুসরণ করিয়া নানারূপ মাল-মাসলার যোগে বহু কক্ষ সমন্বিত একটি সুন্দর অট্টালিক নির্মাণ করেন। ইহার প্রত্যেক কক্ষের সহিত প্রত্যেক কক্ষেরই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, অথচ সকল গুলিই পৃথক, সেই পৃথকের মধ্যেই আবার একত্ব।" মহাকাব্যের এই স্বরূপ চিরন্তন, কিন্তু এখানে চিন্তার থেকে উপলব্ধিই বড়োঃ "মহাকবি কায়কোবাদ মহৎ দার্শনিক কিংবা বুদ্ধিমান কবি (Intellectual) ছিলেন না—কিন্তু উপলব্ধিতে ছিলেন সৎ এবং উদার। উপলব্ধির এই বিশেষ আধ্যাত্মিক শক্তিতে কায়কোবাদ মহাকাব্যের সকল জটিলতার অবসান ক'রেছিলেন—অন্যদিকে তাঁর গীতিকবিমনেরও মুক্তি ঘটেছিল যথেচ্ছ।"

(ঘ) মহাকাব্যের ছন্দ ও ভাষাঃ ভাষাগত দিক থেকে মহাকাব্যের স্বাতন্ত্র্য কি হবে এ বিষয়ে কবির একটা মত ছিল। এই মত তার নিজস্বঃ কিন্তু তা সাহিত্যিক তাৎপর্যহীন নয়। অথচ এরই জন্য কবি যুগের কবি হয়েও যুগের অনাত্মীয় হয়ে ছিলেন। কবির মতে ভাষাকে জটিল করে তোলা আর কাব্যকে যথেষ্ট শক্তিশালী করে তোলা এক নয়। আগেরটা 'হেঁয়ালী' পরেরটা 'প্রস্রবন'।

ছন্দ সম্পর্কেও কবির ধারণা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। কবি লক্ষ্য করেছেন, মধুসূদনের পর এক নবীন সেন ছাড়া "অমিত্র ছন্দের সেই আবেগময়ী ওজস্বিতা ও তটিনীর ন্যায় সেই তরঙ্গায়িত অথচ জীবন্ত মধুরতা" কেউ আনতে পারেন নি। কবি অনুমান করেন এর কারণ আধুনিক কবিদের হেঁয়ালীপনাবৃত্তি এবং ভাবের দৈন্য; যার জন্য এখনকার কবিগণ কেবল "নদীর জল" 'আকাশের তারা' 'ফুলের হাসি" 'মলয় পবন' ও 'প্রিয়তমার কটাক্ষ' লইয়াই পাগল।"

(ঙ) **মহাকাব্যের চরিত্রঃ** উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির সমন্বয়ে যে মহাকাব্য কবি রচনা করতে চান তার বিশেষ চরিত্র ও একটা তাৎপর্যও বর্তমান। কবির ধারণা এ হেন মহাকাব্য প্রথমতঃ হবে মৌলিক য চর্বিত চর্বন নয়; এবং তা হবে স্বতঃউৎসারিত; দ্বিতীয়তঃ, তা সত্যকে ভিত্তি করে গড়ে উঠবে, সত্যের অপলাপ কবি সহ্য করতে পারেন না; তৃতীয়তঃ, তা স্বভাব কবির ভাবে ও কবিত্বে রসময় ও আকর্ষণী হয়ে উঠবে; চতুর্থতঃ, জাতীয় চেতনার বিশেষ রূপের চাইতে তিনি তার মধ্যে ঔদার্যের রূপকেই প্রত্যক্ষ করতে চান যা কাব্যের সৌন্দর্য ও স্বাভাবিকত্বের অতিরিক্ত ত-ই বর্জনীয় এবং পঞ্চমতঃ, চিত্রাঙ্কন জ্ঞানের সেই পরিচয়ই এখানে ফুটবে যা সর্বরুচি ও রসবোধের বিপরীত নয়। কবির ভাষায়, "চিত্রের যে স্থানে যে বর্ণ টুকু যে শেডটুকু দরকার তাহা না দিলেই চিত্র খারাপ হয়; তদ্রূপ কাব্যেও যেস্থানে যে রসটুকু যে ভাবটুকু —যে অলংকারটির প্রয়োজন, তাহা ন দিলেও কাব্য খারাপ হয়। কলুষিত ও রসবোধের দিক থেকে নিম্নশ্রেণীর কাব্য মহাকাব্য হতে পারে—মহাকাব্য হতে পারে না—মহাকাব্য সম্পর্কে এটিই কবির সিদ্ধান্ত।

মহরম শরীফ কাব্যে কিংবা কায়কোবাদের শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য মহাশ্মশানে এই কঠোর সিদ্ধান্তেরই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। তিনি ঠিকই বলেন, "মহশ্মশান স্বর্গ" মহরম শরীফকে এই স্বর্গের মুক্ত আকাশ বলতে পারি—কেননা মহাশ্মশানের বলিষ্ঠ প্রতিধ্বনি উচ্চারিত হয়েছে এই দ্বিতীয় অম্বরে।

"মহাশ্মশান কাব্য যে গুণে অশ্রুমালা থেকে স্বতন্ত্র তা সাধারণ নয়; তা কাব্যগতও নয়। এ পার্থক্য ভাবের পার্থক্য; অশ্রুমালাতে কেবল কবির অশ্রুজল আর মহাশ্মশান হিন্দু-মুসলমানের অতীত স্মৃতির চিতা ভস্ম।" বক্তি থেকে ব্যক্তিতে এই উৎগমণ কবির জীবনে আধ্যাত্মিক উন্নতির সীমারেখাকে যেমন একদিকে বর্দ্ধিত করে তেমনি বিশেষ উপলব্ধির একটা মহনীয় স্তরে এর একটা বস্তুর দিককেও প্রকাশ করে। মহাশ্মশান, কাব্য তাই কবির উপলব্ধিজাত সত্যের ও আধ্যাত্মিক অরূপের মিশ্রণ। ভাবে এবং বস্তুতে এখানে এক হয়ে মিশেছে। এবং তা যথার্থ মহাকাব্যের মর্যাদায় হয়েছে ভূষিত।

এই দ্বিবিধ প্রক্রিয়ায় মহররম শরীফও অশ্রুমালা থেকে গোত্রহীন এবং মহাশ্মশানের স্বগোত্র। মহররম শরীফে সত্যনিষ্ঠা ও বাস্তবতা আরো শৃংখলিতরূপ নিয়েছে—মহাশ্মশানে অশ্রুমালার যে ছিটেফোঁটা থেকে গিয়েছিলো (তার কারণ পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে) এখানে তাও শুধু উপলব্ধির সংঙ্গে মিশে গেছে, স্বতন্ত্র প্রকাশের অপেক্ষা রাখেনি।

উভয় কাব্যে স্বভাব কবির হাত আছে। নিম্নোক্ত বর্ণনা-চেষ্টা কবির হতে পারে না:

"আমি হ'ব রাজা আর তুমি হবে রাণী!
জোহরা, শোননি তুমি রমজানের চাঁদে
আমাদের উভয়ের হবে পরিণয়,
তুমি ভার্য্যা, আমি স্বামী, দুই জনে মিলি
একটি নতুন রাজ্য করিয়া গঠন
আমি হ'ব রাজা আর তুমি হবে রাণী!"

এখানে শেষ বাক্যটি দ্বিতীয়বার ব্যবহার করা হয়েছে এবং এটাই হচ্ছে স্বভাব কবির রাজ-কাজ। এর যে অতিরিক্ত অর্থ, মোহনীয় ব্যঞ্জনা তা ধরা পড়ে তখন, যখন তাকে আবার আবৃত্তির জন্য অপেক্ষা করতে হয় না। এর স্বাদ অন্যত্র অসম্ভব। ভাবে ভাষায় এর বাস্তবতাও অনুপম অস্বাদ্য।

মহরম শরীফ কিংবা তার পূর্ববর্তী কাব্য মহাশ্মশান মহাকাব্য কিনা কিংবা মহাকাব্যের মর্যাদা লাভে কতটুকু যোগ্য—এখানে এ বিচার প্রাসংগিক।

এ আলোচনায় আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনাকেই টানতে হবে। তবে, এখানে, কবির নিজস্ব ধারণা ও কবি-মানসের কথা উল্লেখ না করে সাধারণ দৃষ্টিতে একটা প্রাথমিক আলোচনার গুরুত্ব রয়েছে। সার্থক মহাকাব্য বলা যায় কাকে এখানে এ প্রশ্ন অগ্রগণ্য।

আধুনিক সমালোচনায় রামায়ণ মহাকাব্যের পর্যায়ে পড়ে কিনা এ তর্ক উঠেছে আধুনিক বিচারের নিরিখে রামায়ণ বড়ো ব্যক্তিকেন্দ্রিক; অন্যদিকে মহাভারত

ভারতের শৌর্যবীর্যের কাহিনী এবং সে কাহিনীতে পরিণতির জন্য ততটা উৎকণ্ঠা নেই যতটা উৎকণ্ঠা এর প্রতিটি ভাব, চরিত্র ও কাহিনীর স্তর ও পর্যায়ের জন্য। ধর্মের কাহিনীটা তাই এখানে উৎক্ষিপ্ত ভাবা স্বাভাবিক। কিন্তু পাঠকের দিক থেকে সার্থক মহাকাব্য বোধ হয় রামায়ণই।

মহাকাব্যের সার্থকতা বিচারের কোন স্বতন্ত্র মাপকাঠি নেই। মহাকাব্যের নানা শ্রেণী এবং এক এক শ্রেণীর কাব্যেরই আবার নানা বৈচিত্র্য।

তবে মহাকাব্যে বিশ্বনাথ যে দিকগুলি উল্লেখ করেছেন আংশিকগত ও ভাব-গত দিক থেকে তার তাৎপর্য মানহীন নয়। প্রথমতঃ, রসের দিক থেকে, দ্বিতীয়তঃ, পটভূমি ও প্রধান চরিত্রের দিক থেকে এবং সর্বোপরি এ কাব্যের আয়তনের সুনির্দিষ্ট বিস্তৃতি ও তাকে ছন্দান্বিত করার প্রক্রিয়াদির দিক থেকে তাঁর উক্তি শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যগুলির কথাই স্মরণ করায়।

রসের দিক থেকে কায়কোবাদ করুণ রসকে উপজীব্য করেছেন। তিনি এ বিষয়ে পাশ্চাত্য নির্দেশকেই গ্রহণ করেছেন, "An epic must be a tragedy" এবং এই tragedy আসে সর্বমুহূর্তের seriousness থেকে। নায়কের tragedy-তে এ কাব্য সমাপ্ত হয় এবং সেখানে এ ভাবটাই দেখানো হয়, যেন এমনিই শেষ হয়। পানিপথের যুদ্ধ এবং কারবালার ময়দানে কায়কোবাদ কাব্যে এই বাস্তবতাই এনেছেন; তাই এর হাহাকার মনকে পাথর করে তোলে প্রায়।

মহাকাব্যের পটভূমি স্বর্গ-মর্ত-পাতাল প্রসারী। কায়কোবাদ সেইজন্য ফেরেস্তা-গণের কাহিনীকে সরস করে তুলেছেনে।

চরিত্র সম্পর্কে বিশ্বনাথের যে নির্দেশ, মহর্ষি বাল্মীকি তাকে খুঁজতে গিয়ে হতাশ হয়েছিলেন বলে গল্প আছে। রামচন্দ্র ছিলেন দেবচরিত্র এবং ঐতি-হাসিক। ইমাম হাসান হোসেনও তাই; এবং পানিপথে ভারতের স্বাধীনতার জন্য কিংবা মুস্লিম বীরত্বের ঐতিহ্য বৃদ্ধির জন্য যারা প্রাণ দিয়েছিলেন, তাঁরাও তাই। এঁরা সবাই ক্ষত্রীয়; তবে কেউ ধীর, কেউ উদাত্ত।

কাব্যের আয়তন বৃদ্ধি অর্থাৎ সর্গভাগ সম্বন্ধেও কায়কোবাদ যথাযথ নিয়ম পালন করেছেন। সর্গভাগ ছাড়া তিনি কাহিনীকেও স্তরভাগ (খণ্ড) করেছেন। কৌশলে সেই খণ্ডগুলি একত্র গ্রথিত করে করেছেন পরিণতিমুখী।

সর্বশেষে আসে ভাষা ও ছন্দের কথা। বিশ্বনাথ এরকম কাব্যে একই জাতীয় ছন্দ 'অন্তভাগে অপর জাতীয় ছন্দের' পক্ষপাতী। তবে এর ব্যতিক্রমও তিনি মেনেছেন। কায়কোবাদ সেদিক থেকে বোধ হয় বাংলা মহাকাব্যে একটা বৈশিষ্ট্যেরই সূচনা করেছেন।

কিন্তু কায়কোবাদের সংযোজনা কেবল—এইটুকুতে যে এ কাহিনী স্বকপোল-কল্পিত কিন্তু বাস্তবতাবর্জিত নয়। মহাকাব্যের এই ধারা আগে ছিল না, পরেও রচিত হয়নি। যুগের বিশেষ মুহূর্তে এই প্রকাশ একটা আকস্মিক ঘটনা যেমন আকস্মিক ঘটনা ভারত চন্দ্র কিংবা শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন। এরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধারার আদি কবিও বটে, শেষ কবিও বটে।

কায়কোবাদের মহাকাব্য কাহিনী ও ইতিহাসের দিক থেকে যথাযথ। অংকন কুশলতায় তা documentative হয়ে উঠেছে। মহাকবি হিসাবে কাব্যের এ শাখায় যে চমৎকারিত্বের চেয়ে অভিনবত্ব আনতে পেরেছেন—এ কৃতিত্ব তাঁর অবশ্যই প্রাপ্য।

কাজী নজরুল ইসলাম

'নজরুল কাব্যে নিত্য ও চিরন্তন মূল্য'

কবিরা অমৃত প্রাণ।

তবু কবিতার জন্ম সেই প্রাণে-যে প্রাণ জীবনের দ্বন্দ্বে আহত, যে প্রাণে মৃত্যুর লাঞ্ছনা নিয়ত দুর্ভোগ্য।

এ আঘাত যত না জীবনের তারও বেশী প্রাণের, প্রাণের; এ্যমিবা তাই এ আঘাতে দ্বিধা হয়, একেই বলি কবির জাগৃতি। Yeats-এর সুন্দর ভাষায় 'With our quarrel with others we make rhetoric, with our quarrel with ourselves Poetry'-এ সত্য ভঙ্গীসর্বস্ব নয়। 'বড়ো জালা আসে এই বুকে' নজরুলের এই উক্তি Yeats-এর উপরোক্ত কথারই প্রতিধ্বনি। যন্ত্রণা কবি ধর্মেরই মূল স্বভাব; কবি যেখানে নির্বিরোধ সত্যের মুখোমুখী, সেখানে তার কবি সত্তার সমাধি ঘটতে বাধ্য।

নজরুলের যন্ত্রণা নজরুলকে বিদ্রোহী করেছে: এই যন্ত্রণার সুতীব্র প্রকাশ ঘটেছে তাঁর কাব্যে। নজরুল কাব্যে বিদ্রোহটাই বড় নয়, বড় তার তীব্রতর প্রকাশ ভঙ্গীটাই। কবি নজরুল যন্ত্রণায় সৎ এবং আবেদনে সুখী। কবি যেখানে অনুভূতিতে সৎ, সেখানে তাঁর প্রকাশও স্বচ্ছ হতে বাধ্য। নজরুল এই সততায় চারণ কবির রূপ নিয়েছেন, বিদগ্ধ কবি হননি। লোক সমাজে চারন কবির মূল্য আছে কিন্তু সাহিত্যে তার মূল্য অনিশ্চিত।

নজরুল কাব্য বিচারে যে চিরন্ততার প্রশ্ন উঠেছে তার জন্য তাঁর কাব্য যতনা দায়ী তারও বেশী দায়ী তাঁর কবি স্বভাব।

নজরুল সম্ভবতঃ বাঙ্গলার শেষ চারণ কবি অর্থাৎ শেষ বাঙালী কবি। নজরুলোত্তর যুগে আর স্বভাব কবির জন্মাবার সুযোগ নেই, জন্মে কাজও

নেই। এমন কি বাংলা সাহিত্যের যে মৌলিক ধারার আজ আমরা উত্তরাধিকারী, সেই রবীন্দ্রধারাই আজ সংসয়ের ক্ষেত্র সৃষ্টি করে তুলেছে এবং বুদ্ধদেব বসুত স্পষ্টই ঘোষণা করেছেনঃ **Rabindranath was an European who wrote in Bengali.**

বর্তমান সাহিত্য বিশ্বের সাহিত্য; সাহিত্যকর্মকে আজ তাই চেষ্টায় বিশ্বের দরবারে দাঁড় করাবার ক্ষমতা অর্জনের মধ্যেই সাহিত্যের উন্নতি ও ভবিতব্য নিহিত। সাহিত্যে চিরন্তনতা আজ আর সমস্যা নয়, আজকের সমস্যা সাহিত্যের বিশ্বরূপে ও সেই নিখিল আবেদনে।

সেকালের সাহিত্যে দেশ প্রেমের গানে বিশ্বপ্রেমের স্বাদ গ্রহণ করা হতো। একালে বিশ্বপ্রেমের মধ্যে তাকে ছড়িয়ে দিয়েই আপন দেশের কথাটুকু খুঁজে বের করতে হয়। স্থূল কথা, সেকালের সাহিত্য ছিল সমষ্টিগত আবেদনের, একালে তা ব্যক্তিগত আবেদনে এসে পৌঁছেছেঃ এই ব্যক্তি আজ বিশ্বরূপের প্রতীক বিশ্বের অহঙ্কার এবং তার পরাজয় আজ আর সমষ্টির কাছে সমষ্টিগত উপায়ে অনুভূত হবার নয়। ব্যক্তিরূপের কাছে তা সূক্ষ্মতর কিন্তু সার্বজনীন।

নজরুল ছিলেন দেশপ্রেমের কবি, যেমন রবীন্দ্রনাথ প্রাক নজরুল হয়েও বিশ্বপ্রেমের কবি।

নজরুল যে যুগের উন্মাদনায় নিজের বন্যাকে সংযত করতে পারেন নি। সেই একই যুগ উন্মত্ততার কবি সতেন্দ্রনাথ। কিন্তু সতেন্দ্রনাথে তার রূপ ছিল সংহত। সত্যেন দত্তের কবি প্রকৃতি ছিল সহিষ্ণুতাধর্মী। তিনি মনে করতেন, এই উন্মত্ততা এই অধীরতা এবং পরশাসনের গোলযোগ সামাজিক বিবর্তনে একদিন মিথ্যায় মিলিয়ে যাবেই। নজরুলের বিদ্রোহ এবং বিদ্রোহের আকাংখা সত্যেন দত্তে বিদগ্ধ চিন্তায়, রাবীন্দ্রিক বিশ্বমানবতায় ও দীর্ঘকালের তিতীক্ষায় প্রতিষ্ঠিত। তাঁর চিন্তার সমসাময়িকতার আঘাত চিহ্ন আছে কিন্তু দ্রুত ফললাভাকাংখায় তা কোথাও হঠাৎ উচ্চকিত নয়। সত্যেন দত্তের দৃষ্টি কৃষ্টি ও সৃষ্টিধর্মের সঙ্গে এখানেই তার পার্থক্য।

সেদিন রবীন্দ্রনাথ আস্বাদ্য হতো* সত্যেন দত্তে — ছন্দে ; মিষ্টি অনুপ্রাসে, সহজবোধ উদারতায় ও দেশাত্মবোধে, এমন কি বাংলার প্রকৃতি বর্ণনায়ও সতেন্দ্রনাথ ছিলেন রবীন্দ্রনাথেরই স্বয়ং সম্পূর্ণ একটি ক্ষুদ্র আকার এবং নজরুল তারই পরিপূরক।

পরিপূরক বলেই তিনি স্পষ্ট এবং স্পষ্টবাদী। সমকালীন কবিদের সঙ্গে এখানেই তাঁর পার্থক্য। নজরুলের সমকালীন কবিদের মধ্যে যুগের মন্দ আবহাওয়ার প্রভাব অত্যন্ত প্রকট, বলা যাক বিকট। এবং এমনও সন্দেহ করা যেতে পারে যে, সেদিন তারা একদিকে রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যদিকে ইউরোপীয় সাহিত্যের আশ্রয় খুঁজে না পেলে বাংলা কাব্যজগতে নৈরাজ্য উপস্থিত হত অনেকটা পাকিস্তানোত্তর অনুর্বর কাব্য ক্ষেত্রের মতো।

সে যুগের কাব্যক্ষেত্রের আবহাওয়ার মোটামুটি চেহারা ছিল এমনি—

(ক) আদর্শ ভিত্তিক জীবনের নিশ্চিহ্নতার জন্য দুঃখবোধ

(খ) এই পলায়নীমনোবৃত্তির অন্য আশ্রয় ছিল শোপেনহাওয়ার—হামসুন—লরেন্স (দেহবাদ)

(গ) অথবা বক্তব্যের দুর্বোধ্যতায় নিজের চারদিকে, দুর্ভেদ্য প্রাচীর নির্মাণ

(ঘ) অথবা আশাভঙ্গজনিত কারণে এলিয়ট চর্চা, যদিও সেখানে আসন্ন দুর্যোগের হাত থেকে পরিত্রাণের চিন্তা স্পষ্ট হতে পারে নি

(ঙ) এবং এসবের মূল 'রবীন্দ্রবিরোধিতা' এবং সত্যেন দত্তের কাব্যভঙ্গীকে ভেঙ্গে নতুন ইঙ্গিত ও সার্থকতার অন্বেষা।

বস্তুতঃ এই সব ধারা স্ব স্ব ক্ষেত্রে তাদের বিশেষ মূল্যে প্রতিষ্ঠিত হলেও সামগ্রিকভাবে এদের কোন সার্বজনীন আবেদন ছিল না যুগপ্রবৃত্তির কাছে। এর ফলে মোহিতলাল, যতীন সেন গুপ্ত খুব অল্প দিনেই রস সংযোজনার অভাবে মরুভূমির নদীর মতো হারিয়ে গেলেন ; জীবনানন্দ দাশ আরো পরে এসে পরিচিত হলেন,

* রবীন্দ্রনাথের কাব্যকে তিনি ঠিক সেই পরিমাণে ভেজাল করে নিয়েছিলেন যাতে তা সর্বসাধারণের উপভোগ্য হতে পারে। তখনকার সাধারণ পাঠক রবীন্দ্রনাথে যা পেয়েছিলো বা রবীন্দ্রনাথকে যেমন করে চেয়েছিলো তারই প্রতিমূর্তি সতেন্দ্রনাথ। (বুদ্ধদেব বসু)

এবং সুধীন দত্ত বিষ্ণু এঁরা এখনও মূল্যায়নের প্রতীক্ষায় রয়েই গেলেন। মোটামুটি বলা যায় যে, সে যুগের যে চাহিদা ছিল উত্তর বলাকা যুগে রবীন্দ্রনাথ যা আভাসে বলতে গিয়েও তাঁর আপন স্বভাবসিদ্ধ ক্রটিতে (?) বলতে পারেননি, রবীন্দ্রোত্তর কবিগণ যে চাহিদা মেটাতে কেউবা যুগের অনুসরণ করে স্বপ্নলুব্ধতায় পারাপার করেছেন, কেউবা যুগের আগে চলেছিলেন অর্থাৎ যুগপ্রকৃতিকে আপন প্রকৃতির মধ্যে মেশাতে পারেননি। যার জন্যে বাংলা কবিতায় নতুন সুর ও সুরের বৈচিত্র্য আসা সত্ত্বেও পাঠক সাধারণ তৃপ্তি পেতে পারেনি, সেই যুগপ্রবৃত্তির অভাব মোচন হয়েছিল নজরুলের আবির্ভাবে।

নজরুল পাঠকদের যেমন তৃপ্তি দিলেন, তেমনি তৃপ্ত করলেন নতুন কবিদেরও নতুন পথে মুক্তির আশ্বাস ও ইংগিত দিয়ে। যারা সত্যেন দত্তকে মেনে নিয়ে সতেন্দ্রনাথ তথা রবীন্দ্রনাথ থেকে আলাদা হবার চেষ্টায় ছিলেন, তাঁরা এবার নজরুলকে মেনে নিয়ে নজরুল থেকে আলাদা হবার চেষ্টা করতে লাগলেন নিজেদের বক্তব্য স্পষ্ট হবার আকাংখায়। মাইকেলকে বাদ দিলে নজরুলের আবির্ভাব ধূমকেতুর আবির্ভাবের মত ; বাংলা সাহিত্যে তা একক। কিন্তু ইতিহাসের আলোচনায় এ আবির্ভাব আকস্মিক বিবেচিত হয় না। নজরুলের আবির্ভাবের পেছনে দুটি বড় জিনিষ কাজ করেছে, একটি কবির দারিদ্র্য যা বাঙ্গলাদেশের প্রায় কবির ভাগ্যেই সাধারণ, যদিও এতটা প্রকটভাবে আর কারো জীবনে আসেনি দ্বিতীয়টি তার মাতৃ-স্নেহ-মুক্ত মন। কবি ছেলেবেলায় পিতৃহারা হন, কিন্তু তাই বলে মায়ের আঁচলে অনাথ বালকের মত মানুষ হননি। মুক্তমন পাবার এই সুযোগ কবি আজীবন সদ্ব্যবহার করেছেন। পেশাগত জীবনে তিনি বিভিন্ন অভিজ্ঞতা পুঁজি করেছেন এবং এই কারণে তার আপন ধর্মসংকার ও বিশ্বাসকেও তিনি মুক্ত দৃষ্টিতে দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন, এবং হিন্দু ও খৃষ্টানী সংস্কৃতি তাঁর কাছে একটা কৌতুহলী বিষয় হতে পেরেছিলো। অবশ্য সব কিছু তার জীবনে ঘটেছে স্বাভাবিক ভাবে অবিকৃতির মধ্যে। তাঁর মধ্যে ভাঙ্গন এসেছে, প্রলয় এসেছে, দুর্দমগতিও এনেছে কিন্তু কোথাও বিকৃতি আসেনি। তাঁর পক্ষে তাই শীলানু-শীলন সম্ভব হতে পেরেছিলো, যেমন হয়েছিল মাইকেলের পক্ষে। এবং মাইকেল অঙ্গিকে ও অনুপ্রেরণায় ছিলেন পরাশ্রিত, তাই বেশীদূর যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়নি, নজরুলের প্রেরণা ছিল স্বভাবজ তাই ক্রমবিবর্তনে এগিয়ে যাওয়া তার

পক্ষে সম্ভব হয়নি। 'নজরুল সত্যের সৈনিক ছিলেন' এই উক্তি এখানে স্মরণ করা যেতে পারে, নজরুলের মুক্ত মানসিকতা, অকৃত্রিম প্রকাশ, অকুণ্ঠ বিবেচনা এ সবেরই প্রেরণা তাঁর জীবনলব্ধ সত্য প্রকাশের দুর্দমনীয় বাসনা। নজরুল তাই আপন বাসনার কবি চারণ কবি, নজরুল কবি সৈনিক।

এমনি যার আবির্বতন, এমনি যার যুগ বেদনা তথা আপন মনোবেদনা প্রকাশের ক্ষমতা ও সেই ক্ষমতার এমনি যে সৎ এবা অকৃত্রিম তাঁর কাব্যের যে সহজ মূল্যায়ণ আজকাল দেখা যায়, তাতে ইতিহাস কতটুকু সন্তুষ্ট, সেইটে পরীক্ষা করতে হবে। কোন সাহিত্যই কাল নিরপেক্ষ নয়, ইতিহাস অসংলগ্ন ও নয়। মহাকাব্য পরে আমরা সেকালের অলিখিত ইতিহাসের কথা জানি আবার সেই ইতিহাস জেনেই আমরা মহাকাব্য পাঠে উৎসাহ বোধ করি। প্রত্যেক সাহিত্যের আঙ্গিকে ও ভাবরূপে একটি বিশিষ্ট দেশকালের মানসিকতা বিধৃত থাকে। মানুষের জীবন নিয়ে সাহিত্য সমাজে জীবন সচল সাহিত্যে স্থবির। সত্য এই পরিবর্তনশীল জীবন ও জীবনোপলব্ধির সঙ্গে সম্পর্কান্বিত। সুতরাং জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে এই সবেরও পরিবর্তন আসতে বাধ্য। সাহিত্য সেই পরিবর্তনের ইতিহাস বা ডায়রী হিসাবে থেকে যায়। [এলিয়ট তাই বলেন, কাব্য বিচারে ইতিহাসবোধই আমাদের সহায়।] অতএব আমরা এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি।

(১) সাহিত্যে চিরন্তনতা একটা আপেক্ষিক তত্ত্ব মাত্র ;

(২) প্রতিভা সাহিত্যকে চিরন্তনতা দেয় না, সাহিত্যকে বাঁচিয়ে রাখে আমাদের অর্থাৎ পরিবর্তনশীল মানুষের ইতিহাসবোধ ও চেতনা ;

(৩) সাহিত্যের চরমতম মূল্যায়ণ সম্ভব নয়, কেননা ইতিহাসবোধ কোন কালেই মানুষকে প্রয়োজনাতীত স্বচ্ছদৃষ্টির অধিকারী করে না ; এবং

(৪) যে সাহিত্যের মূল্যায়ণ পণ্ডিত ও মনীষী মহলে নেই, সাধারণের কাছে তার অন্তরতর আবেদন থাকতে পারে তাতে সাহিত্যের আভিজাত্য স্বীকৃতি না পেলেও সাহিত্যিক মূল্যে তা ন্যূনতম পর্যায়ে গিয়ে পড়ে না।

নজরুল সাহিত্যের বিচারে তাই সাধারণের মত সহসা কিছু বলা উচিত হবে না—তাতে কবির প্রতিও সদাচার করা হবে এমন নয়। নজরুল যে শোষণহীন

সমাজব্যবস্থার কথা বলেছেন, ইকবালও একই প্রেরণা থেকেই তাঁর নিজের ভাষণে তিনি আরো সোচ্চার, উগ্র এবং রুষ্ট। তাই বলে ইকবালের আবেদন ফুরিয়ে গেছে এ উক্তি মোটেই আকাংখিত নয়। দ্বিতীয়তঃ নজরুলের কাল যদি অতীত হয়ে গিয়েও থাকে, তবু ইতিহাস ও সাহিত্যরসিকজনের কাছে অতীত সাহিত্য হিসাবে তা অপাঠ্য হয়নি তার কবি প্রকৃতিই চিরকালের আদরণীয়। তাছাড়া, নজরুল উত্তরসুরীদের মধ্যে যে বর্তমান রয়েছে, এ কথা অস্বীকার করবার যো কোথায়। কাজী ওদুদ সাহেব নজরুলের সাহিত্যিক জীবনকে চারটি স্তরে ভাগ করেছেন (১) ১৯২২ সন পর্যন্ত অর্থাৎ 'বিদ্রোহী' প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত (২) 'বিদ্রোহী' প্রকাশের পরবর্তি যুগ (৩) গান ও গজল রচনার যুগ এবং (৪) তাঁর যোগী জীবনের যুগ। এই বিভিন্নস্তরে তাঁর রচনার স্বাদও বিভিন্ন, আবেদনও তা বৈচিত্র্যবাহী। নজরুল কাব্যের এই প্রতিটি স্তরেই যে নজরুল আজ মৃত, এ ঘোষণা কেবলমাত্র গায়ের জোরের।

কামাল পাশার মৃত্যুর পর মোহাম্মদীতে কোন কবি লিখেছিলেন, কামাল মরে নাই মরিয়াছে নজরুল। নজরুল এর জবাব দেন 'নবযুগের' (১৯৪১) ভার নিয়ে। নজরুল সম্বর্ধনা সভায় P. C. Roy তার ভাষণে চমৎকার ভাবে নজরুলের মূল্যায়ণ করেন—নজরুল মৌলিক কবি, যেহেতু সে অন্য কোন কবির আওতায় পড়েনি। নজরুল ভারতের একমাত্র সৈনিক কবিও বটে। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরোভাগে থাকবে একমাত্র নজরুলেরই গান। বলা প্রয়োজন, ১৯৩৫ সালেই কবির কাব্য প্রেরণা ফুরিয়ে এসেছিল এবং জীবনের নানা সমস্যায় জড়িত থেকে তিনি কাব্যজগতের বাইরে থাকতে বাধ্য হন। ১৯৪১-৪২ সালে তার দ্বিতীয় আবির্ভাব সেদিন একটা বৈশিষ্ট্য এনেছিলো। অনেকদিন পরে কবিকে ফিরে পেয়ে জনগণের মনে আশার সঞ্চার হয়। কিন্তু কবির মনে তখন আশা ভঙ্গের খেদ—পূর্বদের তৃষ্ণা নিয়ে যে এমটি আশান্ত তরুণ এই ধরায় এসেছিল, অপূর্ণতার বেদনায় তারই বিগত আত্মা তোমাদের মাঝে কেঁদে গেল। তিনি প্রেম দিতে এসেছিলেন, সেই প্রেম হিন্দু মুসলিম বিরোধে ধুলোয় ছড়িয়ে গেল। কবির মনে সে দিন যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় তার থেকে জন্ম হয় তার অধ্যাত্মবোধ সেদিনও কবি সাম্প্রদায়িকতাকে বড় করে দেখেন নি কিন্তু অস্বীকারও করতে পারেন নি। চল্লিশোত্তর কবিদের কার্যমার্গ তখন ভিন্ন

পথে, কখনও এলোরায়, কখনও বা চিন্তায় কিংবা রবীন্দ্রধ্যানে অথবা তথাকথিত বাস্তবতায় ;

হকারের লাইসেন্স নেই
ফুট পাথ থেকে উঠে যায়
আমাদেরো লাইসেন্স নেই
এ জীবনে দাঁড়াবো কোথায় ?

বলা বাহুল্য এ হকার নজরুলের কুলীরই প্রগতিরূপ মাত্র। কিন্তু সমাজের অগ্রগতির মোড়ে নজরুলের যে উপস্থিতি, এখানে তা নেই। এ সব কবিতার ভাবনার সাথে জনগণের চেষ্টা করে এসে মিলতে হয়, কিন্তু নজরুলের কবি-ভাবনা জনগণের মনের সমতলে অবস্থিত ছিল তার কারণ আগেই বলেছি নজরুল বিশ্বযুদ্ধোত্তর কবি, এরা বিশ্বকবি, নজরুল প্রকৃতির কবি প্রকৃতির নিয়মের ব্যাভিচারের জন্য তিনি বিদ্রোহী এরা', প্রকৃতির ব্যাভিচারের অগণিত সন্তানের কবি। নজরুল স্বভাব কবি এরা স্বভাবে বিদগ্ধ কবি।

নজরুল কাব্যের চর্চা হয় না যেমন হয়না রবীন্দ্রসঙ্গীতের অন্যতর সুর কিন্তু রবীন্দ্রকাব্যের চর্চা হয়, ভারতীগোষ্ঠীর কবিরা এমন কি সত্যেন দত্তই তার প্রমাণ। আধুনিক কবি কর্মও বিদগ্ধ চিন্তা চর্চার ফল। কিন্তু নজরুল সাহিত্য প্রাকৃতিক সাহিত্য।

নজরুল সাহিত্য নজরুলের আবির্ভাবের মতই একতম। তাই তার চিরন্তন মূল্যে অবিশ্বাস ও একটা সামরিক অনীহা মাত্র। আধুনিক বাংলা কাব্য নজরুলকে ভুলতে পারে না।

সনাতন নজরুল

কবি নজরুল—কাজী নজরুল ইসলাম সনাতন কাল এবং আমাদের সনাতন চিন্তার সংগে একাত্ম হয়ে কবির আসন এবং কাজীর মূল্য দুই-ই হারিয়েছেন। একজন চিংপ্রকর্ষবাহী বিংশশতকের কবি হিসাবেই নজরুল আমাদের স্মৃতি-উৎসবের কেন্দ্র; ক্রমশঃ কেন্দ্রচ্যুতির 'সর্বনাশের ভাগ্যে' যিনি অ-চির-চিহ্নিত হবেন। এই ক্রমবিলুপ্তি কিংবা "অন্তপারে হারিয়ে যাওয়ার" কারণ ঃ

(১) তাঁর 'অনমনীয় বিদ্রোহ';

(২) কাব্যাশ্রয়ী ঐতিহ্যের অনুস্থিতি;

[T. S. Eliot-এর ভাষায় যা 'বিশেষ শিবিরাশ্রয়ী' নয়।]

(৩) তৃতীয় কারণটি আমাদের স্বকৃতঃ নজরুল মূক হওয়ার সংগে সংগে আমরা তাঁর সম্পর্কে মুখর হয়ে উঠেছিলাম এবং রবীন্দ্রনাথের সংগে প্রতিতুলনায় আমাদের উদ্দেশ্যবাচকতা রবীন্দ্রনাথের কোন ক্ষতি করে নি বটে, কিন্তু নজরুল সম্পর্কে মূল ও মৌল আলোচনার জন্য এযাবৎ আমর পরদেশীয় সমালোচকদের ওপরই নির্ভর করে থেকেছি। অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথকে যত গালাগাল করেছি নজরুলকে নিয়ে তত (আলোচনার) দরবার করিনি।

আমাদের অসম্পূর্ণ নজরুল-পাঠ বর্তমানে অনীহায় পরিণত হয়েছে। মনে হয় আমাদের কাব্যবোধের গোড়াতেই মিশ্রণ আছে। [এই মিশ্রণ-চূর্ণের সংবাদ রাখতেন নজরুল।] এই মিশ্রণের কারণ সম্ভবতঃ আমাদের অন্তরে বহু ঐতিহ্যের আলোক এবং সামাজিক ও লৌকিক এবং রাজনৈতিক ইতিহাসের জটিলতা—বৃটিশ শাসনকালে আমাদের শিক্ষা (Academic) ও অর্থনৈতিক জীবনের কাঠামোভঙ্গ থেকে যার উৎপত্তি।

এবং আদিকাল থেকে বাঙালী মুসলমান কেন্দ্রে কেন্দ্র বিভিন্ন সাংস্কৃতিক নির্মোকের অন্তর্বাসীও সহচর। এমনটি হওয়ার কারণ নৃতত্ত্ববিদগণের কাছে স্পষ্ট। ফলতঃ নজরুল সম্পর্কিত কোন স্পষ্ট চিন্তা আমাদের নেই। রাষ্ট্রের বাঁধন শিথিল থাকার পর্বে আমরা নজরুলকে নিয়ে যত চিন্তা ও উৎসব করেছি, এখন তা করি না—কারণ এখন আর কোন বিশেষ শিবিরের কর্তৃত্ব নেই এবং নজরুল-চর্চা যেন বিশেষ গোষ্ঠির কর্তব্য ; সবার নয়। এক চট্টগ্রামেরই, গত কয়েক বছরের, নজরুল জয়ন্তীর খতিয়ান নিলেই এ কথা স্পষ্ট হবে। এর জন্য কেউ দায়ী নয় দায়ী আমাদের মন - যে মন কাব্যের দীক্ষা না নিয়েই কাব্যান্দোলন তথা নজরুল জয়ন্তীতে মেতেছিল ; আজ তা আপনা আপনিই চুপষেছে। এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কিছুকাল পরে, শ্লোগানের ভাষার জন্যও কেউ নজরুলকে সন্ধান করবেন না।

২

কথাটা বাহুল্য উক্তির মত শোনালো। কিন্তু সংস্কৃতিকরণের বা সংস্কৃতির লেন-দেনের জটিল অথচ গুরুতর পর্বগুলি আমরা এককালে যখন অজ্ঞান্তে, কিংবা চুপিসারে চুকিয়ে এসেছিলাম তখনকার মানস সংগঠন ও চিৎপ্রকর্ষসাধনের পালায় জাতি হিসাবে সকলের অংশগ্রহণের সুবিধাও ছিল না, প্রয়োজনও ছিল না। আজ সে প্রয়োজন বেড়েছে।

লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, গত ২০ বছরের মধ্যে প্রথম ১০ বছরের শিক্ষা ও সংস্কৃতি চিন্তার মান পরবর্তী ১০ বছরে ত্বরান্বিত হয়েছে অর্থাৎ আমাদের গণতান্ত্রিক দাবীগুলি Pure Academic পরিবেশ সৃষ্টি ও তার পরিসর বৃদ্ধিতে ফলিত হয়েছে। অবশ্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি উভয়ের মানোন্নয়ন পদ্ধতি একই সমতলে সংঘটিত হয় না, কেননা সেই সংগে অর্থনৈতিক চিন্তার সর্বগ্রাসী রূপ উভয়ের মানকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং কখনও সাহিত্যের মূলস্তম্ভকে অঘাত করে tearing down the last barriers of traditional morality of literary decency and the corporate feeling of the literate. গত বিশবছরের যাবতীয় শিক্ষণী গ্রন্থ ও অনুবাদ কর্মের হিসাব এ উক্তিকে সমর্থন করবে।

৩

অতএব ক্ষুদ্র পরিসরে কেবল এ উক্তিই এখানে যথেষ্ট যে, নজরুল চিন্তা আমাদের সংস্কৃতিকর্মকে প্রভাবিত করেনি বরং আমাদের শিক্ষা ও জীবনের উদ্দেশ্যবাচকতা নজরুল সম্পর্কে আমাদেরই পূর্বোচ্চারিত বাহুল্য উক্তিগুলি সম্পর্কে আমাদের সচেতন করে তুলছে এবং দ্বিতীয়, এখনকার পর্যায়ে নজরুলকে কেবলমাত্র একজন 'মৃত কবি' হিসাবে ভাবতে লজ্জা বোধ করছি না।

এ কথা সত্য যে নজরুল বিশেষ যুগ, পরিবেশ ও ঐতিহ্যের প্রকাশ ; একথা সত্য যে সত্যেনদত্ত কিংবা মোহিত লালের ব্যর্থতা নজরুলকে পক্ষাঘাত গ্রস্ত করে নি কিংবা সত্যেনদত্তের 'বর্তমান মুহূর্তে অতীতের জাগরণ' প্রকল্পের সীমাবদ্ধতা ও বৈয়াকরণিক ঋজুতা নজরুলের ছিল না; এ কথা সত্য যে 'বিদ্রোহ যুগে' কবি হিন্দু সভ্যতার কৃষ্টি ও মুসলিম সভ্যতার ভাবসত্যকে একই বক্ষে লালন করা সত্বেও প্রেমবাহী মুসলিম ঐতিহ্যের প্রতি পরবর্তীকালে গভীর ভাবে আকৃষ্ট হয়েছেন এবং মুসলিম অনুভূতি জাগ্রত করার জন্য দ্বিবিধ প্রক্রিয়া বা আচরণে উৎকর্ষ এনেছেন—সেই সব কালের কংকালকে কোন বচনের শ্রী-দেহে কতক্ষণ বা আঁকড়ে ধরে রাখা যাবে? নজরুল আজ উপস্থিত থেকেও অনুপস্থিতির লজ্জাকে সর্বাঙ্গে মেখে দাঁড়িয়ে আছেন। যে গণধারা এবং লোকগ্রাহ্য ঐতিহ্য ক্রান্তিলগ্নের চীরকে আশ্রয় করে উপমহাদেশের বিচিত্রবাহী সর্ব আন্দোলনে বাঙালী প্রভাব সৃষ্টির অনিবার্যতা আনয়নে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল নজরুলের মধ্যে, সংস্কৃতির নব 'সৈয়র মুতাক্ষরিণ' সৃষ্টির বীজ তার মধ্যে উপ্ত হলো না, এক নিরুপায় পরিণতি ঠেকাবার শক্তি তার ছিল না।

৪

প্রকর্ষভব মধ্য যুগের (Rich Middle Age) বাঙালী কবি 'বাঙলার নর-নারীকে মজবুদ ও কর্মঠ করিয়া তুলিবার জন্য দেবদেবীর জন্ম' ও প্রস্তাবিত সত্যের স্বীকৃতি কল্পে ভূমিদান করেছিলেন ; মিশ্রিত ধর্মের অবয়ব সৃষ্টি উনিশ শতকেরও কর্ম এবং সাহিত্যিক কারণ এখানে সর্বগ্রাসী ঃ পূর্ণায়ত বাঙালীর 'পজিভিটিজম' রামমোহন থেকে রায়বেরেলি – মধুসূদন থেকে মোশাররফে উচ্চকিত ১৮৯৯ পর্যন্ত এর একটানা গতি। তারপরই সামাজিক ও ব্যক্তি প্রেরণা এবং প্রকর্ষভাবনার

দ্বিমুখগতি সফল হলো এবং পরস্পরের প্রতি প্রচণ্ড অস্বীকার আনলো যুদ্ধের ডামাডোলের কালে। সবুজপত্র প্রকাশ কাল থেকে লক্ষ্য করা যাবে সংস্কৃতি চিন্তা আমাদের আন্দোলিত করেছে ও দ্বিতীয়ত সাহিত্য চিন্তা আমাদের হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। ফলতঃ শব্দকুশলী শিল্পীদের পুনরাবির্ভাব এ সময়কার অনিবার্য ঘটনা।

সন্ধানবাদীদের কার্যকলাপ (১৯০২), পাঁচ বছর ধরে বঙ্গ বিভাগ আন্দোলন ও ক্ষতিপূরণ স্বরূপ নব বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকল্পনা, অসহযোগ আন্দোলন (১৯১১) বাংলায় স্বাধীনতা আন্দোলন ও ভারতীয় পার্লামেন্টে বিতর্ক (১৯১৪, টেরারিসম (১৯১৫) খেলাফত আন্দোলন (১৯১৯) এবং ১৯২২ পর্যন্ত পরবর্তী রাজনৈতিক চিন্তাধারা বাংলা সাহিত্য শরীরে নির্দিষ্ট শৈলীগত পরিবর্তন স্থাপন করলো। আঞ্চলিক ও লোকসুন্দর কবি, দূরপ্রাচ্য সংস্কৃতির পুরোহিত কবি, মধ্যপ্রাচ্য প্রেমিক বিলাসী ও ভাববাহী কবি এবং তথাকথিত আন্তর্জাতিক সুবাসে বিভোর কবি [১. মার্ক্স ২. ফ্রয়েড ৩. মুসোলিনী ৪. আত্মবিগলিত গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দা অথবা ৫. নেগুচি প্রেমিকতা যাদের আপন সাহিত্য-সংস্কৃতির নির্মোচকে খণ্ডন করেছে ত্বড়িৎ হস্তে এবং নির্দ্বিধায়] —এদের আসর সংবাদপত্র সেবীদের কল্যাণে আরো আলোকিত হলো। বাঙালী সংস্কৃতি চিন্তা জটিল রূপ ধারণ করলো। সত্যেনদত্তের অনুবাদ, মোহিত লালের ঐতিহ্য ব্যাপকতার আশ্রয়বোধ, যতীন্দ্রনাথের মানসিক জটিলতার এ ছাড়া অন্য অর্থ নেই।

বাঙালী হিন্দুরা এই সময় থেকেই সাহিত্যে আন্তর্জাতিক ও রাজনীতিতে সর্ব ভারতীয় এই দুই খণ্ডিত দেহে বিভক্ত হতে থাকে। মুসলিম জাগৃতির পূর্ণ সুযোগ ছিল এটাই। আমরা রাজনীত ও সাহিত্যবোধকে সর্বমানবীয় চিন্তুতার ওপর পূর্ণ নির্ভরতায় রক্ষা করলাম। ফলতঃ উনবিংশ শতকের প্রসারচিত্ত মনীষীকুলের সংগে আমাদের পূর্ণসংযোগ স্থাপিত হলো যেখানে রমারোলাঁ না হলে রবীন্দ্রনাথকে ভাবা যায় না, T. S. Eliot কিংবা বোদলেয়ার না হলে রবীন্দ্র পরবর্তী কবিদের চেনা যায় না, প্রভৃতি।

পূর্ণায়ত বাঙালীর নিমজ্জিত আত্মসত্তার সুকৃতি-মৈনাকের প্রলয়ের জন্য সমগ্র বাংলা — হিন্দু মুসলিম বাংলা এবং তদানীন্তন ভারতবর্ষ —বাঙালী মুসলমানের কাছেই সেদিন হাত পেতেছিল।

নজরুল কাব্য ঐতিহ্য ও শব্দ ব্যবহার

ঐতিহ্য শুধু বিশ্বাসগত সংস্কৃতি নয় যা 'বিশেষ শিবিরাশ্রিত' মানুষেরই সম্পদ, তেমনি কোন বিশেষ জীবন-জীবিকার সচেতন কোন আদর্শ বা রাজনীতিও নয়—যা সমাজ মানসের ওপর উদ্দেশ্য-গত প্রভাব বিস্তারের হেতুতেই সীমিত। ঐতিহ্যকে গ্রহণের ক্ষেত্রে এমন কি তাকে বিস্তৃত করার ক্ষেত্রে আমাদের এমনি সীমিত বোধ অনেক বিপজ্জনক পরিস্থিতি ও আবহাওয়া সৃষ্টি করতে পারে।

ঐতিহ্য লোক-গ্রাহ্য; কিন্তু তার প্রকাশ ঘটে অলৌকিক ব্যক্তি-প্রতিভায়। কেননা কোন বিশিষ্ট প্রতিভার আপন সাধনায়ই আর পুনরুজ্জীবন সম্ভব। তাই এর প্রধান আকর্ষণ "It cannot be inherited' এবং এর প্রধান অপূর্ণতা 'Tradition without intelligence is not worth-having.'

ঐতিহ্যের গ্রহণ-বর্জন প্রশ্নে কবির 'Intelligence-এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কেন না, 'The poet's mind is, infact, a receptacle for seizing and storing up numberless feelings, phrases, images which remain these untill all the particles which can unite to form a new compound are present together. এই উক্তিতে (T. S. Eliot-এর) কবি মনের যে সক্রিয়তার কথা উল্লেখ আছে, তার ক্রিয়া আরম্ভ হয় অতীতের অজ্ঞাতভূমি থেকে। কবির কাব্যশরীরে এই ঐতিহ্যকে যখন দেহ দান করা হয়, তখন তার শিকড় কতদূর পর্যন্ত প্রসারিত, তা অনুভব করতে পারি এই বোধগম্য কারণেই। কিন্তু তার একটা সাক্ষাৎ দিক-সীমা থাকাও অহেতুক নয়।

নজরুলের যে ঐতিহ্যের পটভূমি তা বিশাল কিন্তু সাক্ষাতে তা ক্রান্তিকালের ঐতিহ্য। নজরুল একদিকে যেমন বাস্তব ও সম-সাময়িক কালকে তাঁর বিভিন্ন

কর্মক্ষেত্রে লক্ষ্য করেছেন, তেমনি তাঁর পারিবারিক পরিবেষ্টনীতে, লোটা যাত্রায় যোগদান কালে এবং মেসোপটেমিয়ার বাংলার মধ্যেযুগ (Rich Middle Age) এবং মুসলমানের গৌরবময় অতীতকে পত্যক্ষ করেছেন। তবে তাঁর সমসাময়িককালে যুদ্ধের অবক্ষয়-সমাজ, রাজনৈতিক উত্থান-পতন, হিন্দু-মুসলমানদের নবসম্পর্ক (যা তিনি ছেলে বেলায় দেখেননি) তাঁকে তাঁর সংস্কার সম্বন্ধে ভাবিয়ে তুলেছে বেশী। কেননা, অতীত স্তব্ধ ইবং বর্তমান সচল। অতীতের প্রতি আগ্রহ এবং বর্তমানের উৎকণ্ঠা এই দুই স্বতন্ত্র বোধের জন্ম নিল নজরুলে। তাঁর কবি মন আহত হোল। Eliot যাকে বলেছেন, 'The poet must develop or procure the consciousness of the past and that he should continue to develop this consciousness throughout his career.'—নজরুলে তার ছেদ ঘটলো। আর এ জন্যেই নজরুল তাঁর কাব্যের শুরুতেই হোঁচট খেয়ে, ঐতিহ্যের বিশাল চেতনা সত্ত্বেও কোন সুসংহত সুস্থির স্নিগ্ধ রূপ ও ভাবে অভিব্যক্ত হতে পারলেন না, স্মিত প্রশান্ত জীবনবোধ এলো না তাঁর কাব্যে। তাঁর কাছে উপস্থিত অস্থিরতাটাই বড় হয়ে উঠলো।

'নজরুল দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তী কাল-প্রবাহের কবি।' সেই যুগ প্রবাহের বিশেষ ধর্মটি এই ঐতিহ্যসচেতন পুরুষে স্বভাবতঃই একটা বেদনা ও হাহাকারের ঘূর্ণি সৃষ্টি করেছে। এবং নজরুল ছিলেন তেমনি পুরুষ যিনি কোন ত্যাগেরই অনুপযুক্ত নন। আত্মজ্ঞানকে সমগ্র দেশভূমিতে প্রসারিত করার প্রেরণায় যিনি দেহের প্রতিটি অণুপরমাণুতে চঞ্চল। এরই অভিব্যক্তি ঝঙ্কার প্রবল বিষাণে। এ বিষাণ তার নিজ্ঞান অবচেতন মনের আহ্বান নয়। তিনি সম্পূর্ণ সজ্ঞানেই যুগমানসকে আত্মস্থ করেছেন।

কিন্তু 'প্রথম যুগের প্রভঞ্জন' পরবর্তীকালে কোরানের বাণী আর শ্যামাসঙ্গীতে এসে হৃদয় নিবেদন করেছে। এর মূল কারণটি নজরুলের ঐতিহ্য চেতনার দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ।

লক্ষ্যযোগ্য যে, নজরুলের বিদ্রোহ এসে থেমেছে সেইখানে যেখানে নতুনতর শক্তি, নবীনতর বিশ্বাস এবং গভীরতর প্রত্যয় নিয়ে নতুন নতুন কবির, নতুন

নতুন বিপ্লবী কর্মীর আভির্ভাব হয়েছে। তখন নজরুলের আবির্ভাব কালের অশান্তি নেই এবং কবিরা (জীবনানন্দ প্রভৃতি) বিশ্বের বিরাট পটভূমিতে ও বিস্তৃত মানবিক সমস্যায় নিজেদের প্রসারিত করেছেন।

জীবনানন্দের মত তিনি আধুনিক হতে পারেন নি—তিনি দ্বারে দাঁড়িয়ে রইলেন এবং 'যেন নজরুলকে সেতু হিসাবে ব্যবহার করে কাল-কালান্তরে প্রবেশ করলো' সুতরাং সুধীনদত্ত, জীবনানন্দ দাশ প্রভৃতি কবিগণের সৃষ্ট কাব্য-আবহাওয়ার (Romantic বা antiromantic প্রভৃতি) যে climax বা চরমোৎকর্ষ, শব্দ চয়নের ও তাকে সূক্ষ্মভাবে বয়নের যে পরিশ্রম ও সমীক্ষা—নজরুলে তা অনুপস্থিত। কেননা নজরুল ক্রান্তিলগ্নের পাকে জড়িয়ে রইলেন, আর এরা মুক্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন বিশ্বের আঙ্গিনায়।

নজরুলের শব্দ-চয়নের ক্ষেত্রে তাই অস্থিরতা ও অস্পষ্টতার ধর্ম সুরক্ষিত। নজরুল মানসের obsession হেতুই তার জন্ম। কালান্তরে এসে যার যাত্রা রইলো স্থগিত।

লক্ষণীয় এই ক্রান্তি-লগ্নের কবি মোহিত লাল এবং যতীন্দ্র নাথও। এদের ভঙ্গীতে যে পার্থক্য তা অনুশীলনের পার্থক্য, কিন্তু বক্তব্যে এঁরা সমগোত্রীয়। এবং সাধারণভাবে দেখতে চেষ্টা করলে চোখে পড়বে, এ তিনজন কবিই প্রথম পর্যায়ে বিদ্রোহী। গতানুগতিকতার প্রতি তাদের বিদ্রোহ মানুষের সহজ বিশ্বাসের প্রতি বিদ্রোহ, এমন কি ঈশ্বর-বিশ্বাসেও তাদের ঘোরতর আপত্তি। পার্থক্য শুধু এই যে মোহিতলাল স্বভাবগম্ভীর স্বরে তাঁর আত্মোপলব্ধিকে প্রকাশ করেছেন, যতীন্দ্রনাথ তাঁর বক্তব্যকে হাজির করেন সেখানে পরম শ্লেষে। নজরুলে গাম্ভীর্যও নেই, শ্লেষও নেই—আছে উচ্চ হাসি, সরব ঘোষণা। অর্থাৎ এই বিদ্রোহ এবং অবিশ্বাস তিনজনকে বিভিন্ন পথে বিভিন্নরূপে চালিত করলেও উৎসটা একই।

তবু নজরুলই (সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়েই) বাংলা কাব্য সাহিত্যে অনন্য। এর একদিকে যেমন শরীররূপ (কাব্যের), অন্যদিকে তেমনি ঐতিহ্যের সমন্বয়ের দিকটি উজ্জ্বল। মোহিতলালেও ইরানী ঐতিহ্যের বা মুসলমান (অন্ততঃ

মোগল) ঐতিহ্যের প্রতি আকর্ষণ আছে। কিন্তু তা ব্যক্তি-প্রেরণাজাত মাত্র। নজরুলে তাই কাজ করেছে সামাজিক প্রেরণা হিসাবে। লোটা যাত্রায় যেমন তিনি হিন্দু ঐতিহ্যকে এক করে নিয়েছিলেন, আধুনিক কবিতায় মোহিতলালের সে সুযোগ ছিল না। নজরুলের অতিরিক্ত সুবিধা ছিল- তিনি স্বভাব কবি ছিলেন,—সব কিছুকেই তিনি সহজে ও ত্বরিত মজ্জাগত করে নিয়ে রূপ দিতে পারতেন অবলীলায়। এ গুণের অভাবে মোহিতলাল থেকে সত্যেনদত্ত কেউ জনগণের কাছে নেমে যেতে পারেন নি—তুলে আনতে পারেন নি তাদের ঐতিহ্যকে।

নজরুলের বৈশিষ্ট্য এই ঐতিহ্যকে বিভিন্ন পণ্যে সাজানোর মধ্যে। আত্মবোধের প্রচণ্ডতায় ও ব্যপকতায় কবি উচ্চকিত। তাই এর প্রকাশে একদিকে যেমন এই বেগের আবেগ সংরক্ষিত, অন্যদিকে তেমনি প্রাণসম্পদ ও নাটকীয় বৈচিত্র্যও সুলক্ষিত। উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে—এক 'বিদ্রোহী' কবিতায় এই দুই গুনেরই সমাবেশ ঘটেছে। শব্দ চয়নের ঐতিহাসিকতা এ কবিতায় যেমন, অন্যত্র তেমন নয় -উপরোক্ত দুই কারণে।

অন্যান্য কবিতায় শব্দ চয়নের একটি অনিয়মিত বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে, তা হচ্ছে, কবির সাধারণ বাংলা শব্দেই বৈদেশিক ধ্বনি গ্রহণ এবং ঐতিহ্যের ধ্বনিগত প্রসার (Vibration)।

কিন্তু সর্বত্র কবির এই মতবাদটির প্রধান যে, শব্দের সংগে সমাজের একটা (association) বোধ আছে এবং ঐতিহ্যকে দ্বিধা বা খণ্ডিত করার হাত থেকে রক্ষা করতে পারে একমাত্র শব্দই, যার পেছনে রয়েছে কবির একটা বিশিষ্ট জগৎ। জাতি ও দেশের ঐতিহ্য যে জগতকে সৃষ্টি করে, শব্দ তাকেই শোষণ করে আপন প্রতীক দেহে।

নজরুলের কি বিশেষ ঐতিহ্য ছিল এবং তার অনুশীলনে তিনি কতখানি তৎপর ছিলেন তার একমাত্র প্রমাণপঞ্জী নজরুলের এই শব্দ। এবং Eliot-এর ভাষায় "In using them (এখানে শব্দ) he is ultimately bringing in all human Values and according to his own schemes of Valuation."

অথ নজরুল বিবাদ সমাচার

কার্যব্যাপদেশে বাস করি কর্ণফুলির তীরে, কিন্তু কর্ণফুল পরে কেউ বাস করে না আমার ঘরে। তাই স্বাধীনতার মর্মোদ্ধারে অদ্বিতীয় এই অধমাধম সকালে উঠে হাত পুড়িয়ে যে খাদ্য প্রস্তত করেন, তাই দিয়ে দিনের শেষ আয়ু টুকুও চেটে দেখতে তার আপত্তি কি? দিন যায়, না জীবন যায়। শেষ রাতের কুয়াশায় মাকড়ের ব্যস্ততা শেষ রাতে ট্রেন ধরার মতই কিনা এমনি ধারা কথা ভেবে ভেবেই দিন যায়। টিকটিকি এসে ঘরে বাসা বাঁধে, মশামাছিগুলোও গরমে যেন শ্বশুরের কাছে পণ চাওয়া জামাই। সাগর রাজার ছেলেরা নমরূদের শত্রু হয়ে জন্মেছে। পুরাণ আর বাইবেল এক করে দিতে হয় (ঈশ্বর আমায় ক্ষমা করুন)।

মোটা এক বই বেচে মুনাফা করলেন কে একজন। একজন এসে বললে, বুঝলে হে, ঝুনঝুনি কিনে এ্যাটাচিতে রেখে দাও, লোকে জিনিয়াস বলবে। বলে সে লম্বা একটা সাদা বিড়ি এক নিশ্বাসে টেনে শেষ করলো।

—চিনতে নজরুলকে? নজরুল গো নজরুল, তোমরা যাকে কবি নজরুল বল। আমি তাকে শুধু নামে চিনতে চাই। চিনতে?

আমি ছাপোষা মানুষ নই, তাই চোখ দুটো অবিশ্বাস্য রকমে ছোট হয়ে এলো, এটা আমিই টের পেলাম।

সে বলে চললো, এই কর্ণফুলির মোহনায় সে একদিন গিয়েছিল রবিচ্ছবি দেখতে। এই তো চোখ এই তো চুল।—and what a heart! তিনি শেষ রবির ভাঁটা আলো দেখলেন চুল দিয়ে। চিনেছ, সেই মানুষ। মানুষ কি পারে চুল দিয়ে কিছু শুষে নিতে? ঐতো রেখেছ একটা ভাঙ্গা নজরুলের ছবি—

তার চুল নেই। আরে নজরুল যে চুল দিয়ে বাঁচতেন, সে খবর কি জান?

মনে পড়লো একটা লোককে। বগলে ফাইল। ন্যাশনাল ফেয়ারে একটা স্টলে যেখানে মহাশূন্যযানের তথ্যাদি পরিবেশন করা হোত, সেইখানে এসে এক শিক্ষাসহায়কের কাছে বসে বসে বলছিল, আপনি কি জানেন, আমি বান্দরও ধরি, বানর চালানও দেই। আমেরিকার খবর আমি জানবো না, কি ভাবেন আপনি?

রকেট চাঁদে যায় কেন, আর গেলে চাঁদই বা তা সয় কেন এই রকমই কি একটা তর্ক জুড়ে হাট বসিয়েছিল সে লোকটি। লক্ষ্য করছিলাম, জোরে কথা বলার সময় সে হাসে, আস্তে বললে লোকে হাসে। সুতো ধরে লোকমান হাকিম নাড়ি দেখতো, সে আমাদেরই বাদশাহ—মুসলমানরাই চাঁদে যাবে আর কেউ না। তারপর আস্তে বললে, কেন জানেন, নবীজী ওখানে অপেক্ষা করছেন। ঐ যে চাঁদে একটা ছায়ামত দেখেন না, ওটা কি? ওটা একটি বটগাছ। ঐ গাছই নবীজীর অর্ডার পেয়ে তার ঝুড়িগুলি পৃথিবীর কেবল মুসলমান দেশগুলির ওপর ফেলবে, তারপর—সব তৈরী হয়ে যান ভাই সব, আর বোধ হয় দেরী নেই।

সেদিনের লাকী কুপনে কিছু পাই নি, একথা সংগে সংগে আমি অস্বীকার করেছিলাম এর পর।

এখন আমার ইচ্ছা করছিল, এই গল্পটা এই নজরুল ভক্তকে শুনিয়ে তারপর জিজ্ঞেস করি যে, না, আসলে আমার নিজের কাছে প্রশ্ন হচ্ছিল—

মাকড়শা কি সত্যি কুয়াশা নামলে বনজঙ্গল জরিপ করে ফেরে? হয়ত। নইলে আমার গ্রামের হাটুরে পথটার ঠিক মাঝখানে সখিনা মার বাড়ীর ঝাড়ে এত মাকড়ের আঁশ কেন পাই? এ খবরটা কি বাংলা সাহিত্যে জানা আছে? ছিল বিভূতি, হ্যা, তাকে এ খবরটা দেওয়ার মত। সুকুমার বাবুর ছেলেকে জানালেও এখন চলতে পারে। কথাটা বল্লাম কিনা জানি না, লোকটা তেড়ে উঠলো,

—এদেশটার নাম চিটাগাং না চট্টগ্রাম সে খবর জানে ব্রিটিশ মিউজিয়াম। তুমি আমি কে হে? বাংলা সাহিত্যই বা কোন? তার গায়ে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের

ছাপ আছে? শোন হে গল্প শোন,—এক বাড়ীতে আগুন লাগতে দেখে স্বামী বিবেকানন্দ শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণের কাছে গিয়ে দুঃখ করছিলেন। পরমহংসদেব উঠে একটা কাগজ দেখে এসে বললেন, তোমার কথাটা কি বিশ্বাসযোগ্য?

তিনি বললেন, আমি যে এই মাত্রই দেখে এলাম।

পরমহংসদেব হেসে বললেন, এমন একটা up to date খবর, কিন্তু আজকের খবরের কাগজে যে নেই। তোমার কথা বিশ্বাস করবো কিনা কালকে ভাবা যেতে পারে। আজ নয়।

গল্প শেষ করে সে ফট করে আমার টাই টেনে ধরলো, বললো, বুঝলে, বলি বুঝলে কিছু?

লোকটার ঔদ্ধত্ব দেখে চোখ বুঁজে মনে মনে বললাম, ঈশ্বর উহাদের ক্ষমা করুন! উহাদেরই বললাম, কারণ তার কাঁধে আরেকজন আছেন।

কিন্তু ঈশ্বরের ক্ষমা তাকে শান্ত করতে পারলো না বলে মনে হলো। সে আর একবার বললো, নজরুল বুঝলে খোকা, তাকে লোকে বলে কবি-দা, কী বদমায়েস এই লোকগুলি। অর্ফিয়াসকে লোকে কি ডাকতো হে?

আমি বললুম, তাই তো, ওতো দাদা নয়, ঠাকুদা হবেন তবে।

ঈশ্বর! সে বললে, অর্ফিয়াস মৃত্যুর পরপারে গিয়েছিল, আর নবীজী গিয়েছিলেন মেরাজে। একই কথা। নজরুল বেটা তোর ঠাকুদা, তাই ওকথা বললি।

আমি প্রতিবাদ করলে আমার টাইটা সত্যি সত্যি আর পরবার উপযুক্ত থাক্‌বে কিনা দ্রুত ভাবতে লাগলাম। সেই সুযোগে সে মার্কটোয়েনের Jumping Frog-টার মত উপুড় হয়ে মাটিতে একটা দাগ কেটে বললে, এই ছাখ।

আমার দৃষ্টি ভূপতিত হলো বুঝি, মেজাজটা ঠাণ্ডা হয়ে আসবে তখন। তাই সে স্বচ্ছন্দে আমার নাকের ওপর কথার ঝুড়ি একটা উপুর করে ঢালতে লাগলো সে, আমি বিন্দুমাত্র অপমান বোধ করলাম না।—

সে বলে চললো। এই মাটি সাগর থেকে ওঠা, ওই পাহাড় সমুদ্র গর্ভে ছিল।

সমুদ্র এখনও ঘুরঘুর করছে একটা বদমাশ ছোকরার মত। পাহাড়ে সে কি আর উঠতে পারে? তাই চোরাপথে এক পাহাড়ীকন্যাকে কর্ণফুলের লোভ দেখাচ্ছে বরাবর ধরে। এই হচ্ছে যৌবনের কাজ। এই দেশটাকে ঘিরে তাই এত কিংবদন্তী—লক্ষ্য করেছ! কত বাদশাহ, কত কবি এইখানে এসে যৌবনের পাপক্ষয় করেছে। এই দেশে থাকতে তাই আমার এত ভাল লাগে! জানো আমার বাড়ী কোথায়?

কথায় কথায় নজরুলকে টানছে দেখে এবার আমি তর্কেই নেমে পড়লাম। বললাম, তুমি তো বড় নজরুল পাগলা হে।

সে আস্তে করে বললে, পাগলের জন্য পাগল ক্ষেপে না হে, পাগল আর পাগল হয় না—এক পক্ষে ভাল মানুষ থাকতে হয়। নজরুল তো পাগল—a genius! গলা শিয়া বালুতে ডুবে রাত এগারটা অবধি সূর্য ডোবা দেখে সে লোক, জান? কথাটা শেষ না করেই সে ঘুরিয়ে নিয়ে আবার বলে, But mind it he was not a poet. ওকে অতছোট ভেবো না। হাঁটু দুলিয়ে দুলিয়ে লোকটা থামতে শুরু করলো। কবি নজরুল কবি ছিলেন না। লোকটা শ্রদ্ধার সংগে 'ন' করছে, প্রগল্‌ভ উক্তিরও রকম আছে দেখে আশ্চর্য হলাম।

লোকটা গল্প করছে? 'নজরুল কবি ছিলেন না'—বেশ, চমৎকার একটি গল্প হয় তো! ম-মামাদের কাছে বসে ডালিমকুমারের গল্পশোনার চেয়ে ঢের ঢের উপাদেয়। লোকটা গল্প করলো:

বউ ছিল বরমা; শংখ নদীটা পেরিয়ে গেলেই বাঁকের মোড়ে পড়বে বরমা। বউ দিল দুধের মত সন্তান—নাম হলো পিজু। পিজু দেখতে মার মত। মা মারা গেল ছ' মাসের দিকে, পিজুর নাম বদলে সে দিল—তুমি।

ঘর নেই, তুমি আছে, আর আছে সে—পাহাড়ে তার ব্যবসা, ঘরে একলা তুমি। তুমি বড় হয়, তুমি আপনি তার দেহের গড়নকে শিখার অগুণে জ্বালিয়ে দিয়ে ধিকি ধিকি জ্বলতে থাকে একদিন। তারপর, তুমি সাগরের মত টানে পাহাড়ী চেংরাদের। একদিন মসন্দকে পসন্দ করে বানের মত ঘর থেকে বেরিয়ে যায় সে।

কোথায় বা যাবে। এত টুকুন মেয়ে, মেয়েই বা বলবো কেন, অবোধ অবলা। বলা নেই কহা নেই কোন গহন বনে গিয়ে তার নিজের গহন মনের দুর্বোধ্য প্রশ্নের চেড়িদের মুখোমুখী হয় তাই। কোথায় বাবা, কোথায় তুমি—শংখ নদীর কলতান কতদূর! তুমি আত্মহত্যা করো। তুমি ঘুমায় বিজন বনে, দাবানলে মন পুড়ে মসন্দ একতারা হাতে নেয়। দেখা হয় পিজুর বাবার সাথে। তারপর দুজনেই আবার হারিয়ে যায়।

গল্প শেষ হয় নি। লোকটা বলছে তখনও। বলছে, তুমি মরলো কেন জানো? নদীর জন্য। পাহাড় থেকে নেমে আসা নদী জন্মদাতার সংবাদ বয়ে আনতো, আর বয়ে নিয়ে যেত জন্মদায়িনীকে দেখতে পাওয়ার আকুতি সংবাদ। এইতেই নিত্যকার জীবনের ছক বাঁধা ছিল। মেয়েরা স্বামীকে ভালোবাসে না, প্রিয়কেও না, স্বামী বা প্রিয়দের উপার্জন ক্ষমতা ও অর্থ সাহায্য মেয়েদের নিজেদেরকে ভুলে থাকার একটা করুন ইতিহাস। ভুলটা মাঝে মাঝে ভাঙ্গে, অথবা হঠাৎ ভাঙ্গে—তখন তার সন্তান থাকা অপরিহার্য হয়। নজরুল বলতেন, মেয়েদের আমরা আনি কিছু পাওয়ার আশায় নয়, ওটা আমাদের ভুল, আমরা যা চাই তা তৃষ্ণার গভীরতা। মেয়েরা আসবে না এমনটি হলে আমরা আমাদের জীবনের তলদেশ পেয়ে যেতাম: জীবনবিমুখ হতে পারতাম। পড়েছ অনামিকা, পূজারিণী? নারী স্বাধীনতা নারীদের জন্য দরকারী না পুরুষদের জন্যে একথাটা বোধ হয় নজরুলের আগে কেউ ভাবে নি। আর নজরুল তা বুঝেছে কবে জানো? কর্ণফুলী আদৌ কোন সভ্যতার জন্ম দিয়েছে কিনা এ প্রশ্ন যেদিন তাঁর মনে জেগেছিল। লক্ষ্য করেছ একটা জিনিস, বাংলার কবিরা নদীকে দিয়েই কবি, কিন্তু কপোতাক্ষ আর কোপাই নদী ছাড়া আর কোন নদী কর্ণফুলীর আগে বা পরে একটা চরিত্র কিংবা একটা জিজ্ঞাসা নিয়ে আসে নি। নজরুল যেন সমস্ত মন ঢেলে কর্ণফুলীতে তার অর্ঘ নিবেদন করেছেন, এমনটি মনে হয় না কি? একি কেবল কবিতা? একি রক্ত দান নয়? একি ঋণ পরিশোধ নয়? পড়েছ কর্ণফুলী? দেখেছ তার ছন্দ, তার গতি-তার ভাব নিয়ে খেলা করার আশ্চর্য পিপাসাটা? কর্ণফুলীতে ডুবে মরতেও কি তার বাঁধে কোথাও? বাউণ্ডুলে আত্মকাহিনী আর কর্ণফুলী একটা চড়াই-উৎরাই সম্পর্ক মাত্র নয়? আসলে কি ওরা একই ভূতল সৃষ্টি করছে না?

তবেই দেখ চারণ কবির মনটাকে নিয়ে সে কি নির্বিরোধ প্রশান্তির কামনা চেয়ে

বেড়িয়েছে ভূতলে ! জীবনে সে তা পায়নি। তাই কোথাও সে মাইকেল, কোথাও সে অতুলগুপ্ত আর কোথাও হাফেজের বুলবুল। সংস্কৃতির সে এক আশ্চর্য ত্রিভুজ। ফসিল হলে তার মাহাত্ম্য খুঁজে নিতাম, কিন্তু সে যে পিরামিডের মমী। তার রিক্ততা তার পূর্ণতারই নামান্তর। তাই তার হাহাকার তাকে দিয়েছে Ozymandias-এর কালক্লান্তি। অমরতার দাবী তার কোথায় এই ধূসর মরুজীবনে? তাই দেখ তার Classical মূর্তি ভেংগে পড়ে আছে। কেশরের ছবি যে এনে টাংগিয়েছো, দেখ সেখানে কেশ নেই।

লোকটা প্রার্থনার মত বলে উঠলো, স্যামসন তুমি জেগে ওঠ !

আমি অযথা তর্কে গম্ভীরতা সইতে পারি কম। তাই উঠি উঠি করতে গিয়ে ধরা পড়লাম। কে বা সে কে বা আমি ? পরিচয় জিজ্ঞেস করলে হয়ত হেনরী মিলার চালিয়ে দেবে —I have no address. Besides we've got nothing more to say to each other. I don't think we'll ever meet again. What's the good of pretending that we will write one another? Tomorow I'll be some where else and so will you. All I can say is I wish you luck. উক্তিটি এক অধ্যাপক আমায় পড়িয়েছিলেন।

তাই চুপ করে থাকা যুক্তি সঙ্গত মনে হলো। বিশেষতঃ ঐ Wish you luck কথাটা এ হেন ব্যক্তি থেকে আদৌ মঙ্গলসূচক হয়ে বের হবে না বলে মনে হয়ে ঘিন ঘিন লাগছিলো।

সে বলে চল্‌লো,

—কবি ? নজরুলের সাধ ছিল বটে, কিন্তু বাঁশীয়াল নাগর যে নাগরাজের ধ্বনি তোলে, বিষাণে ঈশান কাঁপায়—সে যদি নদীর মত বহমানা হয় তবে বিসর্জনের দেবতা হবে কে ? রবীন্দ্রনাথ রয়ে গেছেন অনাদি অনন্তকালের জন্য, বিসর্জনের বিগ্রহ ক্ষণকালের উৎসব করে গেছেনঃ আনন্দে নৃত্যে গানে তার জীবনায়ু সার্থক। মানুষ তাকে সান্নিধ্যে পেয়েছে, পূজা দিয়েছে, ভাল বেসেছে, তারপর কেঁদেছে। কি বিস্ময় ছিলো ওঁতে ; তেমনি ছিল তাঁর আকর্ষণ ! —ব্যাঙাচী, ব্যাঙাচী, বুঝলে হে—দুখু মিঞা ; সে তো ছলনা করে 'বিদ্রোহী' লিখেছে হে। রবীন্দ্রনাথও লিখেছিলেন শেষের কবিতা। এ সব রচনা একটা কৈফিয়ৎ মাত্র।

আর কৈফিয়ৎ তো শুধু ছাড়পত্র, ও তো আর যাত্রা নয়, কলঙ্ক ভঞ্জনের মন্ত্রজল। মহৎ সাহিত্যিকদেরও মন্ত্রসিদ্ধ হয়ে নিতে হয়। অগ্নিবীণা', বিষের বাঁশী, দোলন চাঁপা, সিন্ধু হিল্লোল – এ নামকরণগুলি লক্ষ্য করছো না?

বল্লাম, বেশ, নজরুল একটা গায়ক মাত্র এই তো ইনিয়ে বিনিয়ে বলছেন? তা— বাধা দিয়ে সে এগিয়ে এলো··· আমি কি বলবো হে ছোকরা? নজরুল কি নিজে নিজের কথা কম করে বলেছেন? কটা দিন চিন্তা করেছ ওর কথা ১১ই জৈষ্ঠ ছাড়া? আমার কথা না শুনে বলতে পার না নজরুল জীবনীর মস্ত অবহেলার দিকগুলির কথা। কবি –কবি – ক বি – এই শব্দটাই খেয়েছে নজরুলকে। বেদৌরার কাহিনী যে লেখে সে কে, কবি? তিন হাজার গান লিখে পৃথিবীর রেকর্ড ভাঙ্গে যে সে কে, কবি? বাউণ্ডুলের আত্মকাহিনীতে যত চোখের জল জমা হয়ে আছে, কুহী পেকালের জীবনের যত খেদোক্তি আছে সে কি কেবল কবির কাব্য বিলাস? উচ্ছ্বাসে যে সংযত নয়, শৈল্পিক বিন্যাসে যে নিজেকে বাঁধলো না কোন দিন সে কি একটা কবি?

তাকে কি এখনও চেনার বাকী রয়ে গেল!

লোকটা আবার প্রার্থনা করলো। বোধ করি ঈশ্বরকেই এবার ডাকলো, বললো, ঈশ্বর এদের ক্ষমা করুন।

এই প্রার্থনার কালে আমি ভাবছিলাম নজরুল মেরাজে আছেন কিনা। কারণ নবী না হয়েও মেরাজে গেছেন অফিয়াস। এ কথাটা এই মাত্রই সে বলছিলো, কথাটা ভুলি নি আমি। তবে বুঝতে ভুল হতে পারে। ওতেই এখন শান্তি।

এরপর আর দেখা হয়নি তার সাথে. 'and I don't think we'll ever meet again.'

সংস্কৃতি

চতুর্বেদ

১ঃ সংস্কৃতি

লেডি কিউ-এর নাতনীর বিয়ের জন্য একজন প্রখ্যাত শিল্পী বিয়ের প্রস্তাব দিলে তিনি আর থাকতে পারলেন না, বললেন 'An artist proposes for Ethel! One of her footmen might propose next'-এ সব কথা থ্যাকারে সাহেবের বানানো ভূত কথা, শিল্পীরা কি সত্যি পদমর্যাদাহীন?

অবশ্য ছেলেকে Arts-এ ভর্তি না করিয়ে যখন Science-এ ভর্তি করাতে পারাটা একটা বিষম গর্বের কথা বলে আমরাই ভাবি, তখন আমাদেরই কোন না প্রতিনিধি নির্ভাবনায় এসব কথা উচ্চারণ করবেন! —Science requires a rich economic soil. But imaginative writing is a flower that flourishes merrily among rocks and ice, in frost and storms.

Vossler সাহেবের এই অর্বাচীন উক্তি নিয়ে অনেক কথা হয়ে গেছে, লোকে থ্যাকারে-সাহিত্যকেও বলেছে মনোমৈথুনের সকরুণ উদাহরণ! কিন্তু তবু 'কলাবিদ্যা' বাদুড়ে বাহাদুরীরই উপযোগিতা সঞ্চয় করে আসছে। লেডি কিউ তাই আসলে সমাজেরই 'Rat-Ally' এবং আমাদের মন এক একটি ধবল ইঁদুর।

সেক্সপীয়রের মতো লোকও নাকি গ্রন্থউৎসর্গের কালে বলেন, যা করলুম সে আর কত, আরো যা করবো—তাওতো তোমারই অনুগ্রহ! এ রকম উক্তির জন্য শূসকিং কতো আক্ষেপ করেছেন। small Aristocratic class-এর অনুগ্রহ ব্যতিরেকে 'কলার'-র মূল্য নেই! —With the rise of modern capitalism, the wealthy merchant and banking families play their

part in cultural life. (কাল'ম্যানহাইম)। পেত্রার্কতো বিশ বছরই ছিলেন Colonna পরিবারের সাহায্যের ওপর, আর মিলানে তাঁর দিনগুলি যে কি ভাবে কেটেছে তাও কি পৃথিবীবাসী ভুলেছে ?

আমাদের মাইকেল-দীনবন্ধু, শাহাদৎ, সাহিত্যবিশারদ ?

আমাদের সংস্কৃতির দেনা শুধেছেন এরা। শুসকিং এর হয়ে তাই আমরাও প্রশ্ন করতে পারি ঃ

> শিল্পী হয়ে জন্মানো কি একটা সামাজিক দায়িত্ব নয় ?
> ব্যক্তিমনের উৎকর্ষের প্রশ্ন কি অহেতুক ?
> সামাজিক মানুষেরা কি আজ বিজ্ঞানীদের হেরেমে সনাতনী লেডি কিউ ?

২ ঃ সংগীত

সংগীতে আসক্তি কার নেই ? সংগীত একটি সমবায় শিল্প—সুরকার গীতিকার বাদ্যকার গায়ক প্রযোজক এবং সর্বশেষে সর্বোপরি শ্রোতাদের নিয়ে এ শিল্প। অথচ সর্বমোট এটি একটি মাত্র হৃদয়ের অনুক্রিয়া। এবং তা হৃদয়ে হৃদয়ে উদ্বেলধর্মে বিতত হয়।

কিন্তু সংগীতের ভাগীদার নিয়ে প্রশ্ন। কণ্ঠ, যন্ত্র এবং কথায় আজ বিবাদ। কথার মূল্য ·২৫ এবং কণ্ঠ ২৫·০০ ; যন্ত্র 'মাস-ঠিকা'।

কথাকার বা গীতিকারের মূল্য ন্যূন, কেননা সঙ্গীতে তিনি অজ্ঞ এটাই ধরে নেওয়া হয়েছে। চর্যাকারদের থেকে রামপ্রসাদ কোন কবিই সঙ্গীত না জেনে কাব্য রচনা করেন নি। সম্প্রতি প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে মাইকেল দীনবন্ধু বংকিম হেম-নবীন সঙ্গীত প্রিয় ছিলেন বা সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন—এ প্রশ্ন করা হয়েছে ; লেখক খুঁজে পেতে দেখেছেন, এমন যে বিহারীলাল, যার সঙ্গীতশতক কোনদিন গাওয়াও হয়নি, তাও সুরতাল লয় ঠিকা সম্বলিত কাব্য।

জ্যোতি ঠাকুরের পিয়ানোর উদ্ভাবিত সুরে রবীন্দ্রনাথের 'ভাষাবয়নের' গল্প আমরা জানি। বাংলাগানের সেই এক যুগ। সঙ্গীতের ব্যবহার তখন সর্বাত্মক। রঙ্গা-

লয়ে গানের নাটকীয় প্রয়োগ গানকে তখন অনুকৃতির পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে। জ্যোতিরিন্দ্র তাকে সর্বাঙ্গীন urban করে তুল্লেন। দ্বিজেন্দ্রলাল সংগীতকে প্রয়োগ করলেন ব্যবহারজীবিদের জাতীয় উদ্দীপনায়, আধ্যাত্মিকতায়, প্রেম-বৈচিত্র্য লাভের আরাম প্রিয়তায় এবং তাদের স্বাতন্ত্র্য জীবিকায়। রবীন্দ্রনাথ, অতুল প্রসাদ আবার তুললেন গানের আভিজাত্য প্রশ্ন। নজরুল সেই নগদ বিদায়।

Plato-র যেমন কলিঙ্‌উড্, আমাদের তেমনি নজরুল। জাতির দ্রুত অধঃ-পতনের মূল—'আমোদ সর্বস্ব' কলাকর্মকে প্লেটো তাঁর প্রবল নৈয়ায়িক বোধ ও চেতনা এবং উদ্ধত বাগ্মিতার সাহায্যে উচ্ছেদ করতে চেয়েছিলেনঃ তাঁর সম্পর্কে তাই সংধারণা ফিরিয়ে আনার জন্য কলিঙ্‌উড্‌কে দেখাতে হলো Fallacy of Precarious margin তত্ত্ব। গীতিকবিতা সম্পর্কে প্লেটোর সর্বৈব উদাসীনতারও ব্যাখ্যা করলেন কলিঙ্‌উড্; গীতিকার নজরুলও তাই আমাদের কাছে একটি প্রশ্নের অবসান। অথচ নীচেই চোরাবালু। নজরুল আজ কেবল কথাকার হলে কিছু পাঠক পেতেন, আমরাই নজরুলের সেই পাঠ নিষিদ্ধ করেছি। কারণ নগদ শুনেই হাত তালি দিয়েছি ঢের বেশী। আধুনিক সংগীতের আসরে সেই হাত তালি এখনও থামেনি।

৩ঃ সাহিত্য

সাহিত্য কেন সৃষ্টি হচ্ছেনা এ চিন্তা পাঠকের মনকে কতখানি জুড়ে আছে, তার জরীপ করাটা আমি বাহুল্য মনে করি। পাঠক ভালকে ভালই বলে এবং মন্দকে মন্দ। 'ঈশ্বরকে' আজকে 'আল্লাহ' (যে শব্দের বুৎপত্তিগত তাৎপর্য আবার নিন্দনীয়)-র বাঁটকাড়িতে ওজন করা,—হিন্দু সাহিত্য আর মুসলমানী সাহিত্য বলে সাহিত্যকে তেমাথার খুঁটি বা তার নমুনা করে তোলাতেও যেমন পাঠকের সায় আছে, তেমনি সায় ছিল এবং আছে বিষাদসিন্ধু বা মোস্তাফাচরিতে আল্লাহ-কে ঈশ্বর বলে বেমালুম চালিয়ে দেওয়াতেও। কোনটা যে পাঠককে বেশী খুশী করে পাঠক তা ভেবে কোনদিন অস্থির হয় না।

খুনী সাহিত্য, অশ্লীল সাহিত্য, দুর্বোধ্য দান্তে-মিলটন সাহিত্যও পার হয়ে গেল,

এও এক মজা পাওয়ার মত দৃষ্টান্ত। সোজা কথা বলতে গেলে—সাহিত্য একটা ভাবনার Experiment এবং ভাবনা অর্থে Golden thread of human thought.

Human thought বলতে সকল মানুষ একটা যুগে যা ভাবে, তাই। আমরা ভাবি সংচিন্তা, সংভাবনা, সংযুক্তি, সংকম ইত্যাদি বুদ্ধদেবের বাণী এবং কবিকল্পনাগুলিই। আজকের পাকিস্তানীরা সেই সুবাদে এ গুলিকে অনৈস-লামিক বলে হটিয়ে দিচ্ছি। এর থেকে সবাই যে মুক্তি না চায়, তা নয়। সুতরাং Human thought সেই সুচিন্তারই প্রকাশ্য নাম। এবং সেই সার্বিক জনমনের প্রক্ষেপ নিয়ে যে চিন্তা সুগ্রথিত আকার লাভ করে, এমন কি পরিণতি পায়, তাকেই বলি 'সাহিত্য'—Golden thread of human thought.

মানুষ এখন একটা কালি-সংকটের বলি হয়ে বাস করছে। এই সংকটের হেতু, উৎপন্ন বেশী হচ্ছে কিন্তু জিনিষের মূল্য কমছে না, এমনি একটা ব্যাপার। যুদ্ধের আগে চালের মন দর ছিল তিন টাকা, যুদ্ধের পরপরই হলো তিরিশ টাকা এবং এর সংগে প্রচুর উৎপাদক যন্ত্র, মিল এবং বুদ্ধি। রাশিয়া তার কারণ বলছে Hoarding, চীন তার কারণ বলছে old system এবং তাবৎ দুনিয়া বলছে দেশরক্ষার তাগিদে তথা মানবতার খাতিরে সরকারের ও সমাজের status, standard, আভিজাত্যকল্পনা; হৃদয়বাদীরা বলছেন, প্রকৃতির পরিশোধ। শুধু সমাজ নিয়ে নয়, সমাজের চিন্তা ও তার ধারা নিয়ে সাহিত্য ও তার ধারা গড়ে ওঠে। সামাজ ভেংগে গেছে, কিন্তু সাহিত্য এখনও ভাঙ্গেনি—আগের নিয়মে রচিত হয়ে চলছে ঃ অঙ্গ বদলিয়ে যতই ভেক চালনোর ব্যবস্থা করা হোক। ফুলের বদলে, চাঁদ চাকরের বদলে পীচঢালা রাস্তা যতই ঢালু হোক, সাহিত্য পণ করে আছে, 'পাদমেকং ন গচ্ছামি'।

সুতরাং ভাঙ্গা সমাজের থেকে বেড়িয়ে পড়া, ছিটকে পড়া মানুষের দল সাহিত্যের অখণ্ডতায় অবিশ্বাসী হয়ে পড়েছে সহজে, মানুষের মুখে তাই সহজেই বিদ্রূপ ফোটে। আজকের সাহিত্যে সেই বিদ্রূপের কথা নেই—এটাই আশ্চর্য ব্যাপার।

বিদ্রূপাত্মক সাহিত্য রচনা কঠিন কাজ। সমাজকে জানতে হয়। সাহিত্যের নতুন ভূগোল গড়ে তুলতে হয় জীবনকে বিপন্ন করেও। সাহিত্যের ষ্টিভেন-শন, এডমণ্ড পিয়ারী, তেনজিং-হিলারীদের দল বেরিয়ে আসুক। বিক্ষোভ নিয়ে গানের কলি রচনার চেয়ে, এমন কি মশারীর ভেতর শুয়ে থেকে মৌশুমী হাওয়ার কল্পনায় মেতে ওঠার চেয়ে সমাজের তেল চকচকে ঘাড়টায় হাত বুলিয়ে দেওয়াই এখন সাহিত্যিকদের কর্ম। এই ঠাট্টা মশকরা নিজেকে নিয়েই, একথাও যেন ভুলে না যাই এবং আত্মঅস্বীকার করার লোভ যেন নিষ্ঠুর ভাবে দলিত করি।

সরকারের সহযোগিতার প্রয়োজন এখানে বেশী; নচেৎ সকল পাপই ঢাকা পড়ে থাকবে ভয়ের অছিলায়।

আমরা সিনেমাপত্র ও প্রচার পত্রিকাগুলিকে আক্রমণ করি কিন্তু তাকে নিয়ে বিদ্রূপ করি না। বিদ্রূপ করতে জোর লাগে, সৎসাহসের প্রয়োজন হয়। আমাদের মনে সেই অভাবটা কালি-আঁধার রচনা করে আছে।

পৃথিবীতে প্রহসন-নাট্য-আন্দোলন পথ হারিয়ে ফেলেছে। সম্ভবতঃ পৃষ্ঠপোষক-তার অভাবে। গল্প আগে গড়ে না উঠলে মহাকাব্য, অন্ততঃ নাটক গড়ে ওঠেনা। নাটক মানেই ট্রাজেডি। আমরা খুঁজছি কমেডি—সিনেমা তার কাশীর পাণ্ডা, দরগার জোড়-পীর।

নাটকের পূর্বকালই প্রহসনের কাল। প্রহসন দুর্বল হলে নাটকের যুগে কমে-ডিই আসে বেশী। আগামীকালের নাট্যকার এ যুগের প্রহসনকারদের সূতী। নাটককে এগিয়ে দেবে এখনকার প্রহসনই; কিন্তু তারও দেরী দেখছি।

৪ঃ ভাষা

ভাষা বাতাসেরই সৃষ্টি কিন্তু হাওয়া থেকে আসেনি। তাই তার ব্যাকরণের প্রশ্ন রয়েছে, তার ইতিহাসের প্রশ্ন রয়েছে, তার তুলনার প্রশ্ন রয়েছে। যাবো; আমি যাবো; আমি কাজে যাবো; আমি কাজ নিয়ে যাবো; আমি কাজ নিয়ে ঢাকা যাবো; আমি চাটগাঁ থেকে কাজ হাতে নিয়ে ঢাকা যাবো।… এমনিভাবে দেখি, ভাষা একটা ব্যবস্থার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। আমার কোন

ব্যবস্থা না থাকলে যেমন আমার মানুষ হয়ে থাকা চলবেনা, ভাষার ব্যাপারেও তেমন। ব্যবস্থা ভেংগে গেলেও আবার ঠিক সেই অবস্থাই।

এখন, আন্দামানের লোকদের অংক বিষয়ে ধারণা নেই—তারা গোনে এক এবং বহু; এইটেকে কি অবস্থা বলবো? রাঙ্গামাটিতে লোকদের গুণতে দেখলে তাজ্জব বনতে হয়, তবু কি তাদের ভাষা নেই বলতে হবে? তবে ব্যবস্থা বলতে কি বুঝবো? আর ব্যবস্থাকে আবার নতুন ব্যবস্থা দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার পরিকল্পনা যিনি বা যারা নেবেন তাদের কোথায় ভুল হতে পারে? [এ প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ নিজস্ব মত দেবার সাহস ও ইচ্ছা যদিও আমার কদাচ নেই।]

ভাষা দিয়ে সাহিত্য হয় না, 'সাহিত্য'-পাওয়ার মূলমন্ত্রগুলি জানা যায়—কথা বলতে পারা যায়; আর কথার পৃষ্ঠে কথা দিয়েই রচনা হয় কথার সরিৎসাগর, তারই নাম সাহিত্য। সাহিত্য বাঙালীও হয়না, মুসলমানও হয় না। ব্যবস্থা থাকলে ভাড়া বেঁধে ইমারত আপনিই গড়ে ওঠে; সুতরাং ব্যবস্থার প্রসঙ্গটাই মূল। এই ব্যবস্থার জানান দেয় লোকসাধারণ, কোন পণ্ডিতম্মন্য নয়। ভাষাতাত্ত্বিক Allen সাহেব তাই যার তার কান মোচড় দিতে খুব কমই লজ্জা পান।

সম্প্রতি বর্তমান ভাষা ব্যবস্থার মধ্যে নিঃশ্বাস আটকে আসছে বিধায় কেউ কেউ উন্নাসিক হয়ে উঠেছেন। আমার প্রশ্ন, তাঁদের নাক কেটে দিলেও কি বাঁচার কিছু সুবিধা করতে পারবেন তাঁরা?

মানুষের 'অভিপ্রায়েই' ভাষা। ভাষার দখলেই মানুষের মৌন মন প্রবল হয়। নদীর গতিতে নদী কেবল সচলই নয়, মুখরাও। সমুদ্র তার গর্জনেই ভয়ের দেবতা। মানুষ তার অভিপ্রায়কে সংকুচিত বা খণ্ড খণ্ড করে এনে মানুষের দিকে মানুষের গতিকে খর্ব করতে পারে না। যদি করে, ভাষার ব্যবস্থা, মানবিক অভিপ্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। কয়েকজনের উক্তি কেবল আমি এ প্রসংগে উদ্ধৃতি দেব:

১। মোহম্মদ ওয়াজেদ আলী:

> হিন্দু ও মুসলিম বাংলা আলাদা আলাদা পথ নিতে পা বাড়িয়েছে বা বাড়াচ্ছে।—

হিন্দুরা পুরাতনী শংকরাচার্যী মনোভাব নিয়ে সংস্কৃতশব্দপ্রধান বাংলার ভেতর হিন্দু পুনঃভ্যুদয়বাদ অনুভব করতে পেয়ে খুশী হতে চাচ্ছেন। পক্ষান্তরে মুসলিম লেখকরা সাধারণভাবে বাংলা-ভাষার কিঞ্চিৎ মার্জিত রূপের অংগে কিছু কিছু আরবী পারসী বা হিন্দুস্থানী অলংকার দিয়ে তাকেই বাঙালীর ভাষা হিসেবে পেতে চাচ্ছেন।…

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই দুই রকমের ভাষাই বাবু ভাষা, জনসাধারণের ভাষার সংগে এর যোগ নেই। বাবুরা মহিষীকে প্রণাম করতে পারেন; তাঁদের জুড়িদার মিঞাসাহেবেরা সুলতানকে বন্দেগী করতে পারেন; কিন্তু হিন্দু বা মুসলিম কোন সম্প্রদায়ই তাঁদের চেনেন না। তাঁরা জানেন সাধারণ একজন মূর্তিমতীকে, যিনি সকলের অন্তরে বিরাজ করছেন। তাঁকে দিয়েই জনসাধারণের সুখ দুঃখের ভাষাবিনিয়োগ হয়ে থাকে; তাঁর হাত থেকেই তাঁরা জীবনের দীনহীন মুহূর্তগুলোর নিঙড়িত রস পান। কিন্তু বাবু-মিঞারা যখন এই মূর্তিমতীকে আর্য বা মুসলিম অলংকারে সমাচ্ছন্ন করে ফেলেন, স্বতঃই তিনি তাদের (জনসাধারণের) পর হয়ে যান।

আজ বাংলা ভাষার প্রধান সমস্যাই হলো এই। এর সমাধানে লিখিয়েরা নিরভিমান মনে অগ্রসর না হলে ভাষা শুধু সাম্প্রদায়িকই হয়ে পড়বে না, সেই ভাষার লেখা সাহিত্যও বিরাট বাঙালী সমাজের একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্রের সম্পত্তি হয়ে থাকবে। এটা কি বাঞ্ছনীয়?

২। ড. আহমদ শরীফ ঃ

কাছের মানুষকে আভাসে-ইঙ্গিতে মনের কথা—কাজের কথা হয়ত বুঝিয়ে দেয়া যায়, কিন্তু দূরের মানুষকে—ভবিষ্যতের মানুষকে—কাজের কিংবা মনের কথা কি ভাবে বলা যায়?…ধ্বনি আসলে বোবা। মানুষের অভিপ্রায়ই তাকে অর্থদান করে। ধ্বনিগুলির অর্থবহতা একান্তভাবে স্থানিক বা গোত্রিক চুক্তি-নির্ভর। যে লোক যে ভাষাতে জন্ম থেকেই চুক্তিবদ্ধ হয়, সে ভাষাই তার মাতৃভাষা। …বিজাতির

বা বিদেশীর ধর্ম মানুষ সাগ্রহে বরণ করে নিয়েছে ; কিন্তু ধর্মের ভাষা কেউ নেয় নি, এসব ধর্মভাষা মন্দির, মসজিদ ও গীর্জার প্রাচীর পার হয়ে কারুর মুখের বুলি কিংবা মনের ভাষা হয়ে ওঠেনি এতকাল পরেও।···

ভাব ও ভাষায় আধেয়-আধার সম্পর্ক। আধারের পরিবর্তনে আধেয় আকৃতি বদলায়, প্রকৃতি বদলায় না···। তাই ইসলামের মৌল শব্দগুলো—আরবের আল্লাহ, সালাৎ ও সিয়াম শব্দগুলো ইরাণে হলো খোদা, নামায আর রোযা।

অপ্রাকৃত প্রবন্ধ

সংগীত প্রসঙ্গ

সংগীত একটি সমবায় শিল্প। সুরকার গীতিকার বাদ্যকার গায়ক ও প্রযোজক এবং সর্বশেষে বা সর্বোপরি শ্রোতাদের নিয়ে এ শিল্প। অথচ সর্বমোট এটি একটি মাত্র হৃদয়ের অনুক্ত উৎপত্তি। ব্যাপকতায় সমগ্র পৃথিবীকে আকর্ষণ ও সংযোজনের ক্ষমতা তার আছে।

সংগীতের আদি ইতিহাসে অধিক প্রাধান্য পেয়েছে সুর। সুরের গূঢ়ার্থ ব্যাপক। সুর ধ্বনিও বটে, ধ্বনির অবকাশও বটে। এই অবকাশটুকু পূরণ করেছে কথা, কথার শব্দ, শব্দের অর্থময় ধ্বনি, ধ্বনির বাচ্যার্থক ইঙ্গিত। অর্থাৎ একটি হ্যাঁ-বাচক ইশারা একটি নেতিবাচক ইঙ্গিতের সঙ্গে এসে মিশেছে। এই মিশ্রিত রূপই সঙ্গীতের পরিণত রূপ।

সঙ্গীত মন থেকে বেরিয়ে আবার মনের মধ্যে প্রবেশ করেছে এবং এই ভাবে গড়ে তুলেছে ভেতর ও বাইরের সীমানা জুড়ে একটি মহা বৃত্ত। এই বৃত্তপথের আজ আর শুরুও নেই; তেমনি নেই অন্ত। গানে কথাংশ শ্রেষ্ঠ হতে পারে, কিন্তু একক হতে পারে না—এমন কথা রবীন্দ্রনাথও স্পষ্ট উচ্চারণ করেন।

সংগীতের বড় ভাগীদার তার সঙ্গত; আর উঁচু সঙ্গত তবলাও নয়, যন্ত্রও নয়—কণ্ঠ; কণ্ঠ নিঃসৃত ধ্বনি। সংগীতে কণ্ঠের মর্যাদা এই জন্যই। 'কণ্ঠদান' 'কণ্ঠসংগীত' দ্বৈতকণ্ঠ' 'কণ্ঠে অংশ গ্রহণ' কথাগুলির গোষ্ঠি-প্রীতি গত জন্ম দুর্লক্ষণীয় নয়। অর্থাৎ শব্দউচ্চারণই সংগীতের কাজ নয়, সুরকে বোধগম্য করা বা অর্থে বিশ্লেষিত বা ব্যাখ্যা করার মর্যাদায় সে সুপ্রতিষ্ঠিত। এই 'বোধগম্যতা' একটি মাত্রাগত চেতনা যদিও। আশ্রয় করতে হয়। 'কণ্ঠ' তাই 'কণ্ঠস্বর' থেকে বিশেষিত এবং Intuitionist গণ ধ্বনিমাত্রে বিশ্বাসী হলেও 'বিশেষিত ধ্বনির' কৃত্রিমতা তাদের বিশেষ কোপের কারণ।

বোহেমিয়ান, টেডি, সন্তাব যুবক, করিৎকর্মা, 'Angry Young Man' ('রুষ্ট ও তরুণ') এরা প্রত্যেকেই স্ব স্ব দলের চিন্তা ও ধারণার সক্রিয়তায় নিয়ন্ত্রিত। অতএব, এদের প্রত্যেক দলে 'কণ্ঠ' শব্দের বা বস্তুর বিষয়ের চিন্তা ভিন্ন জাতীয় কিন্তু তবু 'কণ্ঠ' একটি স্বরউৎপাদক যন্ত্র মাত্র নয়, ধ্বনিও নয়, বিশেষ চেতনা ও অর্থের ইংগিত। একটি পরিভাষাও বটে। অর্থাৎ সংগীতে 'কণ্ঠ' শব্দ Intonative. Lexical এবং Onomatapoetic Interest নিয়ে উৎপন্ন একটি শব্দ বলে আমি মনে করি।

গানে সুর সংযোজন নিষ্পন্ন হয় একটি পরিধির ছাঁচে। এই পরিধির দুটি প্রধান ভাগ ঃ মুখ ও অন্তরা। আধুনিক গানে এ দুটি'র প্রাধান্য মাত্রাতিরেক। আধুনিক গান মাত্রেই হিট্-গান, হেমন্তই হোক বা শীতকালীন কোন গায়কই হোক— দুরন্ত ঘূর্নীর বিচক্রে তাদের চলতেই হয়। অল্লাধুনিক এবং রবীন্দ্র ও পল্লীগানের সে গানগুলিই আজ বাজার প্রিয় যেগুলি অন্ততঃ হিট্-মুখো (অন্য শব্দ অবান্তর)। এই হিট্ মানে বাজার, এই হিট্ মানে কর্মাস। অর্থাৎ লোকে না মানুক কিন্তু গ্রহণ করে। এহেন একটি গান রচনার ভিত্তিস্থল 'মুখে' আর 'অন্তরায়' ঃ শিল্পী হৃদয়ের কোরকে নয়; গীতিকারকে সুরকার তাই শাসায় মুখটা ভাল করার জন্যে। সুরকার জানেন, কথা যোজনার দৈন্যতার কারণে তিনি অন্ততঃ সমালোচনার উর্ধে। তাঁর আপাততঃ নির্দেশ তার নিজের বাজার খাতির রেখে। গীতিকারের নিজস্ব মার্কেট নেই। সুরকারের মার্কেটটাই তার সম্বল—এ হেন ক্ষেত্রে তিনি বরং মর্কট বিশেষ।

আরো বিপদ, 'আভোগী' করুণ না হলে সমূহ বিপত্তির কারণ ঘটবে। উপমা থাকবে যেমন, 'বাতাস তো নয় যেন মনের হতাশ'; Personification থাকলে আরো ভালো যেমন 'ও বাতাস আঁখি মেলোনা'; নাম প্রিয়তা একটা পরীক্ষা হিসাবে চলতে পারে যেমন, 'কিরণ মালা যায়গো আমার শঙ্খ মালার দেশে', এবং 'শরম' 'আঁখি' 'কাজলা দীঘি' 'লজ্জাবতী' প্রভৃতি শব্দ থাকবে ইত্যাদি।

পুরাকালে গান ছিল দেবতার প্রাপ্য অর্ঘ। কেউ এককভাবে গাইত না। অর্ফিয়াসও কি পেরেছে এককভাবে গান গেয়ে সমুদ্রকে মুগ্ধ করতে? রাজনৈতিক কারণেই তার আবির্ভাব ও মৃত্যু ঃ অন্য কাহিনী একটি সান্ত্বনার প্রলেপ মাত্র।

অবশ্য গান ও কবিতা এক নয় ; গানের অন্তরা আভোগী সঞ্চারী প্রভৃতি পর্ব-ভাগের সুখ কবিতায় নেই। মেজাজেও এরা ভিন্ন। Plato এই দুয়ের পার্থক্য দেখেছিলেন না। Fallacy of precarius margin তত্ত্বের উদ্ভাবনের সূত্র রচনা করেছিলেন সে বিচার কলিঙ্‌উডের, তবে একথা সর্বস্বীকৃত যে, সংগীততত্ত্ব সম্পর্কে গুরুত্ব Platoও দেননি, তার শিষ্যও না। ফলে plato-র 'মাইমেসিস'-সত্য শেষ পর্যন্ত নেমিসিক ভীতির রূপভাবনায় গ্রীক নাট্যকলায় ব্যাখ্যাসূত্র মাত্র, এবং গীতিকবিতা স্পষ্টতই তাঁর কাছে, এমন কি এরিষ্টটলের কাছেও একটি অনুকৃতির ব্যর্থ ফলক, বা অনুকৃতিধর্মী নৈতিকতন্ত্রে বোনা স্বেচ্ছাকর্ম। অর্থাৎ গীতিকবিতায় মহৎ জীবনের রূপ উপস্থাপনার ভিত্তি নিতান্ত কলাকৌশলগত—একেবারে আভি-ধানিক অর্থে অনুকৃতিমূলক। সম্ভবতঃ এই ধারণায়ই তিনি দ্রুত অধঃপতনশীল জাতির বিচারে কাব্যকলাকেই (বিশেষতঃ এই শ্রেণীর) দায়ী করেছেন, কেবল দায়ী করেন নি, একে 'আমোদ সর্বস্ব' কলাকর্ম বলে অভিহিত করে প্লেটো তাঁর প্রবল নৈয়ায়িক বোধ ও চেতনা এবং উদ্ধত বাগ্মিতার সাহায্য নিয়েছেন এর উচ্ছেদকল্পে। গান সম্পর্কেও এখানে উক্তি করা হয়েছে এভাবেই। অবশ্য সেকালে কবি মাত্রেই গায়ক, অন্ততঃ সংগীত রীতি ও অনুকল্পের অধীন। বিশ শতকই তার ব্যতিক্রম মাত্র। প্লেটোর রিপাব্লিকে প্লেটো যাদুধর্মী শিল্পকলার স্থলে প্রায় সর্বত্র চিত্তামোদী শিল্পকলার চড়া আভিজাত্য সহ্য করেন নি ; তাঁর কাছে হোমরও নিষিদ্ধ পাঠ্য। বহুদিন পর ডস্টয়ভ্‌সকি পড়ে ষ্টালিনও প্রায় একই কথা উচ্চারণ করেন। কারণ তিনি যে জাতীয় রাষ্ট্র গঠন করতে যাচ্ছিলেন তার উপযোগী তা ছিল না। তিনি অংকের নিয়মে যুক্তি দিতে চেয়েছিলেন। আলেক্সাণ্ডারও হেগেলকে সাত্রে'র সংগে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন। এটাই ভ্রান্ত। কিন্তু প্লেটোর বাণী আজকে অমর, তার কারণ অন্য ; তিনিই প্রথম 'সাহিত্যের বাস্তবতা' তত্ত্ব উদ্ভাবন করেন। সাহিত্যের বাস্তবতায় বিরাট পটভূমি থাকে , সব মিলিয়ে একটা মৌল আবেদন ও মনোভাব সৃষ্টি করে তাকে সামাজিক জাগতিক ও লৌকিক করে এক করে তোলে। তার জন্য একটা 'মাধ্যমের' প্রয়োজন হয়, তাই গ্রহণ বর্জন প্রয়োজন হয় এই বাস্তবতাকে স্পষ্ট করে তোলার জন্যে। তাই সে একাধারে সৃষ্টি অন্যধারে বাস্তব, এবং জীবন। এরিষ্টটল সক্রেটিসাধিক্যে অধিক বাস্তব, অধিক পূর্ণ এবং সবল। প্লেটোই কবিতার (কাব্য) মূলতত্ত্বকে নিখুঁত ভাবে ধরতে পেরেছিলেন যদিও। প্লেটোর অধ্যাত্মবাদ টলষ্টয়, কিংবা আমাদের বংকিম, এমন

কি Shaw কিংবা মমেও কি নেই? সাহিত্য কর্মের গৌরব সম্পর্কে নিঃসংশয় হওয়া মহৎ কর্ম নয় এই ভাবনায়ই এরা বারবার সংশয়ে ফিরে গেছেন। একই অধ্যাত্মবাদ Eliot-এ ও প্রশ্রয়ী।

কিন্তু তাঁর উক্তি আশ্চর্য করে আমাদের।

এখনও সৃষ্টিতে

মানুষকে বেঁধে রাখা যায় না। জলেও না; স্থলেও না। মানুষ চলে, ঘড়ির মত চলে। একদিন হঠাৎ চলাটা একেবারে শেষ হয়। নিঃশব্দ চলা নিস্তব্ধ নিঃসাড় হয়ে পড়ে। এই তো জীবন।

মানুষ নিঃশব্দে কেন চলে? কারণ তার চলাটা বিধান মত। মৃত্যুটা এই বিধানে অন্য ব্যাপার। তাই হক সাহেব, মোহম্মদ আলী এঁরা মৃত এবং আমি জীবিত এই ভাবনার ব্যাত্যয় নেই। আমি ভাবি, সেও ভাবে। আর তুমি তো ভাবছোই। দিন রাত, রাত আর দিন।

মানুষ নিস্তব্ধ কেন হয়? কারণ শুদ্ধতার অতল সরোবরে ঢেউ ওঠে না, কেবল পদ্মকোরক জন্ম নেয়। তার নাম দর্শন। ফিলসফি। এ দর্শন জীবনে পাঁচ পা মেলে হাটে, জীবনের হাটে 'ধর্ম' পর্যন্ত যায়; আবার জন্ম দেয় সাহিত্যকেও। সাহিত্য জীবনেরই বিশ্লেষণ।

কথায় বলেঃ প্রভুরূপে, বন্ধুরূপে আর কান্তারূপে। এই প্রভু বাক্য হলো ধর্ম, বন্ধু বাক্য হলো দর্শন। সাহিত্য সেই শেষরূপ। কান্তা।

আমরা সাহিত্য পাঠ করি, দর্শন লাভ করি আর ধর্ম করি আচরণ। তিনটি মিলেই তবে একটি ঘড়ি; জীবন ঘড়ি। জীবনঘড়ি চলে—জীবন ঘড়ি মহাকালের স্পর্ধকে মাপে, মেপে মেপে চলে। চলে চলে থামে। কেউবা থেমে থেমে চলে। সাহিত্য দর্শন ও ধর্মকে এই চলার সেকেণ্ড, মিনিট ও ঘণ্টা বলতে পারি। অর্থাৎ কিনা, সাহিত্য থেকে শুরু করে ধর্ম পর্যন্ত আমরা চলি। চলার প্রতিটি ক্ষেত্রে এরা আমাদের নিয়ামক।

আণবিক যুগে আরো ভাগ এসেছে। একটি প্রস্তুত, আর একটি প্রস্তুত-পূর্ব।

১ম ভাগে ইতিহাস, ভূগোল ও অংক ; দ্বিতীয় ভাগে বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের আছে ভাগ আর ইতিহাস ভূগোলাদ্বির আছে শাখা। একটাতে পর্ব ভাগ আর একটাতে খর্ব রূপ। **Archeology, Anthoropolgy, Sociology,** এগুলিও ইতিহাস তত্ত্বের আনুমানিক শাখা ; ভূতত্ত্ব, মার্গতত্ত্ব, রেখাতত্ত্ব বা রেখামিতি, গণনাতত্ত্ব, অংক ও ভূগোলের নানা অনুসন্ধানে প্রাপ্ত বিদ্যা ; ইত্যাদি।

মহানবিক যুগ বিংশ শতকের পঞ্চাশোর্দ্ধ কাল। এ যুগের নকীব ও নবী একমাত্র বিজ্ঞান। এর একটা ব্যাখ্যাই যথেষ্ট, যেমন—আজ মানুষ প্রেমেও বৈজ্ঞানিক সূত্র আবিষ্কার করেছে। সম্প্রতি প্রকাশিত **Alexandria Quartrets** গ্রন্থটি তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। প্রেমের চতুর্মাত্রা জ্ঞান ও আপেক্ষিক ওজন নামক বিশেষ বিজ্ঞানের আইনের ছকে লেখক চারখণ্ডে এই উপন্যাস শেষ করেছেন। পৃথিবী এবার কোন পথে? মানুষ জীবনের ব্যাখ্যা খুঁজে হতাশ হয়েছে বার বার।

এসেছে কড়া নির্দেশ : খুঁজতে যেও না।
এসেছে স্মিত হাস্য : দেখে যাও, দর্শন কর, দর্শন কর।
এসেছে কান্তার পরিচর্যা : ভয় কি, এই তো আমি।

তবু, সে কোথায়?—মনে,—মনে নয়, আকাশে নয়, বাতাসে নয়, রেখায় নয়, রঙে নয়, যুদ্ধে নয়, অবকাশে নয়। পরিতুষ্টিতে? সে তো সান্ত্বনা। তবে—? বিজ্ঞান, মহামনিব প্রভু বিজ্ঞান বল—

কি?

'A foolish question always deserves foolish answer'.

তবে এতদিনের মানব সভ্যতা? বিজ্ঞানের এক কথা : মানুষ সভ্যতা নামক প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে বার বার নিজেকে প্রমিথিউসের মতো মুক্ত করে বেরিয়ে এসেছে। সভ্যতা মানুষের জন্য নয়, হতে পারে না।

কিন্তু আজকের বিজ্ঞান ঠিক কোন কথাটি বলতে চায়? কি বক্তব্য তার? সে বলে, মানুষ একটি অসম্ভব প্রাণী। অসম্ভব, কেন না সে হৃদয় ভিত্তিক প্রাণী।

তার **Dimension** সমস্যা ও আপেক্ষিক গুরুত্বকে ছাপিয়ে উঠেছে তার চর্মা-বরণের অন্তরের লৌকিকতা। সে চলে, সে ভাবে, সে কথাও বলে ঃ এবং কাল-কে সে জয় করে—কর্মপ্রেরণায় উৎসাহে উদ্দপনায় উদ্ভাবনায় এবং প্রেমে। মানুষ একটি Dimentional Animal এবং তারও বড় সে লৌকিকভাবে মিষ্টিক অর্থাৎ অহেতুকী বিজ্ঞানের রহস্যকে সে আশ্চর্য উদাসীন দৃষ্টিতে দেখে—সাহিত্য দর্শন ও ধর্মের চক্ষু হারিয়েও সে তার চিরন্তন দৃষ্টিতে থাকে প্রহরাগত। অথচ তা অসম্ভব, অবিশ্বাস্য।

অথচ তা নিয়মিত।

ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ঃ সাহিত্যে তার রূপ

জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি যে পথে বেড়ে চলে, সে পথের মাইলষ্টোন বলতে পারি সাহিত্যকে। সাহিত্য হচ্ছে বাঁধন, আর বাকী সব গতি।

এই গতি সমাজ ও সমাজ-মনের, এ গতি সজীবতার। যেখানে সজীবতা এবং গতি নেই, সেখানে সাহিত্য পুনরাবৃত্তি সৃষ্টি করে মাত্র—জাতির মুকুর হয়ে ওঠে না। সমাজে ক্লেদ এবং গ্লানি জমে, সাহিত্য তাকে পরিষ্কার করে না, তার শোধণ-মন্ত্র জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অনুশীলন এবং প্রবৃদ্ধি।

জাতীয় ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি জাতির সুস্থ জীবন যাপনের অবলম্বন, এর অন্য সংজ্ঞা অর্থাৎ academic definition সম্বন্ধে কোন শেষ সিদ্ধান্ত এখনো প্রস্তুত হয়নি। জাতির জন্মলগ্নে যে বিশেষ জীবন প্রবাহের উৎসমুখ খুলে যায় বহু ভাব প্রবাহে পুষ্ট হয়ে তার সমুদ্রগামী বিপুল রূপকে বলতে পারি তার ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি। অর্থাৎ এক এক যুগে এক এক স্থানে এর এক এক রূপ—কোথাও পরিপুষ্টি, কোথাও তার অপেক্ষা। মোটামুটি এই তার কথা।

এই ঐতিহ্যে সংমিশ্রন, বর্জন এই সব প্রশ্ন আসে, কেননা সমাজের চেহারা ও অন্তর্মত্যে বিপ্লব আসে মাঝে মাঝেই, বিশেষতঃ রাজনৈতিক প্রভাবের ফলে। গ্রহণ বর্জনেই ঐতিহ্যের তনুশ্রী ; অন্তশ্রী তার শ্রেষ্ঠ ও সুস্থ অনুশীলনে। রাজনৈতিক প্রভাবে সাময়িকভাবে সমাজে যে বিশেষ স্থানচ্যুতি ঘটে, তারই ফলে কিছুদিনের মধ্যেই আত্মস্থ সহজ মানুষের মনে একটা প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়—তাকে কেন্দ্র করেই পুরাতন ঐতিহ্য গ্রহণ, বর্জন অথবা মিশ্রণের আন্দোলন গড়ে ওঠে—অর্থাৎ সমাজ এগিয়ে যায়। বাঁক ফেরে।

পারশ্যদেশে অগ্নিপূজার প্রচলন ছিল অথবা ছিল যরোআষ্ট্রারের সনাতন ধর্ম। ইসলামের বিজয়ের ফলে সাময়িকভাবে এই সংস্কৃতির পতন ঘটলো। কিন্তু

ধর্মতঃ এই পরিবর্তনই যে সমাজের নীচের স্তর থেকে অসার ধর্মচেতনার পরিবর্তন আনলো—এই রহস্য বোঝা গেল যখন এই পারশ্যাই আবার বিদেশ জয়ে উদ্বুদ্ধ হলো।

এখানে প্রসঙ্গত বলে নেওয়া দরকার, সংস্কৃতির রূপান্তরে, সমাজদেহের পরিবর্তনের চেয়ে, সমাজ দেহের শক্তিই বলীবর্দরূপ গ্রহণ করে।

ঊনবিংশ শতকের বাঙালী সমাজের নতুন চেতনা তার অধুনা স্বাক্ষর।

সংস্কৃতির রূপান্তর হয়, এই রূপান্তরেই মৃত সমাজের জন্মান্তর ঘটে – সমাজ এগিয়ে যায়, নতুন ভাষা ও সাহিত্যের পত্তন হয়। এই হচ্ছে ইতিহাসের কথা।

কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, পূর্ববর্তী সমাজ ও পরবর্তী সমাজের মাঝখানের এই বিপ্লবই কি সমাজ বিপ্লবের মূল কথা—সাহিত্য কি তারই প্রকাশচৈতন্য বা রূপ লাভ করে? সাহিত্যে রূপ পায় ভাব ও ভাষা। ভাষার পরিবর্তন অর্থাৎ ভাষার Grammar-এর পরিবর্তন – অন্ততঃ পরিবর্ধনের জন্য দায়ী ভাষার অন্তর প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক মানুষ। ভাবের পরিবর্তন আসে পূর্ব সমাজ ও সংস্কারের সংগে পরবর্তি সংস্কারের সংঘাত—অন্ততঃ সাদৃশ্যের অভাবজনিত বেদনার জন্যে।

এখন, ভাবের এই পরিবর্তনের ফলে এই ভাবের প্রকাশোদক ভাষা চাই।—পূর্ব-যুগের ভাষার সেই ক্ষমতা থাকে না তা নয়, তার কেজো দিকটা সুপ্ত থাকে মাত্র—সেইটেকে জাগিয়ে দিয়ে যায় নব সংস্কৃতির চেতনা ও ঐতিহ্যের রূপ চেতনার মানুষের মুক্ত মন।

ঊনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ঠিক এই কথারই স্বাক্ষ্য দিয়ে যাবে। মধ্যযুগের কবির উক্তি হবে, 'যদি মুই লম্ফ দিয়া তোরে লাগ পাম, কাটারে কাটিয়া তোরে জলেতে ভাসাম।' এযুগের কবির জগতে এই বেদনা সাপেক্ষ প্রকাশ রুচির আনাগোনা 'কুত্রাপি ন দৃষ্ট'। কারণ প্রকাশের ভিন্নতাই ভাষার * ভিন্নতা প্রমাণ করে। রচনার মাঝে মাঝে 'এক্ষণে পাঠকবর্গ' প্রভৃতি ঢং কোনও মর্মেই আমার ভাষা বা প্রকাশধর্ম নয়। আমার যা কিছু প্রকাশ তা আমার নব

* "কবিতার বক্তব্যের পরিবর্তন নতুন শিল্প-ধারণা ছাড়া আসে না।" জ্যোতির্ময় দত্ত, আধুনিক কাল ও বাংলা কবিতা (প্রবন্ধ), (দ্রঃ কবিত', আষাঢ় ১৩৬৩, পৃঃ ৩৪৫)।

চৈতন্যের দীপ্তি মাত্র। মধ্য যুগের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র ধ্রুব-সম্মানে চিহ্নিত হতে পারে। তার আলো, তার তেজ আমার জীবনের নব নব রূপায়ণে প্রত্যক্ষবর্তী দিশারী হয়েও তা রবি-দীপ্তির পশ্চাতে ক্রম-বিলীয়মান। তাই আমি যদি লিখি,

হোগলার ভিজে বনে
কচি কচি শশার মত
কেটে কুচি করে
ছড়াতে কী সুখ ঐ
আকাশের সোনালী ডিম চাঁদ।।

—এমনটাই হবে। এ কবিতার কিছু উপমা জীবনানন্দ থেকে নেওয়া, শুধু সাজাবার খাতিরে, ব্যাখ্যার প্রয়োজনে।

একটা কবিতাই নেওয়া যেতে পারে ঃ

''রাত্রিকে মনে হোত সমুদ্রের মতো
আজ সে রাত্রি নেই,
হয়ত এখনও কার হৃদয়ের কাছে
আছে সে রাত্রির মানে;
আমার সে মন নেই যে মন সমুদ্র হতে জানে''

এ কবিতার রুচি ও ভাবরীতি যে সংস্কৃতির কথা বলে, সে সংস্কৃতির বুকের উপর অনেক অনীহাস্রোত বয়ে গেছে—এর অতীত ভিত্তি কোথায়, হঠাৎ করে খুঁজে পাওয়া যাবে না,—কিন্তু প্রতিটি শব্দ প্রয়োগের ভঙ্গী থেকে, এমনকি সামগ্রিক চেহারা থেকেই বুঝে নিতে হবে, এর মধ্যে একটা সাধারণ দিকও আছে, যা কেবল পরিমার্জিত, বিশুদ্ধ এবং চেতনা সমৃদ্ধ।—সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য আমাদের সাহিত্যকে আজ এই সুন্দর রূপের অধিকারী করেছে। এ কখনো সম্ভব হোতনা, যদি সমাজ স্তব্ধ থাকতো।—তাহলে আজও কবিরা 'যদি মুই লম্ফ দিয়া' লম্বমানই থাকতেন মাত্র।

কিন্তু মধ্যযুগের সেই 'লম্ফে'র ফলশ্রুতিতেই 'চাঁদের টুকরো' আজ আমাদের মানস সরোবর-তটে।

কালচার

মানুষ বৃত্তি সকলের লালক। বৃত্তি আবার উৎকর্ষ প্রাপ্তিতেই সার্থক ; মানব-জীবন এই সার্থকতার অঙ্গী। উৎকর্ষমূলক বৃত্তির প্রতিক্ষণের কর্ষণে জীবন সচল এবং সংস্কৃতির অনুরাগী।

'সংস্কৃতি' শব্দ হিসাবে কুলীন নয়—culture অর্থে এর মৌলিক ব্যবহারও দাক্ষিণাত্যের ভাষাতেই প্রথম পাওয়া যায় অর্থাৎ, IE ভাষার জগতে এ শব্দ অপরিচিত না হলেও অপ্রচলিত ছিল।[১] কুলীনের মনোভূগোলে 'পূর্ব পুরুষোর্জিত ও স্বকৃতবর্ধিত সংস্কৃতি সম্পদ'কে 'বিদ্যা' নামে কর্ষণ করা হোত[২] এবং তা ছিল, উচ্চবর্ণের করস্থ সম্পদ। ১৫১০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত পাশ্চাত্য খণ্ডেও সংস্কৃতির ধারণা ছিল ঃ 'Improvement or refinement by education and training.'

আবাদ বা কর্ষণ (culture) অর্থে এই ধারণাকে পরিপুষ্ট করা হয় অষ্টাদশ শতকে।

ইংরজী সাহিত্যে কালচার শব্দটার প্রথম ব্যবহার পাই ফ্রানসিস ব্যাকনে (ষোড়শ শতক) ; ম্যাথুআর্নল্ড ও মার্কিন চিন্তাবিদ ইমার্সনই সম্ভবতঃ এই শব্দের সামাজিক তাৎপর্য তথা সংজ্ঞা নির্ণয়ে উৎসাহী হন উনিশ শতকের প্রায় মধ্যভাগে। বিংশ শতকে রবার্ট এ পার্ক, টেইলার থেকে টার্নার, টি এস এলিয়ট পর্যন্ত অনেকেরই অবদান এ পর্যায়ে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

১। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, 'সংস্কৃতি' শব্দ ঋগ্বেদে নেই। কিন্তু ক্ষিতিমোহন সেন 'আত্মসংস্কৃতি' শব্দটি ব্রাহ্মণে (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ) আছে বলে উল্লেখ করেছিলেন।

২। অথর্ব বেদ, দশম মণ্ডল।

বাংলা সাহিত্যে বংকিমচন্দ্র প্রথম culture-এর শব্দার্থ অনুসন্ধান করেছিলেন—উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে (১৮৮১)। ধর্ম[৩] ও বৃত্তির উৎকর্ষ প্রণয়নে ব্রতী হয়েই তিনি দেখেছিলেন 'culture শব্দের একটা প্রতিশব্দও আমাদের দেশীয় কোন ভাষায় নাই।' (নবজীবন, শ্রাবণ ১২৯১।) সর্বাঙ্গ সম্পন্ন আদর্শ, চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তি, অনুশীলন, মানববৃত্তির উৎকর্ষণ প্রভৃতি শব্দ সন্ধানের পেছনে বংকিম চন্দ্রের মানসগঠন, দর্শন [তথা সীলীর ব্যবহৃত culture শব্দের ভ্রান্তি] ও উদ্দেশ্য বোঝা যায়।

রবীন্দ্রনাথও প্রায় শেষ বয়সকাল অবধি কালচারের প্রতিশব্দের যথার্থ অনুসন্ধান করেছেন এবং সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ই বোধ হয় ১৯২২ সালে সর্ব প্রথম দাক্ষিণাত্যের মারাঠী গোষ্ঠির কোন ভাষায় একটা ব্যাপক অর্থে ও জাতির পরিচয় বোধক অর্থে 'সংস্কৃতি' শব্দের প্রায় আবিষ্কার করেন;[৪] এই সময়ই রবীন্দ্রনাথ কৃষ্টি শব্দের প্রচলন তুলে দেন[৪]। ইতোপূর্বে রবীন্দ্রনাথ 'আত্মসংস্কৃতি' পর্যন্ত এসেছিলেন। অতঃপর সেখান থেকেই 'সংস্কৃতি' শব্দমান ও অর্থ মাত্রার নানা তাৎপর্যে সিদ্ধ শব্দে রূপান্তরিত হয়ে ওঠে।[৫] কিন্তু culture-এর পূর্ণ সংজ্ঞা বা অভিধা রচনা নিয়ে আজো সেই গোল চুকে যায় নি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে সমাজতত্ত্ব ভিত্তিক আলোচনার ওপর আমাদের দেশে খুব গুরুত্ব পড়ে, পরিচয় প্রভতি পত্রিকায় তখন সেই সব আলোচনার প্রধান মুখপাত্র হয়ে ওঠে। একই সময় মুসলিম জাতীয়তাবাদী চেতনা সমাজে বেশ প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। সমাজ ইতিহাসে তার প্রকাশ দেখা যায় সমান্তরাল ভাবে অবস্থিত দুটি প্রবাহে: প্রথমটি, বুদ্ধিমুক্তি আন্দোলন কেন্দ্রিক, সংস্কৃতি যার

৩। 'The substance of Religion is culture' বংকিমচন্দ্র এই উক্তি ব্যবহার করতেন।

৪। দ্র, সাংস্কৃতিকী, (১ম খণ্ড ১৯৬২), সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ৮।

৫। আচার্য যোগেশ চন্দ্র রায় বিদ্যানিধিই প্রথম সভ্যতা-সংস্কৃতি ও কৃষ্টি শব্দত্রয়কে সচেতন ভাবে পৃথকীকরণের প্রশ্ন তোলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে সৈয়দ মুজতবা আলী উক্ত লেখকের যুক্তির ওপর যথেষ্ট আলোকপাত করেন দেশ পত্রিকায়।

একটি অবশ্যউপায় কিংবা অবলম্বন – যদিও এই সংস্কৃতি গৃহমুখী ছিলনা বা আঞ্চলিক বিভাগে নিষ্পন্ন কোন 'ব্যক্তিত্ব' মুখীও ছিল না – তা ছিল বিশ্বমুখী ও সমকালীন।

দ্বিতীয়টি, আজাদ ও মোহাম্মদী কেন্দ্রিক এবং নজরুল থেকে আকরাম খাঁ পর্যন্ত যার বিস্তার। এ কেন্দ্রেই আমরা তমদ্দুন ও মুসলিম ঐতিহ্যের পুনর্জাগরণ লক্ষ্য করি বিশেষ বা রাজনৈতিক অর্থে।

পাকিস্তানোত্তর কালে এই দুই ধারা মৌলিক ভাবেই অনেক সমৃদ্ধ হয়েছে। ফলে culture শব্দের অভিধা বা প্রতিশব্দ নির্মাণ আজ আবার একটা সমস্যায়[৬] পরিণত হয়েছে বলা যেতে পারে। সনাতন ধারণায় culture কে গ্রহণ আজ সম্ভব কিনা সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই তা বোঝা যায়। অর্থাৎ এই শব্দের আধারে ব্যক্তিজীবনের পরিবেশ ও জাতীয় জীবনের প্রেক্ষিতে ঠিক যা প্রকাশ করতে চাই, ইতোমধ্যে তা একটা পূর্ণতত্ত্ব বা বিজ্ঞানে (Discipline) পরিণত হয়ে উঠেছে, যার সম্পর্কে হয়ত আমাদের অতীত চিন্তাবলী অকেজো হয়ে পড়েছে।

কথাটা পরিষ্কার ভাবে বলার প্রয়োজন থাকতে পারে। culture বা কালচার একটি বিশ্ব আলোচিত শব্দ। এর গঠন উপাদান উৎপাদন এবং জাতি গঠনে এর উপাদান সংগ্রহের অবদানের দিক থেকে কালচার একটি ব্যাপক ও কর্ম প্রবাহময় শক্তিশালী শব্দ। বহিশক্তির যে কোন চাপ গ্রহণ ও অন্তর্শক্তির ওপর প্রভাব সৃষ্টি—এই দুথ দৃষ্টিবিন্দু থেকে দুটি [কিংবা তিনটি এবং কখনো চারটি কৌণিক মাত্রায় বা Dimension-এ] এ শব্দটি অবস্থিত। কালচারকে আবহমানকালের ধারণায় বা ঐতিহ্যানুসারী (Traditionaly) প্রক্রিয়ায় বিচার

৬। পূর্ব পাক সাহিত্য সম্মিলনী (চাঁটগা অধিবেশন), ১৯৫৮-এ আবুল মনসুর আহমদ কর্তৃক সভাপতির অভিভাষণ প্রভৃতিও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

করা[৭] বর্তমানে একটি পরিত্যক্ত রীতি বা বড় জোর classial পদ্ধতি। স্থির বা Dogmatic মূল্য বা নির্দিষ্ট মতবাদের ওজনেও কালচারের অভিধা গ্রহণ সম্ভব নয়। কালচার সম্পর্কে পুনর্বিচার এবং পুনরালোচনা (Revaluation) আজকে একটি অত্যন্ত জরুরী প্রশ্ন।

কুলটুর[৮] শব্দের সাদৃশ্যে অনেকে কুলচুর বা কালচার বলে থাকেন। জার্মান শিল্পী ও বুদ্ধিজীবিদের হাতে এ শব্দটি আসার আগে ফরাসীতে, দিদারোর এনসাইক্লোপিডিয়া অনুসারে শব্দটি বিশেষণ মাত্র ছিল অথবা একান্তভাবে কর্ষিত ক্ষেত্র বা বিষয়কেই বোঝাত। অর্থগত দিক থেকে এই দু'ই সংস্কার নিয়েই শব্দটি ডোভারের প্রণালী পার হয়ে নৌ-সংস্কৃতির দেশ বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে আসে। এই অর্থে এ শব্দের প্রাচীনতম প্রয়োগ পাই সারভেন্টিসের অমর চরিত্র সংকোপাঞ্জার রূপকাশ্রয়ী সংলাপে।

স্পেনীয় আদর্শে এ্যাংলো-আমেরিকান কর্ষণ-সংস্কার প্রথম মহাযুদ্ধের সময় পরিবর্তিত হয় এবং এ পরিবর্তনের জন্য যাঁর অবদান সবচেয়ে বেশী তিনি হলেন টমাস মান।

টমাস মানের আন্দোলনের পর থেকে এ যাবৎ culture কর্ষণের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া সম্ভব। সে ইতিহাস অবশ্যই মতবাদের ইতিহাস এবং এ মতবাদ রাজনৈতিক মঞ্চকে বহু আগেই পেছনে ফেলে ক্রমে দর্শন ও মনোবিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান ও সর্বশেষে বিজ্ঞানের থিওরী, টেক্‌নলজি এবং পরীক্ষামূলকতা বা Experiment-এর দ্বারে এসে আজ উপনীত।

৭। এ বিষয়ে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য ঃ 'আজকালকার সভাসমিতিতে ··· সাহিত্য আলোচনা, নৃত্যগীতের উৎসব, আবৃত্তি, অভিনয়, হাস্যকৌতুক—এইগুলি আমাদের নতুন শেখা বিদ্যা ও মনোরঞ্জন বৃত্তির সামাজিক প্রয়োগ, ইহারা কোন অখণ্ড জীবনানুভূতির নানামুখী প্রকাশ নহে। এখনকার শিক্ষাব্যবস্থায় ও সমাজ জীবনে আমাদের সমগ্র মনোবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তির অনুশীলনের কোন সুযোগ নাই।" (সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থ সঙ্গমে, পৃ. ৪৬৪)।

৮। লাতিন, কুলতুরা।

কালচার প্রশ্নে এ যাবৎ যে সব তত্ত্ব উদ্ঘাটিত হয়েছে তার মধ্যে যেগুলো প্রধানভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, সাধারণভাবে তাদের উল্লেখ করা যায়ঃ

ক) মানের শিষ্য অসওয়াল্ড স্পেঙ্লারের Kulturgeschichte Debate (বিতর্কমূলক ও বিরোধমূলক তত্ত্ব) অর্থাৎ vitalistri culture (গ্রীস, জর্মন) এবং Petrifying civilizations (রোম, আমেরিকা)-র পার্থক্য নিরূপণ তত্ত্ব;

খ) Trotsky তত্ত্ব ও তার বিরোধী আন্দোলন। ষ্টালিন-ট্রট্স্কী ধারণার মৌলিক পার্থক্য গণসংস্কৃতি ও আঞ্চলিক সংস্কৃতি বনাম মার্ক্সীয় দর্শনের ও সংস্কৃতির সীমিত করণের প্রশ্নে। সংস্কৃতির সামাজিক নিয়ন্ত্রণ এবং সমাজ সংস্কৃতির পুনোদ্দম শক্তির প্রশ্রয় ভিত্তিতে এই শিবির বিভক্ত আন্দোলনের সূত্রপাত হয়;

গ) সর্বজনবিদিত Eliot-তত্ত্ব এবং তৎবিরোধী Dwight Macdonald-এর Mass cult and Mid cult.

ঘ) e pluribus unum তত্ত্ব। একে wildean paradoxও বলা হয়। Sir Charles Snow-র এইরূপ ধারণা থেকে এ তত্ত্বের সূত্রপাত নির্দেশ করা যায়ঃ

It would be better to acknowledge the co-existence of further subcultures, a multicultural pluralism—or better still, e pluribus unum, one larges heterogeneous culture, democratically split up into numerous professional lobbies."

আসলে theory of popular culture ও theory of bi-culture প্রভৃতি অধুনা-প্রচলিত নব-সংস্কারেরই প্রতিক্রিয়া এই গুণিত সংস্কৃতি। কারণ ইতোপূর্বে (১৯৫৯) Sir Charles Snow কি ভাবে 'Two-culture' সমাজে অবস্থান করে তার বিশদ আলোচনা প্রকাশ করেন এবং তার সীমা নির্দেশের ব্যাখ্যার ভিত্ততেই কেমব্রিজে kulturkampf আন্দোলন গড়ে ওঠে। কেমব্রিজের প্রধান অধ্যাপক F. R. Lewis অবসর গ্রহণের সময় প্রদত্ত ভাষণে সমকালীন সংস্কৃতি চিন্তার যে রূপ চিত্রিত করেন তাকেই আবার একটি তত্ত্বগত ভাবে, বলা যায়

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দান করেন Lionel Trilling. তাঁর মতবাদে নতুনত্ব প্রচুর আছে এবং সেখানে বিশেষজ্ঞ ছাড়া অন্যের যাতায়াত অবারিত নয়।

ঙ) অন্যবিধ তত্ত্বসমূহ মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত করে সাজাতে চাই,

১. Scholastic quiddity (Tertium quid) ;
২. Methodological.
৩. Synthetical.

প্রথম ভাগে আসে what-how এবং who-how তত্ত্ব। এবং সংস্কৃতির মৌলিক দিক যে তত্ত্বে ধরা পড়ে সেই theory of Beauty-culture.

দ্বিতীয় ভাগে তিনটি অতি-ভাগের বিষয় আসে, যেমন, *

(অ) Inter Disciplinary তত্ত্ব যার অন্তর্গত উপাদান sciences, morales et politiques, Inscriptions et belles-letteres, এবং Beaux-Arts.

(আ) Cultural Discipline—কিছু ঐতিহাসিক, কিছু দার্শনিক কিছু সমালোচনামূলক ; কিছু অঙ্গতত্ত্বমূলক এবং Biological ('Togather with the specifics of a particular speciality and such auxillary skills, as the languages or Mathematics.)

(ই) Tripartite অথবা Intellectual discipline যেমন, সমাজ বিজ্ঞান, প্রকৃতি বিজ্ঞান ও মানব বিজ্ঞান।

তৃতীয় ভাগে সংশ্লেষ মূলক আন্দোলনই মুখ্য। এতে পাঁচটি দিকের পরিচয় ক্রমশঃ ও স্বতন্ত্রভাবে গ্রহণ সম্ভব ঃ

---

* Harry Levin প্রভৃতি মনীষিবৃন্দ সংস্কৃতির এই ত্রিবিধ ফলনকে কেবল বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান ও মানবিক জ্ঞান এই ভাবে ভাগ করেন। তাঁদের মতে এগুলো High–, Low—, and Middle-brow Culture. এবং তার ভিত্তি হিসাবে একদিকে বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতি ও অন্যদিকে অন্যান্য বিবেচনা ও বিষয়কে স্থাপন করে বিচার করা হয়। অধুনা এমতও গ্রাহ্য।

১। সামগ্রিকতা মূলক (Total culture : Gestalt) এদিকটা নৃতত্বের বিষয় (R. Benedict প্রমুখাৎ বিশ্লেষিত)

২। মার্ক্সীয় সংশ্লেষণ মূলক বা Marxian synthesis

৩। হোমিওষ্ট্যাটিস বা এনাটমিক্যাল (W. B. Cannon) বা পুষ্টিতত্বমূলক

৪। ভাষাতাত্বিক (Humanistic culture : জর্মন)*

৫। Audio-visual culture.

বলা বাহুল্য এদের মধ্যে একদল আছেন তাঁরা ethnocentric গোষ্ঠী। ইতিহাসের তথাকথিত বৈজ্ঞানিক পঠন পাঠনের ভিত্তিতে বিভিন্ন কর্মসূচী নির্মাণ এদের high culture এর প্রমাণ। 'The one, the only culture' এদেরই ধূয়া। Cultural revivalism বা প্রলেতারিয়েৎ সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন প্রশ্নে এদেরই অন্য শাখা আন্দোলনকামী হয়েছে।

বিভিন্ন তত্ব অনুসন্ধানে পাঁচটি মূল তত্বের উল্লেখ এখানে করা হল। এইসব তত্বের প্রত্যেকটিই এক একটি জগৎ এবং বর্তমানে পরীক্ষা নিরীক্ষার অন্তর্গত। এইসব মৌলিক তত্ব এবং কালচারের মূল ও মূল্য গ্রহণের পদ্ধতিগত পার্থক্য গবেষণান্তরে যতই দিগন্ত প্রবাহী হচ্ছে, 'কালচার' ততই তার পূর্বরূপ, পূর্ব গুরুত্বের বিশিষ্ট দিকগুলির মহিমা ও প্রবণতা এবং চারিত্র্য থেকে কেন্দ্রচ্যুত হয়ে অনুত্তর প্রশ্নগর্ভ হতে শুরু করেছে। ফলতঃ কালচার সম্পর্কে নবতম সংজ্ঞাদান এ কালে একটি দুরূহতম কর্ম এবং তার ব্যাখ্যা প্রদানও প্রায় একটি অশেষ কাহিনী বর্ণনার সমান।

যে সব প্রক্রিয়ার একটি সাধারণ ও যথাসম্ভব সাধারণবোধের কাছাকাছি সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করে কোন কোন পণ্ডিত বিতর্ক থেকে উর্ধ্বে থাকতে চেয়েছেন, তাতে এই সত্যগুলিকে গণস্বীকৃতির মানে এবং পূর্ব সর্তরূপে গ্রহণ করেছেন বলেই তা সম্ভব হয়েছে বলে আমি মনে করি :

* Edmund R. Leach বলেন, "Culture can survive only where one human generation can transmit its accumulated knowledge to the Next. এবং R. Bain এই মতবাদের প্রবর্তন করেন যে, "Culture is all behaviour mediated by symbols.'"

ক. সারভেন্টিস ব্যবহৃত cultivació n শব্দের সমার্থক শব্দ ইংরেজী ভাষায় না থাকায় কালচার শব্দটি বহু পরবর্তি-কালে বিভিন্ন অর্থরূপ পরিগ্রহ ও পরিবর্জনের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় এবং এটি সমসাময়িক কালের বর্ধিষ্ণু সমাজেই যথা অর্থরূপে বিকশিত একটি বহু যুগবাহী বহু অর্থরূপী বহু ইংগিতবাহী ও প্রশ্নগর্ভ একটি শব্দ।

খ. প্রথম মহাযুদ্ধকালে টমাস মানের প্রচারণায় 'zivilisation' ও 'kultur'কে ভিন্ন তাৎপর্যে ও ভিন্ন মানে উপস্থাপন করা হয় এবং তদবধি মানবতার পূর্বসর্ত ও চলমান সর্তসমূহ উপযোগিতার ক্ষেত্রে যে প্রশ্ন উত্থাপন করে তার সম্পর্কে মানুষের সচেতনতা পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পায়—এমন কি এর সম্পর্কে ভাববাদী ধারণাগুলিকে দূর করে সত্য অনাবরিত করার আন্তর্গরজে গবেষণা পর্যন্ত চলতে থাকে।

গ. যেমন সভ্যতা থেকে সংস্কৃতিকে আলাদা চিহ্নিত করার প্রয়োজন দেখা দিল, তেমনি Race tradition, By-culture, Parrallel culture, Higher culture, Popular culture প্রভৃতি উপতত্ত্ব এবং মূল্যবোধ সম্পর্কিত গ্রীক, জার্মান, ফরাসী, এবং ইঙ্গ-মার্কিন ও পূর্ব-দেশীয় প্রশ্নের সংঘাতকে এড়াবার কারণ বৈজ্ঞানিক অর্থেই প্রয়োজনীয় হয়ে উঠলো।

ঘ. সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বৈজ্ঞানিকগণ এটাও লক্ষ্য করেছেন যে, সমাজের অবস্থান ও পশ্চাদভূমি বলে দুটি কথা আছে এবং তার সমগ্রতায় ও পরস্পর বিরোধিতায় মানুষ তার জন্ম সার্থক বিবেচনা করে। অনুভূতি প্রবণতা, যৌক্তিক বাস্তবতা, মূল্যবোধ, যুক্তিবিচার প্রভৃতি সকল যুগে তুল্য মূল্যে বিচার্য না হয়েও culture, অর্থাৎ সংস্কৃতির সত্যতা আপেক্ষিক

মূল্যেই তাৎপর্যপূর্ণ। দ্বিতীয়তঃ, শত্রুর সংস্কৃতি কিংবা দলগত বা ধর্মগত, জীবনযাত্রা প্রণালীগত বা সমাজ বিন্যাসগত দিক থেকে ভিন্ন সংস্কৃতি বা culture সব সময় নির্দিষ্ট culture এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে 'cover' করে না। এসব ক্ষেত্রে প্রযুক্ত অমানুষিকতাও আমার সংস্কৃতিতে সুব্যাখ্যেয়। তৃতীয়তঃ, নিষ্ঠুরতা, গোঁড়ামী, দুর্বিনীত নষ্টামীর বহিষ্করণ মনুষ্যত্ব বোধ আনে এবং শক্তি হিসাবে, অনুষ্ঠান হিসাবে culture-এর অচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে এদের সুষ্ঠু বিকাশ সমাজে অবশ্যকাম্য, অথচ এরই অভ্যাস বা practice এর ওপরই তা নির্ভরশীল। আইনানুগ ভাবে এ সত্য **Paradoxical** কিন্তু বাস্তব পরীক্ষিত।

ঙ. এবং সর্বশেষ বোধটি এই, বর্তমান সমাজ বিজ্ঞানের দান, দ্রুত পরিবর্তন ও মূল্যবোধের দ্রুত অপসরণতা এর লক্ষণ, পিতার অভিজ্ঞতা পুত্রের কাছে অচল—লোকজ্ঞান বা অভিজ্ঞতা এখন বিজ্ঞানের কাছে হার মেনেছে, জ্ঞানের এখন অন্য অর্থ অন্য অভিধা, অন্য আধারে তা বিচার্য—এই value free (মূল্যরহিত) উদ্দাম সম্মুখ প্রসারী জ্ঞান এ যুগের মনমানসিকতার কারিকর। বর্তমানে ভালমন্দ বিচারও একটা সেকেলে খেয়াল। মানুষ নবজীবনের যাত্রায় ও প্রাচীন আশ্রয়ের শান্তি থেকে বাইরে এসে অনিকেত, দুর্বিনীত কালের প্রতিযোগী জীব এবং নৈরাশ্য পীড়িত তামসিক চেতনার অজস্র একক সত্তা। সংস্কৃতি মানুষেরই সংস্কৃতি এবং তা Primitive culture এবং তার পরিবেশ উপযোগিতা ও অন্যান্য শর্ত থেকে ভিন্ন। নীটসের Apollonian কৃষ্টি বা Hellenic sense এর প্রাবল্যে Dionysian বা কোথায় আজ ছিন্নমূল কে বলবে ? কেউ বা যদি তেমন সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরে থাকেনও তবে সেই hideous torture এর মাশুল তাকে দিতেই হয়।

সাম্প্রতিকতম culture বিচারের ধারাটি খুব ঔৎসুক্যপ্রদ ঃ Human Biology-র দিকে থেকে traits এবং particles বিচার আজকের একটি Fashion. This was a radically different focus from that of the utilitarian economists, because traits were elements in the organization of human relationships, not properties of the individual human being……

প্রসঙ্গতঃ culture সম্পর্কে economist দের ধারণায় কথাও উল্লেখ করতে হয়। পাকিস্তানে সরকারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা জনাব Rashid Ibrahim অনুন্নতদেশে অর্থনীতি ও সংস্কৃতির পারস্পরিক সম্পর্কে বিচার করতে গিয়ে যে প্রশ্নটি তুলেছেন, সেইটিই সেই দৃষ্টি কোণের পরিষ্কার ব্যাখ্যাতা। প্রশ্নটি এই ঃ Must we import 'Beatles' along with Boeings ?' তিনি বলেছেন পূর্বীয় দেশগুলি ধর্মগত কারণে প্রগতির বন্যাকে ভয় করে এ কথা সত্য নয়, এবং দ্বিতীয়তঃ ইসলামের মত ধর্মের পুনর্বিচার প্রশ্নটি একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রশ্ন। তিনি স্পষ্টতঃই বলেছেন, the exploitation of culture for economic development provides a field of study which has considerable room and attraction for further thinking and research.

পরিশেষে, culture সম্পর্কে যে আলোচনা এখানে উত্থাপিত হলো তা যে কোন সমস্যা নয় এবং প্রশ্নহিসাবেই যে তাকে আনা হয়েছে এইটুকু এখানে না বললেও আশা করি আমি জবাব দিহি থেকে রক্ষা পাই।

সংস্কৃতি

চার্লস মোরাসের ১৯০৫ সালের একটি উক্তি তুলে আরম্ভ করা যাক ;

> "বহির্জীবনের আভিজাত্য এবং গণতান্ত্রিক ভাবনা চিন্তায় স্বার্থান্ধ বর্বরতা, এই-ই আমাদের ভবিষ্যৎ। বলাবাহুল্য, এমনতর সমাজ ব্যবস্থায় ভাবুক ও চিন্তককে নিজের অর্থ ও প্রতিপত্তির বিনিময়ে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, কারণ তথাকথিত সামাজিক মর্যাদা, সাফল্য এবং সম্মান শুধুমাত্র খোশামুদে হাতুড়েদেরই পুরস্কৃত করে। কোনকালেই বীর ও ঋত্বিককে তার অহংকারের প্রায়শ্চিত্য স্বরূপ দারিদ্র্য ও নিঃসঙ্গতাকে মেনে নিতে হবে সম্ভবতঃ এমনতর ভাবনা লৌহযুগেও অকল্পনীয় ছিল। এ সমাজে হয় তারা ভোগ্যাপকরণের প্রাচুর্যের সম্মুখে বদ্ধবাহু হয়ে বুভুক্ষ থাকবে ; নতুবা তুচ্ছ উচ্ছিষ্টের লোভে কুঁজো হয়ে সারমেয়র পর্যায়ে নেমে যাবে।"

বিগত বিশ বৎসরের ইতিহাসে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আমাদের জীবনে চার্লস মোরাসের কথা আরো স্পষ্ট হয়েছে। ফলতঃ এক সাংস্কৃতিক সংকট ও অবক্ষয় নেবে এসেছে সর্বত্র।—

ক) রাজনীতির ক্ষেত্রে এর রূপ ক্রমবর্ধমান Ambition ও ব্যক্তিস্বার্থের চরিতার্থতা ;

খ) বুদ্ধিজীবিগণ অবসাদগ্রস্ত এবং রবীন্দ্র উত্তরাধিকার তো আগেই ব্যর্থ হয়েছিল ;

গ) সুস্থ আন্দোলনে ছাত্রদের চরম ব্যর্থতা লক্ষ্য করা গেছে ;

ঘ) "সাংবাদিকতা নিছক পেশা ; তার পায়ে পায়ে এসেছে Yellow Journalism-এর বুলবুলিটা, যেটা শিল্প সাহিত্যের কারদায় ঘাড়

ফোলায়, মৃদু পক্ষ সঞ্চালনে যৌনরোচক, হঠকারী সংবাদ গল্পের আড়কে সিক্ত করে পরিবেশন করে। এরা কেউ পেটোয়া সাংবাদিক কেউ হাফ-কবি। ইদানিং এরা বড়ই দুর্বার। বাঙলা সাহিত্যের লীগাল গার্জিয়ান হয়ে বসেছে। এদের হিস্যার বাঙলা সাহিত্যের ইজারা দীর্ঘমেয়াদী। বুদ্ধিজীবিরা এখানে শিকার।" [রবিসেন]

ঙ) Self styled Humanist-দের আবির্ভাব পাদপূরণ করে এর সম্পূর্ণতা এনেছে এখন।

আমাদের বিষয়টা সংস্কৃতির অন্তর্গত। সংস্কৃতি[১] এই শব্দের আধারে তার ব্যাখ্যা গ্রহণের সুবিধাকে আমরা গ্রহণ করেছি। সংস্কৃতি—সম্ কৃ+ক্তি ভাব বা। বিঃ স্ত্রী

Culture শব্দের অভিধাগত সুবিধা-অসুবিধা দুই-ই আছে। বংকিমে আছে,—

গুরু। Culture বিলাতী জিনিস নহে। ইহা হিন্দু ধর্মের সারাংশ।

শিষ্য। সে কি কথা? culture শব্দের একটা প্রতিশব্দও আমাদের দেশীয় কোন ভাষায় নাই।

গুরু। আমরা কথা খুঁজিয়া মরি, আসল জিনিসটা খুঁজি না, তাই আমাদের এমন দশা।

বংকিম চন্দ্রের এই সমস্যা ছিল ১২৯১ সালের শ্রাবণ মাসের নবজীবন পত্রিকাতে। এবং 'সীলীর' ব্যবহৃত অর্থে culture শব্দের ভ্রান্তি বংকিমকে 'সর্বাঙ্গসম্পন্ন

১। উৎকর্ষমূলক বৃত্তির কর্ষণে সংস্কৃতির উদ্ভব। অভিধানে একে culture বলা হয়েছে। SOED [VOL. I]—এ এর ব্যবহার দেখানো আছে ১৫১০ খৃষ্টাব্দ কালীন এবং অর্থ ঃ Improvement or refinement by education and training. আবাদ বা কর্ষণ অর্থে এ শব্দের প্রচলন অষ্টাদশ শতকে ব্যাপক [Webester]। আমাদের সাহিত্যে culture-এর অনুরূপ অর্থসহযোগ গ্রহণ করেছেন বংকিম। যেমন ঃ "উদ্ভিদের পক্ষে কর্ষণ যাহা, মনুষ্যের পক্ষে স্বীয় বৃত্তিগুলির অনুশীলন তাই ;এ জন্য ইংরাজীতে উভয়ের নাম culture! এই জন্য কথিত হইয়াছে যে, "The substance of Religion is culture." মানব বৃত্তির উৎকর্ষণেই ধর্ম।"(বংকিম রচনাবলী, সাহিত্য সংসদ পৃঃ ৫৯১)

আদর্শের' সন্ধানে উদ্বাকুল-চিত্ত রেখেছে এবং এই গুরু-শিষ্য কথোপকথনের মধ্যে শিষ্য সেই ফাঁকটুকুতেই প্রশ্ন ছুঁড়ে দিতে ইতস্ততঃ করে নি। যেমন,

"পাশ্চাত্তের Æsthetic ও Intellectual বা Emotional মধ্যে ধরেন, কিন্তু আপনি চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি পৃথক করিলেন।"

বংকিম দ্বিজবর্ণের চতুরাশ্রমকে System of culture বলেও উপাসনা ও যোগব্রতাদির এক উচ্চ প্রাচীরে একে আবদ্ধ রেখে 'মানবজীবনের বৃহৎলীলা'র অনুসন্ধানে ব্যর্থ হয়েছিলেন। অনুমান করি রবীন্দ্রনাথের অশিষ্য জনোচিত প্রশ্নেও "পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়ম" নীতিতে ক্ষমা করার জোর তিনি কোথায় পান।

সংস্কৃতি কথাটা শব্দ হিসাবে প্রাচীন। সভ্যতা, কৃষ্টি প্রভৃতির প্রতিনাম হিসাবে আজ এর পরিচয়।

ঋকবেদের অর্বাচীন অংশে মানুষের মাহাত্ম বর্ণনা আছে[২] এবং আথর্বণ ঋষিগণ (ব্রাত্য) ব্রতহীন সহজ মানুষের এবং পৃথিবীর জয়ধ্বনি দিয়েছেন অথর্বে[৩]। সংস্কৃতি এই সময়ই উচ্চবর্ণের করস্থ সম্পদ হয়।

বৈদিক সাহিত্যে বর্ণনা আছে যে বিদ্যা ব্রাহ্মণের কাছে এসে বলল, আমি বিদ্যা, তোমাদের পূর্ব পুরুষোর্জিত সংস্কৃতি সম্পদ। আমাদের রক্ষা করার দায়িত্ব তোমাদের।

বিদ্যা হ বৈ ব্রাহ্মণম্ আজগাম
গোপায় মাম্ শেবধি স্তেহমস্মি।

শিক্ষায়তন গড়ে ওঠার এই হলো আদি তথ্য। জ্ঞানপন্থীরা অনেকেই ক্ষত্রিয়। ভক্তিপন্থীরা [শিব বিষ্ণু সাধক] হলো তীর্থগামী।

শিক্ষার স্থান নির্দিষ্ট হয়ে গেল এবং সেদিনের 'ইতরার (মা) দুঃখকে বহন করে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ আজো আমাদের কাছে জিজ্ঞাসা হয়ে আছে।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ শিল্পস্তুতিতে বলেন, '…আত্মসংস্কৃতি র্বাব শিল্পানি, ছন্দোময় বা এতৈর্যজমান আত্মানং সংস্কুরুতে।' অর্থাৎ, এই সব (দেব শিল্পের অনুকৃতিমূলক)-

২। দশম মণ্ডল ঃ পুরুষ সূক্ত।
৩। অথর্বের ঋষিরা অনেক সময় দেবতার কথা না বলে মানুষেরই জয়গান করেছেন। দ্বাদশ কাণ্ডের প্রথম ৬৩টি ঋকই পৃথিবীর মহিমা সম্বন্ধীয়।

শিল্পই আত্মার সংস্কৃতি এবং এগুলোতে সাধারণ গৃহসেবীলোকেরা নিজেদেরকে ছন্দোময় করতে সক্ষম।

সংস্কৃতি জীবন বিচ্যুত নয় ; জীবনেই এর মূল্য। সাংস্কৃতিক-জীবন আধুনিক জীবন জিজ্ঞাসারই ফসল। ঊনবিংশ শতকে প্রথমে শিক্ষা, ও সভ্যতা এবং পরে কৃষ্টি ও সাহিত্যই ছিল সমস্যা। বিংশ শতকে পুনরপি শিক্ষা ও সভ্যতার সংকট দেখা দেয়। এই সংকট জটীল হয় মহাযুদ্ধের কালে। এটাই আমাদের সচেতনতা তথা আধুনিকতার কাল।

বাংলা দেশের আধুনিকতা তিনটি বিশেষ ঘটনার ফল ঃ হিন্দুজাগরণ>মুসলিম জাগরণ>গণজাগরণ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর তার বাস্তবতা উপলব্ধি করা গেছে। 'সংস্কৃতি'-চেতনার কালে আমরা আবার বিভক্ত হয়েছি। এই বিভক্তির প্রয়োজন ছিল। আমরা আমাদের চেতনাকে জীবন দর্শন থেকে সরিয়ে নিয়ে জীবন বৃত্তির ওপর স্থাপন করেছি। এই সময় আমাদের মনের অখণ্ড ভাবনাগুলির বিনষ্টি ঘটে। সংস্কৃতির অবিভাজ্যতাই তখন মনের মুক্তি এনে দেয়।

সংস্কৃতি প্রাচীন শব্দ হলেও উনিশ শতকেও এর আবশ্যকতা অনুভূত হয় নি ; কাব্যগতপ্রাণ ব্যক্তিদের কাছেও। বিংশ শতকে যতদিন না ভারতীয় সভ্যতার অখণ্ড-চিন্তার দর্শন[৪] ব্যবহারিক জীবনে (তথা রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে) দুঃসহ ব্যর্থতায় এসে দাঁড়ায়, ততদিন সমকালীন জীবনাচরণের বাস্তব দিকগুলি গ্রহণের প্রশ্ন আমাদের মনে আসে নি। রবীন্দ্রনাথ কৃষ্টির কাঠিন্য ও নৈষ্টিকতাকে রসপ্রাণতায় মণ্ডিত করতে চেয়েছিলেন। সংস্কৃতি শব্দে সেই আন্দোলনের সূচ্যগ্রতা এসেছে। কৃষ্টি-সভ্যতা বা ঐহিক-পারত্রিক চিন্তা কিংবা চৈতন্য-সদ্ধর্ম'তারএর বর্তমান ব্যবহার খাটে না। রবীন্দ্রযুগে ব্যবহৃত বহু শব্দের সাহায্যে সেই অর্থসীমাসন্ধান করা হয়েছে, যেমন ঃ ১. ব্যাপক অর্থে ঃ ঐতিহ্য ; সভ্যতা (civilisation) জাতিতত্ত্ব ও জাতিয়তা প্রভৃতি। ২. সংকীর্ণ অর্থে ঃ সংস্কার ভাব

৪। 'অখণ্ড ভারত', দেশমাতা প্রভৃতি শব্দে সভ্যতা, দেশ ও জাতিকে অখণ্ডভাবে কল্পনা করা একসময় একটা আন্দোলন ও কৃষ্টির অন্তর্গত ব্যাপার বলে গ্রহণীয় হয়েছিল। 'সংস্কৃতি' আঞ্চলিকতাকে গ্রহণ করে পরে আবার পূর্ণরূপের সাধনায় যুক্ত হয়।

ধারা রুচি : মন ; জীবন) ৩. সাম্প্রদায়িক অর্থে : হিন্দুয়ানা-মুসলমানিতা-বাঙালিয়ানা প্রভৃতি ৪. সংস্কার অর্থে : স্বাতন্ত্র ; নব্যবিধান ; আদর্শ ; ব্রাহ্মণত্ব প্রভৃতি ৫. জাগরণ অর্থে : পঞ্চকৃষ্টি ; শিক্ষা-দীক্ষা-সাহিত্য-কর্ম-জ্ঞান ; মৌলিক অধিকার প্রভৃতি। সুনীতি চট্টপাধ্যায় বিলাত থেকে ফিরে এসে রবীন্দ্রনাথকে প্রথম 'সংস্কৃতির' দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করান বলে কথিত আছে। কিন্তু সমগ্রিক চেতনার আলোকে ও গুণধর্মে সংস্কৃতি শব্দ সেকালে পূর্ণাঙ্গ ব্যবহারিক রূপ পায় নি।

আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি সভ্যতা সংস্কৃতি ও কৃষ্টি শব্দত্রয়ে প্রথম সচেতন ভাবে স্বতন্ত্র অর্থযোগ করেন। —

"আমি সভ্যতা সংস্কৃতি ও কৃষ্টি এই শব্দত্রয় ত্রিবিধ অর্থে প্রয়োগ করিয়া থাকি।

১। দেহের সুখবিধান যে কৃতির লক্ষ্য তাহা সভ্যতা।

২। যদ্দারা মনের সুখ বিধান হয় তাহা সংস্কৃতি।

৩। যদ্দারা বুদ্ধি ও জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় তাই কৃষ্টি।

মহেন-জো-দেড়োর আবিষ্কৃত পুরাকৃতি প্রাচীন সিন্ধুবাসীর সভ্যতার, ভারতনাট্যম প্রাচীন হিন্দু সংস্কৃতির এবং নয়টি অংকদ্বারা যাবতীয় সংখ্যা প্রকাশ বৈদিক আর্য গণের কৃষ্টির পরিচায়ক।"

দার্শনিক ভঙ্গী ত্যাগ করে যথার্থ ব্যবহারিক ও ক্রিয়াশীল জীবনে তাত্ত্বিক অর্থে 'সংস্কৃতি' শব্দের আহরণ বাংলা সাহিত্যে ও সমাজ জীবনে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা দুর্ভিক্ষ ও যুদ্ধপরবর্তী আত্মিক লাঞ্ছনার কালে সমাজ ব্যবস্থায়, ধর্ম ও অন্যান্য ক্রিয়ানুষ্ঠানে ও চিন্তাধারার ক্ষেত্রে যে অবক্ষয়জনিত দুর্গতি নেবে আসে তাতে জীবনের ক্ষেত্রে সম্মুখ অনুশীলনী তথা সংস্কৃতির অনুসন্ধান এবং নব্যকৃষ্টি অনুশীলনের আন্দোলন সূচিত হয়। এতে শুচিতার প্রশ্ন জরুরী হয়ে দেখা দেওয়া বিচিত্র কিছু নয়।

দ্বিতীয়তঃ, পাশ্চাত্য শিক্ষার দুষ্ট প্রভাব জনিত বেদনা, এই সময় উপরোক্ত মানসিকতার আপন স্বভাবের উদ্গম ঘটায় এবং এই স্বধর্মোৎসারিতা আপন নিয়মে আপনার সংস্কার সমূহে মর্যাদাপন্নতা ও ঐতিহ্যযুক্তিকে আশ্রয় করে। এবং

এই ভাবে আপন জীবনী শক্তিতে বিরুদ্ধ সত্তার চাপ থেকে রক্ষা করতে শক্তি অর্জন করে।

তৃতীয়তঃ, (ক) এই সময় হিন্দু ও মুসলিম নবজাগৃতির পশ্চাদভূমিতে বিভিন্ন সংস্কৃতির আপনাআপন বিকাশের শ্রেষ্ঠতম গুণধর্ম অনুভূত হয় এবং একত্র সম্মিলনে সংস্কৃতির সামগ্রিক প্রেক্ষাপট সৃষ্টি হয়। (খ) রাজনৈতিক আন্দোলনগুলির আশ্রয়ে পরাশ্রয়ী হিসাবে এর বিকাশ লক্ষ্য করা গেলেও রাবীন্দ্রিক যুক্তিও তার অনেকখানি আশ্রয় ছিল। (গ) ঢাকার বুদ্ধিমুক্তি আন্দোলন [মুসলিম সাহিত্য সমাজ প্রভৃতি] সেই হিসাবে পরাশ্রয়িতার বন্ধনকে স্বধর্মে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার চেতনায় বৈপ্লবিকতার নিষ্ঠা অর্জন করে। এবং তা সওগাত (কলকাতা) আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কল্লোলীয় প্রচেষ্টাকে বাস্তবতা দান করে।[৫]

৪র্থতঃ পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ঢেউ দ্বিতীয়বারের জন্যে আমাদের তট স্পর্শ করে এবং আন্তর্জাতিক চেতনা সামান্যভাবে হলেও তারই প্রত্যক্ষ ফসল। ফ্রান্সের 'এনসাইক্লোপিডিষ্টগোষ্ঠী' থেকে শুরু করে জোলিও ক্যুরি ; রমারোলাঁ থেকে জাপানের নেগুচি ; কডওয়েল থেকে নোভানিস কিংবা আলফ্রেড ভন মার্টিন এসে ঢুকলো আমাদের নিরুপদ্রব জীবনের নিশ্চিন্ত জায়গীরে। Forbesএর বৈজ্ঞানিক খণ্ডন, ট্রিলিঙ, ই. ভক (wouk), চার্লস মোরাস, ম্যালিনাভস্কি, রুথ বেনেডিক্ট এবং এজরা-পাউণ্ডের ও তাঁর শিষ্য এলিয়টের সংস্কৃতির রূপ ও ঐতিহ্যানুসন্ধান সংবাদ আমাদের সাহিত্যেও ছড়িয়ে পড়ে। এ যুগের মাইকেল এবারেও যে অ-হিন্দু এবং সমাজ-বিদ্রোহী কোন জন, এবিষয়ে সন্দেহ করার কিছু নেই। মাইকেলের যুগে বৃটিশ

৫। রবীন্দ্র বিরোধী সাহিত্য আন্দোলনের বহু পূর্বে মুসলমানগণ নিজস্ব চিন্তাধারার স্বাভাবিক ও নবজাগৃতিমূলক প্রকাশে রবীন্দ্র প্রকৃতিতে অন্তর্লীন না হয়ে স্বকীয় ও নব্য সাহিত্যচেতনা উপহার দিয়েছিল। আধুনিক সাহিত্যে মুসলমান সংস্কৃতি চেতনার এই ব্যাপক প্রভাব স্বীকৃতি না পেলেও এ সত্য অত্যন্ত প্রকট। ঊনবিংশ শতকের সাধনা প্রথমে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি শোষণ (ও পরে তার শোধন) ও হিন্দু সংস্কৃতির শোষণ এবং বিংশ শতকের সাধনা মুসলিম ও আঞ্চলিক সংস্কৃতির শোষণেরই সাধনা। হিন্দুরা সেখানেই অমর যেখানে তারা মুসলমান সংস্কৃতিকে গ্রহণ বা আঘাত করেছে।

মুখীনতায় গ্রীক-লাতিন অত্যাবশ্যক উপাদান জুগিয়েছে : এ যুগে হুইটম্যান অথবা মার্কস। সার্ত্রে-মালের্‌া, রাশিয়ার লাইসঙ্কো, হালের দ্যুবিনিংসভ এমনকি এ্যাংরি-ছোকরা ইভশুতেঙ্কোকে দিয়ে আজকের সমাজের অগ্রগতির চিহ্ন মাপা যায়।

৫মতঃ মার্কসীয় দর্শন সর্বোপরি, আধুনিক সংস্কৃতি চেতনায় আমাদের ত্বড়িৎ নিয়ে আসার জন্য গভীর ভাবে সাহায্য করেছে।

মার্কসীয় চিন্তাধারাতেই প্রথমে সমাজ কাঠামোর বিচার, শ্রেণী সংগ্রাম পরিচিতি প্রভৃতি সম্ভব হয় এবং এইসব প্রশ্নের ভিত্তি ও উপরিতল সমস্যায় একমাত্র অর্থনীতিই আলোচ্য সত্যের সন্ধান দেয়। সংস্কৃতির প্রশ্ন সেখানে বহিরাবরণ বা বহিরউপাদান বিষয়ক। Economy is the basis and culture is the super structure—এই নুতন সত্য উপস্থাপনে ইতিহাস ও অর্থনীতির আলোচনা ও বিতর্কের ধারায় সংস্কৃতির নবপ্রতিষ্ঠা ঘটে। (স্টালিন এই Basis ও Super structure-এর আলোচনায় মহৎ পথিকৃৎ)

অতঃপর বঙ্কিমী ঢং-এ ধর্মতত্ত্ব বঙ্গদেশের কৃষক কিংবা ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ক রচনার মত এবং রবীন্দ্রনাথের রাজা-প্রজা সমূহ সমাজ শান্তিনিকেতন বিষয়ক প্রবন্ধাবলী প্রভৃতি রচনার মত দার্শনিকতায় কিংবা জ্ঞানদ্বন্দ্বের উক্তিবাচকতায় সংস্কৃতির রূপ ও সমস্যাগুলি দেখানোর প্রয়োজন রইলনা।[৬]

এই মার্ক্সবাদী লেখকদের রচনাতেই সংস্কৃতি শব্দে নানা রূঢ় অর্থ ও নবাভিধা সংযুক্ত হয়। শান্তি সম্মেলন সমূহে এ শব্দের ব্যাপক ক্রিয়া চলে এবং এদের সংজ্ঞাদানের চেষ্টাও স্মরণীয়। তখন থেকেই বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় সংস্কৃতি বিষয়ক রচনাদি এবং বিভাগীয় আলোচনা (features) একটা আবশ্যকতার মাঝে এসে দাঁড়ায়। পরিচয় থেকে নতুন সাহিত্য 'সংস্কৃতি' সম্পর্কে বিভিন্ন বিতর্ক-

৬। শিবনাথ শাস্ত্রীর রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, রবীন্দ্রনাথের সভ্যতারসংকট নিজস্বভঙ্গী থেকে আলোচনার সম্পূর্ণতা দাবী করে। প্রথম গ্রন্থের আদর্শে সংবাদপত্রে সেকালের কথা (ব্রজেন্দ্রনাথ) সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র (বিনয় ঘোষ) সংবাদ পত্রের রূপায়ন (শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) এবং কলকাতা কালচার, জনসভার সাহিত্য প্রভৃতি গ্রন্থ বিরচিত হয়। রবীন্দ্র আদর্শে কাজী আবদুল ওদুদ, মোতাহের হোসেন এবং আবুল ফজলকেই দূর থেকে দেখানো চলে।

মূলক রচনাদিও আহবান করেছে। ঢাকায় এ ব্যাপারে অগত্যা, প্রবাহ, মেঘনা এবং বিশেষভাবে সমকালের দান অপরিসীম।

সম্ভবতঃ, গোপাল হালদারের হাতেই সংস্কৃতি কথাটা ব্যাপক ও আকর্ষণীয় অবরূপ লাভ করে। সংস্কৃতি সম্পর্কিত তাঁর ব্যাপক গবেষণামূলক গ্রন্থাদি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এ ছাড়া সুভাষ মুখোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ, সিদ্বেশ্বরী সেন বিমলচন্দ্র সিংহ, ধুর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নামও স্মরণ করা যায়।[৭]

মুসলমান লেখক ও চিন্তাবিদগণের মধ্যে সংস্কৃতির অন্তর্গত বিষয় নিয়ে লিখেছেন অনেকেই। কাজী ওদুদ, এয়াকুব আলি চৌধুরী, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মুহম্মদ আকরাম খাঁ, বরকতুল্লাহ, আবুল কালাম শামসুদ্দিন, গোলাম মোস্তফা, মোতাহের হোসেন, ৫ঃ কাজী মোতাহের হোসেন আবুল ফজল প্রভৃতি।[৮] তবে সংস্কৃতি সম্পর্কিত সরাসরি আলোচনা বিভাগোত্তর

৭। মনে রাখতে হবে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শ্রী দীনেশ সেন (বৃহৎবঙ্গ), সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় ও সুকুমার সেন এক্ষেত্রে আমাদের অত্যাবশ্যক নির্দেশিকা। এবং যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি (১৮৫৯-১৯৫৬) সম্পর্কে সুকুমার সেনের মন্তব্যঃ "বাঙ্গালা ভাষা ও পুরানো সাহিত্য এবং বাংলার পুরানো সংস্কৃতি ইহার বাঙ্গলা প্রবন্ধগুলির আলোচ্য বিষয়। এ বিষয়ে তাঁহার গবেষণা অনেক নূতন তথ্য ও সত্য উদ্ঘাটিত করিয়াছে। যোগেশচন্দ্রের প্রবন্ধাবলী বিভিন্ন মাসিক পত্রের পৃষ্ঠায় ছড়াইয়া আছে।"

এবং অশোক মুস্তাফি, অতুলগুপ্ত, রমেশ মজুমদার—এদের কীর্তি স্বতন্ত্র হলেও সংলগ্ন।

৮। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের (১৩৩৯ সাল) বিভিন্ন শাখার সম্পাদকবৃন্দের (কায়কোবাদ, বরকতউল্লাহ, কাজী আবদুল ওদুদ, কুদরত ই খুদা প্রভৃতি) ভাষণে মুসলিম মানস চিত্রটি যে ভাবে ধরা পড়েছিল, তাতেও আমাদের তৎকালীন সংস্কৃতি চেতনার বহু সংবাদ পাওয়া যায়। (দ্রঃ মাসিক মোহাম্মদী ৬ষ্ঠ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা ১৩৩৯ সাল)। লক্ষণীয় যে, এই বৎসরেই বেগম রোকেয়া জিন্নাতবাসিনী হন। তৎপূর্বে তাঁর নারী-জাগরণমূলক আলোচনা-সমূহ আজো বহু সমস্যার সমাধানে সক্ষম বলে বিবেচনা করা হয়।

কালের দান। এ সম্পর্কে এ ক্ষেত্রে বলা দরকার যে 'তমদ্দুন'-ভাবনা বিভাগোত্তর কালের ঘটনা নয়। ১৯৪০ ও পরবর্তীকালীন কলকাতার আজাদ মোহাম্মদী ও সওগাতে খুঁজলে সে সংবাদ পাওয়া যায়।

নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ানের মুসলিম সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা সাহিত্যের নতুন ইতিহাস রচনার প্রেরণাও সমসাময়িক এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সোচ্চার। পূর্ব পাকিস্তানেও সংস্কৃতি চেতনা মূলতঃ বুদ্ধিবাদীদেরই অবদান, তবুও বলা চলে এব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও স্থানীয় কলেজ সমূহের ছাত্রদের আন্দোলন ও এই সব প্রতিষ্ঠানের ছাত্রসংসদের মুখপত্র সমুহই এ চেতনাকে সূচীমুখী করে তোলে। ফজলুল হক মুসলিম হল বার্ষিকী (সম্পাদক হাসান হাফিজুর রহমান; সম্পাদক রফিকুল ইসলাম); সলিমুল্লাহ মুসলিম হল বার্ষিকী (সম্পাদক আলাউদ্দিন আল আজাদ ১৩৬০-৬২); ঢাকা হল বার্ষিকী (সম্পাদক শওকত আলী ও মনিরুজ্জামান (লেখক) ১৯৫৭-৫৮), সম্পাদক লেখক (১৯৬০-৬১) পত্রিকাসমূহে আলোচিত সমস্যাসমূহ যে বিশেষ দিকটিকে ফুটিয়ে তোলে সমসাময়িক সংস্কৃতি আন্দোলনের সাথে তার সাযুজ্য বোধমান।

পূর্ব পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক রূপ ও অবয়বকে বিধৃত করে সর্বাংগীন লেখা প্রথম বের হয় নতুন সাহিত্যে (কলিকাতা)। লেখক (অধ্যাপক) মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম [৭ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা ও ৫ম সংখ্যা দ্রষ্টব্য]

পূর্ব পাকিস্তানের মাসিক এবং সাময়িক পত্রিকা সমূহের এখনও আকর্ষনীয় লেখা গুলি সংস্কৃতি বিষয়ক। সংস্কৃতির ওপর প্রথম লেখা প্রকাশ করে অগত্যা ও মাহেনও। সংস্কৃতি সম্পর্কে বিতর্ক উপস্থিত করে, অগত্যা, সমকাল ও পূবালী। প্রথম হিন্দু মুসলমান সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার প্ররিপ্রেক্ষিতে সংস্কৃতির অখণ্ড চিন্তার বিবর্তন ঘটে সওগাত ও মোহাম্মদী পত্রিকায়। সোনার বাংলা কাফেলা এবং দৈনিক মিল্লাত ও সংবাদের ভূমিকা খুব স্পষ্ট না হলেও শিবির বিভক্তির সমর্থন এদের ছিল না।

মাসিক মোহাম্মদী তাহজীব তমদ্দুন প্রভৃতি শব্দের আশ্রয় গ্রহণ করে হিন্দুয়ানীর ছোঁয়া বাঁচাবার জন্যে। পরবর্তী কালে শব্দগুলি একক ভাবে তালিম হোসেন বা মোফাখখারুল ইসলাম কিংবা ফররুখ আহমদ ও ড' আশরাফ সিদ্দিকী প্রভৃতি জনের কাব্যানুভূতির তীব্রতায় সুধিমহলেও প্রচলিত হতে দেখা যায়।

এই সময়কার দুটি বিখ্যাত ঘটনা পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন (কুমিল্লা[৯], ও পরে ঢাকা ১৯৫৪) এবং পশ্চিম বঙ্গে সাহিত্য মেলা (সাহিত্য মেলা ঃ ক্ষিতিশ রায় দ্রষ্টব্য)। আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি আন্দোলনে এই দুই সভার প্রভাব যথেষ্ট। গত বিশ বছরে পৃথিবীর সর্বত্র সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পরিবর্তন ও দ্রুত উন্নয়ন ঘটেছে। বৃহৎ মানবতার দ্বারে তাকে উপনীত করার সংগ্রাম এর লক্ষ্য হয়েছে। এক মহৎ সংশ্লেষণধর্মী সংস্কৃতির (a synthesis but certainly not single system. Fairbank)[১০] আন্তর্জাতিকতা আজ সকলকে প্রশ্নাঘাত করেছে ঃ রবীন্দ্রনাথে আছে,

তাইতো আমাকে দিতে হবে
বড় কিছু দান
দানের একান্ত দুঃসাহসে

তাকে কি আমাদের পূর্বোধৃত অবক্ষয়ের তালিকার কাছে ম্লান করে দিতে পারি? পাশাপাশি আধুনিক সংস্কৃতি সেবীরা বিশ্বব্যাপী মান্দ্য (depression) ঘটিত সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে গ্রহণের প্রশ্নে আধুনিক মানসিকতার দুর্বলতাও নির্দেশ করেছেন।

৯। দ্রঃ—সংকট কেটে যাচ্ছে, মাহবুব-উল আলম দ্রষ্টব্য।

১০। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সমস্যা হিসাবে উক্ত ভাষণে জন কে. ফেয়ারব্যাংক 'নবসংশ্লেষণবাদের.' ("a new world culture– a new synthsis") উল্লেখ করেন। কারণ সংস্কৃতির একটি মানবিক লক্ষ্য আছে, এবং তা-ই মানুষকে নিয়ে যায় অগ্রগতি কিংবা বিকাশের দরজায়। তার রূপ হচ্ছে 'about and begond our own cnltrral limits' ফেয়ার ব্যাংক বৈজ্ঞানিক সূত্রটি আবিষ্কার করে এই সর্ত আরোপ করেন যে "Providing we can able to combine our study of the Asian past with a grasp of the Asian revolutions of to day, our own inherited values with our present problems."
—Presidential Address, March 24, 1959.

নৈর্ব্যক্তিক চারিত্র্যে রাবীন্দ্রিক "লালিত্যময় যাথার্থ" থেকে যেমন এরা বেরিয়ে এসেছেন, তেমনি নতুন পৃথিবীকে এরা বলেছেন "অসুস্থ, অসুখী, অব্যবস্থিত", নতুন যুগকে বলেছেন ভাঙন ধরা, রাবিশ জমা, ধুলোওড়া", দানবিক ক্ষুধা আছে এর, কিন্তু মানবিক সহাস্য মিতিবোধটাও নেই এবং দ্বিতীয়তঃ, অতিরিক্ত Intellectual হবার মোহও এর আছে। অতিরিক্ত বুদ্ধি এর নামকরণ হতে পারে মাত্র। "মেলাবেন তিনি মেলাবেন, ভাঙ্গা দরোজাটা মেলাবেন" কবিদের এই আশ্বাস জীবনবিবিক্ত থেকে গেছে। যদি কবি উক্তি করেই ফেলেন, "চতুর্দিকে শিল্প আছে, যদি বুকে তৃষ্ণা রাখা যায় ..." তবে তাঁকে দোষারোপ করবো না, কিন্তু কি বলবো যখন কোন সচেতন সহৃদয় মন আপন প্রাণ সোহাগের কাছেও অসহায়ঃ

'পাখী তুমি আর এসোনা. এসোনা, শহরে
এখানে তোমার থাকাটাই অশোভন
পাখী তুমি আর ঢুকোনা আমার এ ঘরে
তাড়াতে তোমাকে চলে যায় বহুক্ষণ'। ?

লোক সংস্কৃতি

[১]

সংস্কৃতি বিষয়ক সমস্যাদিতে পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে লোকসংস্কৃতির সমস্যা পূর্ণ উদঘাটিত নয়, ফলতঃ তার উপর কাল্পনিক রং-এর প্রলেপ পড়েছে প্রচুর। সেই হিসাবে এ সমস্যা এক ধরণের রোমান্স-প্রকৃতি গ্রহণ করেছে। আমাদের সংস্কৃতি-জীবিদের মননকর্মে লোক-সংস্কার ও প্রথাদি একই রকমের সমস্যার উদ্ভাবন ঘটায় না। সম্প্রতি লোক-বিজ্ঞানের আধারে (Folk-lore) লোক-সংস্কৃতির বিচার প্রচলিত হয়েছে।

লোক-সংস্কৃতি লোকজসম্পদ। লোকধর্ম আজো আছে কিন্তু এই সংস্কৃতি ক্রম-অপসৃয়মান। সমাজের মূল কাঠামো এবং অর্থনৈতিক সংঘাত আজ পরস্পরের স্বাধীনতা হরণ করেছে এবং আনবিক ও সৌরক্ষমতা প্রয়োগের অবশ্যম্ভাবিতা সেই সুভদ্রাহরণের পালার প্রতিটি সূত্রকেই নিয়ন্ত্রিত করছে।

নিয়ন্ত্রণকর্ম একটি বৈজ্ঞানিক দায়িত্ব মাত্র, তার কর্তব্যসীমার শেষ আছে। এজন্য হয়ত কোন কোন সমাজদ্রষ্টা ভাবছেন এই agrarian সভ্যতাই মানব-জীবনেতিহাসের মূলকথা এবং যুদ্ধ ঘটিত কোন catastrophe বা বিপর্যয় অথবা বিশুদ্ধ সমাজের সাংস্কৃতিক মান্দা (depression) ঘটিত সমস্যাদি বা অন্যবিধ প্রাকৃতিক কারণে সেইমূলে প্রত্যাবর্তন কখনই একটা অনিয়মিত ঘটনা হবে না। আবার কেউ কেউ এও লক্ষ্য করেছেন, যেমন Brown, H. S.,—যে, যান্ত্রিক সংস্কৃতিরও একটা মানোন্নয়ন প্রশ্ন আছে এবং তার মূলে হয়ত কোন সমাজ সত্য কাজ করছে ঃ 'an···mechanized culture····· could not have been developed without the high grade resources that are so rapidly vanishing.'।

[২]

লোক চেতনার সংগে সংগে Volkskunde, Popular Antiquities ও অন্যান্য প্রথানুবিদ্ধ লোক-প্রকাশ অধিকতর অনুসন্ধানের গুরুত্ব লাভ করেছে। ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় এই সময় Grimm brothers, Percey, Jhon Thomas, Sternberg, Benfy প্রভৃতি নামগুলো বেরিয়ে এসেছে। ১৮৬৪ সালের দিকে একটি ক্ষেত্রশব্দও (term) প্রচলিত হয়ে ওঠে বা পরে বিবর্তনবাদী দার্শনিক ও নৃবিজ্ঞানীদের আলোচনার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করতে সক্ষম হয়। সেই শব্দই Folk-lore.

লোক-বিজ্ঞান, লোক-শ্রুতি এবং লোক-সংস্কৃতি — 'ফোক-লোরের' তিনটি প্রতিশব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম দু'টি যথাক্রমে ডঃ শহীদুল্লাহ এবং ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য-উদ্ভাবিত ; তৃতীয়টি সম্পর্কে ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী ভেবেছেন, কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে 'লোক-বিজ্ঞান' শব্দের উপযোগিতা তিনি কখনও বিস্মৃত হননি। [দ্র. লোক-সাহিত্য পৃঃ ৪২-৪৩,] লোক-সংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহের ওপরই এ সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ আলোচনা সম্ভব।*

[৩]

লোক-সংস্কৃতির উপাদান Folk-lore-এ কিছু কিছু আলোচিত হয়ে একটা ক্ষেত্র নির্মাণ করেছে। এই আলোচনা প্রধানতঃ উপকরণগত এবং রূপগত সীমায় আবদ্ধ। এই দুই দিক থেকে যে সমস্যা, তত্ত্ব ও লক্ষণ ধরা পড়েছে (বিদেশী লেখকগণের আলোচনা মতেও) তার একটা ধারা নির্ণয় করা যায়। এই সমস্যা ও লক্ষণ প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত—

ক. দৈব

খ. নৃতাত্ত্বিক

গ. ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক

দৈব সমস্যাকে গুণগতদিক থেকে বলা হয়েছে প্রতিবিধানিক এবং তার সংযোগমূলক (Positive) ও বিসংযোগাত্মক (Negative) ভূমিকা বর্তমান। সংখ্যাগত

*সেই ক্ষেত্রের পথিকৃৎ বিদেশে ম্যাক্সমূলার, কক্স, কহল প্রভৃতি ; স্বদেশে রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, দীনেশ সেন, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, ডঃ শহীদুল্লাহ, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী প্রভৃতি।

দিক থেকে তা Whites (শুভ) ও Blacks (সন্দেহাত্মক)। দৈব সমস্যার আবার উত্থান ও অবক্ষয় আছে। যে কোন বস্তুতে বস্তুধর্মের বিকল্পগুণ ও শক্তি আরোপ মানুষের একটি নৃতাত্বিক ধর্ম (Mana); এই ধর্ম পরিণত অবস্থাপ্রাপ্ত হলে যে সব জটিলতা আসে (Complexes) তাই এক ধরণের অবক্ষয়।

ক্রমানুস্থিতি, রূপান্তর তত্ত্ব, দেশ রীতি (Indo-Pak Style প্রভৃতি), টাবু ইত্যাদি এক ধরণের সমস্যা যাকে ঐতিহাসিক-ভৌগলিক পর্যায়ে ফেলা যায়।

অপরাপর সমস্যা যেমন Indic source, Servivality(প্রথানুস্থিতি), Deviation (প্রসরণ) এমনকি Personal complex প্রভৃতি। ভাষা-ধ্বনিও এই পর্যায়ে আসে। এতদ্ব্যতীত কতকগুলি ব্যবহারিক সমস্যা আছে যেগুলি সংস্কৃতির মূলাধারেরই চারপাশে অবস্থিত—যেগুলি কখনো Motif (সাধারণ কাঠামোর পরিচিত গ্রন্থি সমূহ)-এর আকারে, কখনো Elevation (ক্রমাভাস) হিসাবে কখনো কোন agrarian fancy হিসাবে যে কোন লোক-সংস্কার ও সৃষ্টির পেছনে প্রায় জরুরী ভাবে উপস্থিত থাকে। যেমন,

১. Pangs বা বেদনা
২. Humour বা রস সংবেদন
৩. Conflict বা দ্বন্দ্ব
৪. Magic বা যাদু প্রভাব
৫. Quest বা সন্ধান
৬. Journey বা ভ্রমণ এবং যুদ্ধ ও বাণিজ্যে গমন
৭. Fairy and Devine (অরূপ সম্বাদী) এবং তৎদ্বারা পূণর্মিলন (Reunion)

উপরোক্ত ক—গ এই ত্রিবিধ সমস্যার দৃষ্টি কোণে এই ৭টি সংস্কারের অবস্থান গুরুত্ব ও ঐতিহাসিকতা প্রভৃতি বিচার করলে বোঝা যায় যে এতৎসক্রান্ত যাবতীয় প্রকাশ রূপই সাধারণ সমস্যা নয়—জটিল তত্ত্বেই তা ব্যাখ্যেয়।

[৪]

গ্রীম ব্যবহৃত পূরাণাংশে প্রথম 'তত্ব' প্রযুক্ত হয়। অর্থাৎ, গল্পাদিতে ব্যবহৃত

'Broken down-Myth' বা পুরাণাংশ থেকেই 'গ্রস্ত-মতবাদ' জন্ম নেয়। পুরাণাংশের বিশিষ্ট ব্যবহার প্রণালী Indo-European theory-র একটি প্রধান আলোচ্য বিষয়; IE ভাষাভাষী অঞ্চলে গ্রস্তরূপে ব্যবহৃত পুরাণের ব্যবহার সমাজতাত্ত্বিক (এবং ভাষাতাত্ত্বিক) কারণ প্রসূত বলেই কল্পনা করা হয়।

মক্ষমূলার প্রদত্ত রীতিতে লোক-সংস্কৃতি বিচার পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হয় জর্মনে পঞ্চতন্ত্র প্রকাশকালে (Thedore Benfy, 1859), ভূমধ্যসাগর এবং আল্পস পার্বত্য অঞ্চলের লোক উপাদানে পাক-ভারত সংস্কৃতির প্রভাব প্রতিষ্ঠা থেকেই ভারত-রোমান্স (Indic theory) জাগে। পরবর্তীকালে Andrew Lang প্রভৃতি মনীষিদের প্রভাবে এতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক যোগসূত্রতা আবিষ্কৃত হয়। লোক-ব্যক্তিত্ব, রূপান্তরের পরোক্ষ-অপরোক্ষ প্রভাব, কাহিনীর ক্রমাভাস প্রভৃতি লক্ষণাদির ঐক্য ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন লোক-মানসে একই প্রতিবিধান নির্ণয়ে সক্ষম হতে পারে একথা প্রমাণিত হয়।

তারপর আসে Motif-তত্ত্ব বা উদ্দিষ্ট বিষয়াদির ব্যাকরণ। সাধারণ আবর্ষণ সমূহ যেমন তাতে উদ্ভাসিত হয় তেমনি তার দ্বারা সাধিত প্রথা ব্যবহারের সমস্যাদিরও উন্মীলন ঘটে। জর্মন ও প্রাগই এ তত্ত্বের জন্মস্থান; গ্রীমই এর লক্ষ্য ছিল তখন পর্যন্ত। ফিনিসীয় গবেষকগণ এতত্ত্বের ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক পদ্ধতি (Method) প্রকাশ করেন: পাক-ভারতীয় উপাদান সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত সমূহের (পলিভকার যুক্তি সমূহ তার মধ্যে অন্যতম) নবমূল্যায়ন ঘটে। এরপর এ তত্ত্বের (Motif) চরম উৎকর্ষ ঘটে Type-Index প্রণালী প্রয়োগের মাধ্যমে। ব্যক্তি প্রভাব (Complex), সমাজ বা গোষ্ঠিবিধান (Taboo) ও অন্যান্য শর্তাদি এ দৃষ্টি কোন থেকে আলোচনার গুরুত্ব লাভ করে।

এই সব তত্ত্বাদি থেকে জানা যায়: লোক-সংস্কৃতির উপাদানসমূহ (১) অত্যন্ত জটিল প্রক্রিয়ায় ক্রমে ক্রমে জন্মলাভ করে; (২) ব্যবসায়-বাণিজ্য, সাংস্কৃতিক বিনিয়োগ, প্রাপ্তিরতা প্রভৃতি সংস্কৃতির নানাবিধ অভ্যাসক্রমে এবং (৩) ভাষা, গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব, পুরাণ প্রভৃতি নিয়ামক বিধি সংযোগে কতকগুলি বৈজ্ঞানিক সূত্রকে স্পষ্ট করে।*

*Popular theory, Broken-down Myth theory, Indic theory, Servival theory, Pan-babilonian theory, Motif Science, Type Index, Anthropomorphic condition প্রভৃতি নৃতাত্ত্বিক সমস্যা ও সূত্র সমূহের উদ্ভাবন তার প্রমাণ।

[৫]

লোক-সংস্কৃতির দুই ভাগ, Formalised এবং Material অর্থাৎ, লোক-সাহিত্য এবং লোক-শিল্পই এ যাবৎ আলোচিত হয়েছে ;* আলোচনাকে আরো একটু অগ্রগতির পর্যায়ে ভেবে দেখা যায়। লোক-সাধারণের প্রতিটি অভ্যাস এবং ব্যবহারজীবি প্রভৃতিদের বিশিষ্টাভ্যাসের আলোকে তা বিচার্য।

প্রত্যাভ্যাস ও বিশিষ্টাভ্যাসে সমাজ কতকগুলি ছায়া ঘটনার (Phenomena) জন্মদেয়—যার উদ্ভব, ক্রমবিকাশ, প্রকরণ, স্থান, সংস্কৃতি-ধর্ম প্রভাব এবং আনুষঙ্গিক তত্ত্বাদি, লোকযুক্তি ও অন্যান্য আনুপূর্বিক বিশ্লেষণাদি একটি আধুনিক বিদ্যায় (Discipline) পঠন পাঠন রূপে গ্রাহ্য হতে পারে। সেই লোক-বিদ্যার প্রধান দুই শাখা অবশ্যই উক্ত কারণে প্রত্যাভ্যাসিক ও বিশিষ্টাভ্যাসিক। প্রত্যাভ্যাসিক ও বিশিষ্টাভ্যাসিক আবার অতীত ও পরাতীত—দুই ভাবে সমস্যা গঠন করে।

অতীত প্রত্যাভ্যাসিকের উদাহরণ ঃ যাদু অভ্যাস ; সুর, নৃত্য ও অন্যান্য আদিম কলা ও শিল্প; ছড়া প্রভৃতি মৌখিকাভ্যাস ও খেলা, প্রভৃতি ; স্থান, ব্যক্তি, ঘটনা, প্রকৃতি ইত্যাদির নামকরণ ; প্রেম, বাণিজ্য প্রভৃতি।

পরাতীত প্রত্যাভ্যাসিকের উদাহরণ ঃ সম্প্রদায়-সংস্কৃতি (বাউল, ফকির, কবি-সংস্কৃতি) ; সংস্কার, বিশ্বাস, অবিশ্বাস ; পীর ও দরগা প্রভাব প্রভৃতি।

অতীত বিশিষ্টাভ্যাসিক ঃ যুদ্ধ ; পর্ব ; বাইচ ; দৌড় প্রভৃতি ; বিবাহ প্রভৃতি অনুষ্ঠান ; ভাদু, রংপাচালী, আলকাপ প্রভৃতি প্রথা ; পাশা, বয়ণ, বাদ্য প্রভৃতি।

পরাতীত বিশিষ্টাভ্যাসিক ঃ পটুয়া, বৈদ্য প্রভৃতি ব্যবহার নিমিত্ত সৃষ্ট উপাদান ও উপকরণ প্রভৃতি—অর্থাৎ, উপযোগমূলক যে কোন ব্যবহারিক ও বাস্তব শিল্প। পটশিল্প, পাঁচালির উপাদান, ভজনাদির উপকরণ, বৈদ্যাস্ত্র ও মন্ত্রোপকরণ, বিগ্রহাদি, শিল্প, গ্রহোপকরণ ও লিপ্যাদি, এমন কি জীবিকানিমিত্ত যে কোন অভ্যাস ও উপকরণও এ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

---

* দ্র. লোক সাহিত্য ঃ ড. আশরাফ সিদ্দিকী ; লোকলোর পরিচিতি ও লোক-সাহিত্যের পঠন-পাঠন ঃ ড. মযহারুল ইসলাম।

শিক্ষা প্রসঙ্গে

শিক্ষা দেওয়া এবং শিক্ষা নেওয়া দুইই সমস্যা। যেখানে হরেক রকম ছাত্র—তাদের সবাইকে সমান ভাবে শিক্ষা দিয়ে একই রকম ভাবে উন্নত করে তোলা (অন্তত জ্ঞানের দিক থেকে) নিঃসন্দেহে উৎকৃষ্ট ফেলেও সম্ভব নয়। আর শিক্ষা নেওয়াও সমস্যা বটেই, যদি শিক্ষক যা পড়িয়ে গেলেন তার একবর্ণও বোঝা না গেল, যদি যা পড়ছি, যা শিখছি তা জ্ঞানের দিক দিয়ে এবং সামাজিক বৈষয়িক জীবনে আমাদেরই না কাজে লাগে—এর চেয়ে কষ্টের বেদনার জিনিস আর কোনোটাই কিছু হতে পারে না।

ধর্মীয় শিক্ষা জাতীয় শিক্ষা কিনা, সে প্রশ্ন হচ্ছে না, তবে জাতীয় শিক্ষারও যে একটা মূল্য আছে, একটা স্বতন্ত্র অর্থ আছে এবং তার গোড়ার পত্তন থাকাও যে জাতির একটা সুস্থিত ও নিশ্চিত আকৃতি নয়। তাই বলে হয় জাতীয় শিক্ষার এই গুরুত্ব আজকের দিনে খুব জোরেই ঘোষণা করা দরকার।

কিন্তু এ বিষয়ে বলার আগে আমাদের দেখে নিতে হবে—এই যে সবাই আমাদের দেশের শিক্ষা নীতি সম্বন্ধে একমাত্র যে এক গোড়ার কথাটা বেসুরো বলে দুষছে, এটা কি এবং ধর্মীয় শিক্ষায় এ বালাই থাকে অনেক, তখন এতে এই এত উৎসাহই বা চলছে কেন। এবং এই শিক্ষার বাস্তবে আজো উপযোগিতা কোথায় এবং কিসে—এর প্রমাণও আমাদের নিতে হবে। অনেকে হয়ত যুক্তি দেখাবে—সমাজ আসলে কারো সৃষ্টি নয়, ওটা আপনাআপনিই উঠে এসে জুড়ে বসেছে এবং অনিবার্য ভাবে সব কিছুতে থাকবেই—ওইটি অকারণ নয়। কিন্তু এ যুক্তি মানুষকে নিছক দাঁড়াই এনে দেবে, উন্নতি সমাজ-এর কাছে আর সুযুক্তি পাবে না।

আজকের দিনে আমাদের সমাজ ব্যবস্থাটুকু আবার ভাবিয়ে দেখার সময় এসেছে।

আজ যুগের পালে অনেক পরিবর্তনের হাওয়া যেমন লেগেছে, নতুন সম্ভাবনাও তেমনি তার সামনে রয়েছে। একে আজ অনেকেই অবশ্য বসার যায়গাটুকু ছেড়ে দিচ্ছেন, কিন্তু এতে বিভেদেরও সৃষ্টি হচ্ছে পূর্বতন সংস্কারের সংগে। সেটা খুব স্বাভাবিক। কিন্তু আমি বলতে চাইছি, এই যে একদিকে আপন যায়গাটুকুকেই অঁাকড়ে নিয়ে বসে থাকার নিরবচ্ছিন্ন অনন্যগতিস্পৃহা, অপরদিকে প্রগতিমুখীন সমস্যার ধঁাধঁা—এতে করে সমস্ত জীবনটাই আজ আমাদের কাছে বড় অস্পষ্ট এবং কি রকম খামখেয়ালী হয়ে উঠছে; এবং শিক্ষা যেহেতু আমাদের এই সামাজিক জীবনে তথা ব্যক্তি-জীবনের দেহ ও মনের সুষ্ঠু বিকাশের একটা মাধ্যম মাত্র—এই শিক্ষার মধ্যেও তাই কোন সুস্পষ্ট লক্ষ্য, কোন সিদ্ধিবস্তুর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছেনা না। এরই ফলে বিদ্যা-শিক্ষার হরিণঘাট থেকে যে পশরা মাথায় চাপিয়ে বাড়ী ফিরি চিরাচরিত নিয়মের অফিসের কেরানী বাবুর টেবিলে ছাড়া আর কোথাও সেই ভার নাবাবার অবকাশ এবং পরিবেশ আমরা পাই না।

গুরুজনেরা যতই বলুন, ছাত্ররা আদপেই "লেখাপড়া" করেনা, যতই বলুন টেক্সট্ বুকএর চেয়ে আর কী সহজ হবে, কিন্তু আসলে ঐ ননী বানিয়ে মুখে পুরে দিলেই যদি সব হজম হয়ে যেতো তবে ডাক্তারের পসার আদৌ জমতো কিনা সন্দেহ। আমরা ননীও চাইনে, ঘরে বাইরে এমনি করে ডাক্তার বৈদ্যর পেটেন্ট ঔষধও ধ্বংস করে ছড়াতে চাইনে, সহজ পাচ্য যুগোপযোগী মশলা বেটে শাক চচ্চড়ি পেলেই খুব বর্তে যাবো।

অথচ এই সহজ ও বহুকালের সত্যটুকু আজও আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রাংগণে দ্বার খোলা পেল না, বারে বারে তাই সে ফিরে এসে কেবলই আমাদের এই অভিযোগ জানিয়ে নিরন্তর ভুগিয়ে মারছে।

বৃটিশ আমলে যখন এই ভোগান্তি খেটে মরছিলাম তখন একটা সান্ত্বনা ছিল, এতো আমাদের হাত নয়। কিন্তু যখন এই হাতেও ক্ষমতা এলো, তখনও যদি দেখি সেই "হরিণ বাড়ীর সম্পত্তি" সেই মাল মশলা যা এতদিন ধরে এত স্বাস্থ্যভেংগে রূপোর টাকা গোল বানিয়ে নিয়ে এলাম, অথচ "আমরা যে ভাবে জীবন নির্বাহ করিব আমাদের শিক্ষা তাহার আদৌ আনুপাতিক নহে......তবে আর কিসের জোরে একটা যথার্থ লাভ করিতে পারিব।" এই নিরপরাধ

মার খাওয়ার বেদনাই বা কোথায় লুকোবো। এই যে আমাদের "শিক্ষিত বিদ্যা এবং আমাদের তথাকথিত বাস্তব-বাদী হতাশ জীবনের মধ্যে নিরন্তর একটা বিরোধ সৃষ্টি হচ্ছে, এ দুয়ের ব্যবধানটুকু দুর্ভেদ্য হয়ে সুসংলগ্নভাবে আর মিলবার অবকাশ পাচ্ছে না, এর স্বাভাবিক সম্ভাবনাটুকু বিশ্ব-বিদ্যালয়-রূপ টাকা আদায়ের কারখানার বন্ধ্যামাটির প্রাংগণে নির্জীব হয়ে শুকিয়ে মরছে। অস্পষ্ট শিক্ষা আর অস্পষ্ট জীবনের এই যে বিশৃঙ্খল গৃহ-দাহের অনন্ত সঙের প্রহসন, এতে নিজেদের বিদূষক সাজিয়ে কতকাল নাচানো যাবে! জীবনের এই তরজারের বাঁধন-নাচনে কেঁদে কুঁদে বুড়ো হয়ে সংজ্ঞা পেলেই আর তখন জীবন কোথায়!

অথচ আমাদের দেশের মানুষ এতই মূঢ়, এই বুড়ো হয়ে যখন নিজকে সবার থেকে দূরে পায়, তখনই সিংহনাদে বলতে থাকে — নইলে আমি এত হলাম কি করে!

এখানেই আমাদের গোড়ায় গলদ। এই কমলমনি দৈত্যাচার এ আমাদের আশৈশব প্রাপ্তির বিষয়, পিতা পিতৃ-পুরুষের এ-ই হচ্ছে বংশ পরম্পরায়ের উইল।

আমরা এমনি করে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ পেরিয়ে যখন সদরে এসে দাঁড়াই, তখন হঠাৎ সম্পূর্ণ নতুন এক বিক্ষোভ দেখে প্রথমটায় কিছুটা হত-চকিত হয়ে বিমূঢ় হয়ে পড়ি, তারপর হয়ত "য়ুরোপীয় ইতিহাস হইতে বড়ো নজির প্রয়োগ করিয়া থাকি", কিন্তু নিজেকে যখন আর কিছুতেই ঠেকাতে পারা যায় না, তখন হঠাৎ 'বাধ ছুটাইয়া' একেবারে আজন্ম বিজাতীয় বিদ্বেষে আর ঘৃণায় ভাগ্যকে শুধু শ্রাদ্ধ করতে শুরু করি। জপ তপ মন্ত্র তখন আর কিছুরই বাদ থাকে না, যাকে পাই হাতে পায়ে জড়িয়ে বলি, দুটো ভাত দে মা— 'তখন' —

ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়।

অথচ আমরা এমনি মূঢ় হতচ্ছাড়া, এই শিক্ষা আর জীবনকে রাসায়নিক নিয়মে আর এক করেও তুলতে পারছি না; মারমুখী মন সোজা সেই নিয়মের বাইরে এক অশরীরী আত্মার দুয়ারে মাথা কুটতে থাকে ভাগ্যের লেখনি সেই ত্রাণকর্তার হাতেই তুলে দিয়ে নিজে নিশ্চিন্ত প্রয়াসে হরিণ-ঘাটার বিদ্যা চর্বন করতে থাকি, চোখ মেলে দূরে চাইতেও সাহস করি না, আর যখনি এই বিশ্বাসের

মূলে কেউ হাত দিতে চায় অমনি ধর্মের দোহাই পেরে ফতুরা জারী করে তাকে নাস্তা-নাবুদ করে তুলি। এতে সমাজ যাই পাক নিজে যে অমনি করে একেবারে কুঁড়ের বাদশা অকেজো হয়ে পড়ছি সেইটুকুও আমাদের জ্ঞান হচ্ছে না। এর সম্ভাবনাও থাকচে না।

ধর্মবিশ্বাসীগণ এখানে আমায় মাফ করবেন। আমি ধর্মের ওপর হাত দিতে চাই না। কথায় কথায় উঠতে বসতে এই ধর্মের দোহাই দেখে মনে হয় যেন ধর্মীয় কুসংস্কারগুলি আমাদের বড় 'একেলা পেয়ে বসেছে।' আজ আমরা একে ছোটাবার কোন ছিদ্রও দেখচি না—এটা আমাদের চিরা-চরিত অভ্যাসের মধ্যে এসে পড়েছে। ঠিক এই জন্য শিক্ষ-ব্যাপারে আমরা যত "মরি বাঁচি" নই, ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের তত আস্থা।

শিক্ষার গলদ যত না আমাদের চেতনা জাগায় ধর্মের তথাকথিত গলদ সম্বন্ধে তত মারমুখী করে তোলে। ফলে যে প্রগতি অবশ্যম্ভাবী রূপে এসে দূয়ারে টোকা দিচ্চে আমরা তার খবরটুকু পর্যন্ত রাখছি না — এমনি করে নিতাই আমরা পৃথিবী থেকে পেছিয়ে পড়ে পড়ে ভাগ্যের হাতে মার খাচ্চি। সুতরাং স্কুল বিশ্ববিদ্যালয়ের কারখানার কলগুলি থেকে আমরা ফরমায়েশ মত যে দাওয়াই জিনিষটি পাচ্চি আদতের সংগে তার অনেক তফাৎ থেকে যাচ্ছে। নিছক খাদ-গুলি জলের সংগে না হয় একটু মিশ্রিজলে গুলেই শিশু বা নবীন কাঁচা ছেলেদের মুখে পুরে দেওয় হচ্ছে—শিক্ষক থেকে অভিভাবক পর্যন্ত বলছেন বাছাকে আমার ঔষধ দিলেন বটে। কিন্তু ছেলে যখন অমনি সংগে সংগে উদগার করে সবটাই এমন কি নিজেরও অনেক কিছু ফেলে দেয় তখনই আমরা সবাই বলতে থাকি, ছেলেটা অপদার্থ। অমনি উপড়ি চেপে পড়ে থাকলে কি হোত; ঔষধ-তো ধরবেই।

সুতরাং আমাদের এই শিক্ষার আদৌ কোন যুক্তিযুক্ত উপযোগিতা নেই, আমাদের জীবনের সংগে চারিদিকের বস্তুর সংগে চারিদিকের আপন অভ্যস্ততার সংগে তার কিছুই খাপ খায় না, কিছুই মেলে না— উপরন্তু এ শিক্ষা উত্তরোত্তর জ্ঞান বস্তুটির ওপরই আমাদের বিরাগ ভাজন করে তোলে। আজ এ অভ্যাসের (!) ফলে আমাদের দেশে সত্যি সত্যি যারা গুণী আমরা তাদের এতটুকু কদর দিতেও নিবৃত্ত থাকি। গুণীগণও ফলতঃ এমনি করে হতাশ হয়ে অভিমানের

পালা ধরতে শুরু করেন। এতে আমাদের মংগল আরো দূরে সরে গিয়ে কেবল এই তামাসা দেখে হালছেড়ে মাথা কুটতে থাকে।

এমনি করে আমাদের দেশের এই শিক্ষানীতি আমাদের সমাজের শিকড়ের রসটুকু যে কেবল কেড়ে নিচ্ছে তা নয় — তাকে মাটি শুদ্ধ উপড়িয়েও ফেলছে। তাতে ভেতরে বাইরে রেষারেষি জাগিয়ে পরস্পর পরস্পরের প্রতি মার-মুখী করে তুলচে। ফলে সমাজের আজ যেমন শান্তি নেই সমাজের বাইরেও তেমনি জায়গাই নেই। লুকিয়েও স্থানের অভাব, বাইরে এসেও ঠোনা খেতে হয়।

বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির অনিষ্টকারিতা আজ অনেকেই যে উপলব্ধি করছেন না, তা নয়। কিন্তু যে সব কারনে এর প্রতিকার করা যাচ্চে না। "তাহার মধ্যে একটি প্রধান কারণ এই যে, বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতিকে দোষ দেওয়া যত সহজ আদর্শ শিক্ষা পদ্ধতি কিরূপ হইবে তাহা দেখাইয়া দেওয়া তত সহজ নহে।" শিক্ষার উদ্দেশ্যে তার যুগোপযোগী স্থচী তার বিশেষ পন্থায় জাতীয় শক্তির আনুকুল্যে গঠন ইত্যাদি ব্যাপারেও সবার দ্বিমত খণ্ডন করা সহজ নয়। আর সবচেয়ে বড় প্রশ্ন যা আগে আমি বলতে চেয়েছিলাম, জাতীয় শিক্ষার গুরুত্ব আজকের দিনে প্রচার করে ঘোষণা করতে হবে! এই শিক্ষার ব্যাপারে জাতীয় বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আবার অনেকের ধারনা এখনও অস্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথ বলেন "কোনটা জাতীয় কোনটা জাতীয় নহে শিক্ষা, সুবিধা ও সংস্কার অনুসারে ভিন্নলোকে তাহা ভিন্ন রকমে স্থির করেন ------ একে মানুষের সংগে আর এক মানুষের অনেক তফাৎ এমন কি একই মানুষের একদিনের সংগে আর একদিনের ইতর বিশেষ ঘটে।"

সুতরাং, প্রথমতঃ আমাদের দেশে যে শিক্ষার প্রয়োজন তা কেবল ঐ নিরক্ষতা দূর করার গণ্ডীর মধ্যে থেকে শেষ পর্যন্ত লঙ্কাকাণ্ড বাঁধিয়ে বসলে লাভের চেয়ে ক্ষতিটাই ঢের সইতে হবে। তাকে গড়তে হবে নিত্য প্রয়োজনের ছাঁচে ঢেলে; সমাজের মানসিক চিন্তাবুদ্ধির আমূল বদলের প্রয়োজনে। যেখানে এই মনের উদ্ধার সহজ হবে, যেখানে মনের স্থিরতার মধ্যদিয়েই আপন স্বাভাবিকতার বিকাশ ঘটতে পারে।

কিন্তু আজ আমাদের হাড়ের মধ্যে যে সংস্কারটি ঢুকে দিবা নিদ্রার চরম ও পরম সুখটুকু একলা ভোগ করছে, সে সংস্কারের বশেই আমরা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ভাল জিনিষটা একেবারেই বুঝতে সক্ষম নাও হতে পারি, হিতে বিপরীত হবার

সম্ভাবনাই রয়েচে, সে কথা স্বীকার করি। সংস্কারের এমন একটি রোগ থাকে, যা বাইরেও যেমন প্রহর নিনাদে নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সবাইকে সচেতন করে রাখে, ভেতরেও তেমনি আনাড়ীর মত চৌদিকে চৌপ্রহর পাহাড়া দিয়ে থাকে—আসলটি তার আনাড়িপনা হলেও যুক্তিটি থাকে বড় একগুঁয়ে ; ঐটে সহ্য করাও অসম্ভব, সরানো দায়। অবশ্য আমি বলেছিলাম, মনের আকাশের সঙ্গেই এইসব অপগোও নীতি ঘুচে যাবে] বিশৃঙ্খলা চুকে যাবে। কিন্তু আমি বলতে চাই, এই অবস্থায় হঠাৎ যদি কেউ বিদেশী উন্নত রাষ্ট্র থেকে ছাপমারা মাল মশলা আনতে ছোটেন (ছাপমারা যেহেতু সেইজন্যেই শ্রেষ্ঠ) তবে আসল কর্ম যতটুকুই উদ্ধার করা চলুক, আমাদের শুধু মুগ্ধই করে, এই মাত্রই। আমরা বিশ্বাস করি বস্তুগত ভাবে আমাদের শিখতে হবে প্রচুর, কেননা সমস্যাগত ভাবে পৃথিবীর নানাদিক রয়েছে। এবং প্রত্যেকটির এর প্রত্যেকটির সঙ্গে পরিপূরক সন্ধিতে অবস্থিত। কিন্তু এই শিখতে হবে বলেই বা নানা বিষয়ে জ্ঞান সংগ্রহ করতেই হবে—এতেই কি শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য বহাল হয়ে যাবে। এ ধারণার খুব প্রচলন থাকলেও আসল বস্তুটার দিক দিয়ে ওইটে বড়ই ভ্রান্ত। কেননা, নানা বিষয়ে জ্ঞানলাভ করা, ওইটে শিক্ষারই একটা উপায়, এই মাত্র। প্রধান উপায়ও নয়, মূল প্রয়োজনও নয় এবং এইখানটাতেই এর মূল লক্ষ্য স্থাপন করা উচিতও নয়। এতে একদিকে নকল বৃত্তিটার যেমন প্রসার বেড়ে যায়, অমনি আবার বিকৃত রুচি অস্বাভাবিকতাও সর্বনাশের পাঁচ আঙুল মেলে দেয়। সুতরাং সমাধান খুঁজতে হবে ভেতরে ভেতরে, বাইরে বাইরে সীমাহীনতার মধ্যে নয় ; সীমার মাঝেই অসীমকে উপলব্ধি করতে হবে—অসীম সীমারই একটি বৃহত্তর সংস্করণ এইটুকুর উপলব্ধি জাগাতে হবে। সুতরাং আজ আমাদের বিশিষ্ট সাধনা, বিশিষ্ট জীবন প্রণালীর হিসেব লওয়ার অবশ্যকতা প্রচুর—এই হিসেবের মধ্যেই নিজেকে আপন করে পাওয়া যাবে। এই শিক্ষাতেই আমাদের আপন বৃত্তিগুলো শিক্ষা গ্রহণের সম্পূর্ণ যোগ্য হয়ে উঠবে, তখন বাইরের অনেক কিছুই গ্রহণ করতে পারবে, আমাদের আপন বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে, সাধনার সঙ্গে একে এক করে মিলিয়ে দিয়ে একটা নিয়ম শৃঙ্খলা এনে এক মহাসৌন্দর্যের পৈঠা গড়ে তুলতে পারবে, ভেতরে বাইরের Abstract নীতিটুকু ঘুচিয়ে দিয়ে প্রকৃত সত্যটুকুই কেবল থাকে যাবে। এই হবে প্রকৃত জাতীয় শিক্ষা।

পরিশিষ্ট

অকারাদি ক্রমে সূচী ও প্রকাশ কাল

অথ নজরুল বিবাদ সমাচার (মেঘনা, ১৯৬৭)+
অপ্রাকৃত প্রবন্ধ +(পূর্বপত্র ১৯৬৬)
আধুনিক কাব্যে আঙ্গিক ও 'উচ্চারণ প্রসঙ্গ'*
উপন্যাসঃ প্রথম চিন্তা (একক, বৈশাখ ১৩৭৪)
উপেক্ষিত মহাকাব্যের কবি (রূপসা. ঢাকা—১ম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৬৮)
ঋতম্ভরা (গ্রহণের কাল, একুশের সংকলন, চট্টগ্রাম, ১৯৬৭ঃ ঈষৎ পরিবর্তিত)
ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ঃ সাহিত্যে তার রূপ (মাসিক কর্ণফুলী, ১৯৬৪ ?)
কবিতাসমস্যাঃ প্রাচীন কাল ও আমরা (সওগাত, কার্তিক, ১৩৬৬)
কালচার *
কায়কোবাদের সাহিত্য সাধনার সামাজিক পটভূমি (পূবালী, ১৯৬৩ ?)
চট্টগ্রামের উপভাষা প্রসংগে (বলাকা ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা ১৯৬৫ ?)
চতুর্বেদ* (অন্বেষা ঃ চট্টগ্রাম কলেজ বার্ষিকী. ১৯৬৩)
চর্যাপদের মানুষ * (বৌদ্ধ সম্মিলনীতে পঠিত, চট্টগ্রাম, ১৯৬২)
নজরুল কাব্য, ঐতিহ্য ও শব্দ ব্যবহার (ইত্তেফাক, ১লা জুন, ১৯৬৯)
নজরুল কাব্যের নিত্য ও চিরন্তন মূল্য (সচিত্র সন্ধানী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৯ ; মে জুন ১৯৬২)
নাটক প্রসঙ্গ * (চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সমিতি থেকে প্রকাশিতব্য মৎ সম্পাদিত 'নুরজাহান সাজাহান' এর ভূমিকার অংশ বিশেষ)
পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যের ভাষা সমস্যা (সমকাল ৭'২ আশ্বিন ১৩৭০)

বাংলা গদ্যে পদক্রম*
ভাষাতত্ব, আধুনিক (সমকাল ৬.১১ আষাঢ় ১৩৭০)
মহাকাব্যে কায়কোবাদ (দিলরুবা ১৩.২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮)
রবীন্দ্র মানসে সৌন্দর্যবোধ *
লোক সংস্কৃতি (সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত মৎকৃত "পূর্ব পাকিস্তানের পত্র-পত্রিকায় সংস্কৃতি চিন্তা" প্রবন্ধের একটি অধ্যায় ।)
শব্দে শব্দে যোজনা (তারপর, চট্টগ্রাম— ১ম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা ১৩৬৩)
শব্দের ইতিবৃত্ত (সমকাল ৭.১ ভাদ্র ১৩৭০)
শিক্ষা প্রসঙ্গে (মেঘনা, ঢাকা – মার্চ, ১৯৫৮)
সনাতন নজরুল (দৈনিক আজাদী, নজরুল সংখ্যা ১৩৭৪)
সংস্কৃতি*

১। * চিহ্নিত প্রবন্ধ সমূহ পূর্বে প্রকাশিত হয় নি।

২। +চিহ্নিত প্রবন্ধে এজাতীয় অঙ্গিকের পরীক্ষা নিরীক্ষা এই প্রথম। এ রচনাগুলি পরে পূর্বপত্র এবং চট্টগ্রামের মেঘনা পত্রিকায় পুণঃমুদ্রিত হয়। তারও পূর্বে (১৯৬১) লেখক ভাবের দিক থেকেও প্রবন্ধ সম্পর্কে চিন্তা করেছেন 'অথ ব্রহ্মপুত্র সংবাদ (জামালপুর কলেজ বার্ষিকী) প্রভৃতি প্রবন্ধে এবং আলোচ্য প্রবন্ধাদির বক্তব্য, লেখকের ধারণা, অন্যভাবে পরিবেশন কর সম্ভব হোত না।

৩। প্রারম্ভে জনাব আবুল ফজল আমার যে কটি প্রবন্ধ সম্পর্কে স্তবাম করেছেন সময়ের ব্যবধানে তাদের[দু' একটি খসে গেছে এবং তৎস্থলে কিছু নতুন প্রবন্ধ এসে জুটলো। এরা মরহুম অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই সাহেবের স্মৃতির সাথে জড়িত।